কণিকায়

প্রাউট

(দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

কণিকায় প্রাউট

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ড

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সূচীপত্র

© ২০১৬ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়)
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আনন্দনগর, পোঃ–বাগলতা জেলা–পুরুলিয়া, পঃ বঃ

যোগাযোগ অফিস:৫২৭, ভি. আই. পি. নগর

কলকাতা–৭০০১০০

প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৮

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: ২১শে অক্টোবর, ২০১৬

প্রকাশক: আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত

(কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব) আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর কলকাতা–৭০০ ১০০

মুদ্রাকর: আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত আনন্দ প্রিন্টার্স ৩/১সি, মোহনবাগান লেন

কলকাতা–৭০০০০৪

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে এই পুস্তকের কোন অংশ অর্থকরী কিংবা উপাধিগত কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং কেহ যেন তাহা না করেন।

–প্রকাশক

সূচীপত্র

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল:

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	aḿ	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প ফ ৰ ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য ৱ ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháyá jiṋána saḿskrta tato'haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ

n ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সূচীপত্র

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f, q, qh, z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে, সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ:

ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
qua	qhua	za	ŕ	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

সূচীপত্র

।। সূচীপত্র।।

দ্বাদশ খণ্ড

১। যুক্তির রাজত্ব ২। পাপ, অপরাধ ও আইন

৩। আস্তিত্বিক প্রাণিনতার উৎস

৪। মানস–আভোগের মানসাধ্যাত্মিক আভোগে রূপান্তরণ

৫। অর্থকে সচল রাখো ৬। সুসমঞ্জস অর্থনীতি

৭। অর্থনীতির চারটি ধারা *গণ–অর্থনীতি*

মানস–অর্থনীতিঃ *বাণিজ্যিক অর্থনীতিঃ*

সাধারণ অর্থনীতি

৮। বাণিজ্য ও বিনিময়

৯। ব্লকভিত্তিক ও আন্তর্বর্ক পরিকল্পনা

পরিকল্পনার চারটি মৌলনীতি　　　*প্লানিং মেসিনারী*

প্রমা-সংবৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

১০। শাসন ব্যবস্থার কয়েকটি রূপ

১১। আদর্শ সংবিধানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ

ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটি:

সংবিধানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থাই নেই।

সকল দেশের সংবিধানেরই কম-বেশী সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সূচীপত্র

১২। সেবা–মনস্তত্ত্ব ও গোষ্ঠী মনস্তত্ত্ব

পরমপুরুষকে সেবার আকুতি থেকে মানুষের সেবা মনস্তত্ত্ব জন্ম নেয়।

১৩। কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

ত্রয়োদশ খণ্ড

১। সমানম্ এজতি ইতি সমাজ

২। প্রাউটের অর্থনীতি–ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

সমবায়, শিল্পোন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ:

উৎপাদনের প্রারম্ভ–বিন্দুতেই কর ধার্য করতে হবে

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীকে কর–মুক্ত করতে হবে।

আয়কর থাকবে না

সূচীপত্র

৩। ত্রিস্তরীয় পুঁজিবাদ

৪। সামাজিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা

গোষ্ঠীৰদ্ধতার শর্তাবলী

স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল

সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির মিলনের শর্ত

আঞ্চলিক শ্রীবৃদ্ধির পথ দিয়ে বিশ্বৈকতাৰাদের প্রতিষ্ঠা

৫। ভাষার মূল তত্ত্ব

৬। ভাষা সমস্যা ভাষার৮টিউপাদান

৭। সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলন

সূচীপত্র

স্থানীয় জনসাধারণের সার্বিক কর্মসংস্থান।

সর্বাধিক শিল্প-বিকাশ: *বহির্পণ্যের আমদানি এড়িয়ে চলা*

স্থানীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ

৮। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ ৯। নারী-অধিকার

১০। অর্থনীতিতে গতিতত্ত্ব মন্দার মূল কারণগুলি

১১। প্রাউটের পঞ্চম মৌলিক সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব

চতুর্দশ খণ্ড

১। জিনিয়াস্ ও টেক্নিসিয়ান্

২। অণুমানসের শাশ্বত বর্ধমান আয়তক্ষেত্র

সূচীপত্র

৩। বাস্তবিকতা ও ৰৌদ্ধিকতা   ৪। মানুষের আদর্শে

৫। মাইক্রোবাইটাম ও মানৱ সমাজের ওপর তার প্রভাব

৬। গণতন্ত্রের প্রকোষ্ঠীকরণ   ৭। গণতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র

৮। সমবায় ব্যবস্থা   কৃষিতে সমবায়

উৎপাদন-সমবায় ও উপভোক্তা-সমবায়

৯। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি

১০। কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

সূচীপত্র

কণিকায় প্রাউট

দ্বাদশ খণ্ড

সূচীপত্র

যুক্তির রাজত্ব

এই সৌরজগৎ সম্পদ–প্রাচুর্যে ভরপুর। শুধুমাত্র মানুষই নয়, জীব জগতের খাওয়া–পরা তথা সর্বাত্মক বিকাশের জন্যে পর্যাপ্ত সম্পদ এখানে রয়েছে। কিন্তু আমাদের ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা বা দুর্বুদ্ধির জন্যেই আমরা বহু সমস্যার যথার্থ সমাধান খুঁজে পাইনি। আমাদের এ পৃথিবী যেন গুপ্তধন–ভাণ্ডার। বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ তথা তাদের পরিবর্ধনের জন্যে আমাদের এই লুকোনো সম্পদকে ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে।

আমাদের এই পৃথিবী একট জটিল যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই সমস্ত সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। এক মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত হবে না। তাই সারা বিশ্বে, বিশেষ করে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহটায় 'প্রাউট'–তত্ত্বটা ছড়িয়ে দিতে হবে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে এর বাস্তবায়ন ও কার্যে রূপায়ণের জন্যে তোমাদের বাস্তবোচিত পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

সূচীপত্র

তোমরা জান, মানুষের জীবনে শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলিই সবকিছু নয়, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। এই মানসাধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রগতির জন্যে নব্যমানবতাবাদের আদর্শকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ একমাত্র আধ্যাত্মিকতাই জীবনের অন্যান্য দিকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

মানবদেহ পাঞ্চভৌতিক উপাদানে তৈরী। তাই এই দেহকে বিশেষ কতকগুলি ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত করতে প্রপঞ্চবিজ্ঞানকেও প্রয়োগ করতে হবে। শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি দূরীকরণে মাইক্রোবাইটামের (অণুজীবৎ) নূতন তত্ত্বের সাহায্যে জীববিজ্ঞানকে আরো উন্নত করতে হবে। এই মাইক্রোবাইটাম ধনাত্মক (positive) ও ঋণাত্মক (negative) দুই ভাবেই কাজ করে থাকে। আধ্যাত্মিক প্রগতির উদ্দেশ্যেও মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের শুভপ্রয়োগ হওয়া উচিত।

মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও রয়েছে। সকল মানুষের জীবনেই রয়েছে কতকগুলি সাধারণ ও সহজাত বৃত্তি। স্বভাবগত ভাবে তাদের কেউ কেউ হয়তো মানুষকে বিকাশের পথে নিয়ে যায়, কেউ বা নিয়ে যায় অবনতির দিকে। যে বৃত্তি মানুষকে বিকাশের পথে নিয়ে যায় তাকে আমাদের উৎসাহ প্রদান করা উচিত। আর যে বৃত্তি মানুষকে

অবনতির পথে নিয়ে যায় তাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত। এই পৃথিবীর কোথাও কোথাও মানুষকে ব্যাপক নগ্নচিত্র ও অশ্লীল সাহিত্যের মাধ্যমে নৈতিক অধোগতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাধারণ প্রতিবাদের মাধ্যমে একে প্রতিহত করা যাবে না যদি না পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের জন্যে আমরা সক্রিয়ভাবে কিছু করি। যদি বাস্তবোচিত আমরা কিছু করি তবে তা মানুষের মনে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করবে। একমাত্র তখনই একে সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত তথা প্রতিহত করা সম্ভব হবে। সেটাই হৰে আমাদের বাস্তবোচিত কর্মধারা। আমাদের নূতন সাহিত্য–শিল্প–দর্শন–সঙ্গীত রচনা করতে হবে, উদ্ভাবন করতে হবে উন্নততর বাদ্যযন্ত্রের অর্থাৎ সমাজে এক নূতন সাংস্কৃতিক আলোড়ন তুলতে হবে। এ সবই আমাদের আশু কর্তব্য। এর জন্যে আমাদের যথার্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেতে হবে ও তদনুযায়ী কাজও শুরু করতে হবে।

দুঃখের বিষয়, আজকের নিরীহ মানুষেরা সমাজের সর্বগ্রাসী দানবের কৃপার ওপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। নিরীহ পশুরাও তেমনি নরপিশাচদের ওপর নির্ভরশীল; তেমনি উদ্ভিদ ও জীবজগৎও আজ এই মানবরূপী দানবের কৃপার ওপর নির্ভর করে আছে। এই মানুষরূপী দানবেরা নূতন নূতন অরণ্য রচনা না করেই নির্বিচারে অরণ্যোচ্ছেদ করে চলেছে.....যা সৃষ্টি করছে নূতন নূতন মরুভূমি।

সূচীপত্র

মানুষের চিন্তারাজ্যে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আজ এক প্রচণ্ড বুদ্ধি-বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আজ থেকে মাত্র তিনশ' বছর আগেও দক্ষিণ আমেরিকায় কোন মরুভূমি ছিল না। পনেরশ' বছর আগেও ভারতে কোন মরুভূমি ছিল না। এমনকি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকেও সব সময়ে মানুষরূপী দানবের কৃপার পাত্র হয়ে থাকতে হচ্ছে। প্রাউট, নব্যমানবতাবাদ, 'মাইক্রোবাইটাম', শিল্প-কলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, বাদ্য, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক সাধনার সাহায্যে মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা-ব্যাধির এগুলিই হ'ল সর্বরোগের একমাত্র মকরধ্বজ।

পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের অভাব ঘটতে পারে কিন্তু পেট্রোলিয়াম তৈরীর উপাদানগুলির অভাব নেই। তাই কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করা যেতে পারে। আমরা তা' করতে সক্ষম হৰও।

আমরা চাই এ বিশ্বে যুক্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য তবে আপাতঃদৃষ্টিতে সেখানে বৈচিত্র থাকতে পারে কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে রয়েছে ফল্গুধারার মত এক সামরস্য। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ সবই রয়েছে কিন্তু তারা মূলতঃ একই মহান মানবজাতির গৌরবান্বিত সদস্য-একই মহিমান্বিত বিশ্বপিতার

সন্তান। আনন্দমার্গের আধ্যাত্মিক দর্শন এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। একমাত্র ভাবজড়তার প্রভাবেই মানুষ বৈষম্যমূলক চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। পৃথিবীতে একটিমাত্রই আদর্শ রয়েছে যা সর্বাত্মক ও সর্বানুস্যূত আর তা হচ্ছে এই আনন্দমার্গ।

সমস্যা ও সমাধান উভয়ই আমাদের কাছে স্পষ্ট। এখন বিশ্বের কোণে কোণে আনন্দমার্গের এই বাণীকে পৌঁছে দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আজকে সর্বত্রই আমাদের অনুকূল হাওয়া বইছে। জীব–জগতের অস্থি–মজ্জা, অণু–পরমাণুর কাছে এই আনন্দমার্গের মহান বাণীকে যথা সত্বর পৌঁছে দিতে হবে।

কলিকাতা, ৩১ আগষ্ট ১৯৮৭

পাপ, অপরাধ ও আইন

তোমরা নিশ্চয়ই জান যদিও সাধারণভাবে আমরা ধর্ম ভৌমিক ত্রুটিকে পাপ (sin) ও সামাজিক বিধানগত ত্রুটিকে অপরাধ (guilt বা crime) বলি, 'পাপ' শব্দটি সাধারণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, বিশেষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অর্থে পাপ

সূচীপত্র

বলতে পাতককে বোঝায়। 'পাতক' মানে ধর্মভৌমিক ত্রুটি (sin)। এই পাতকের মুখ্যতঃ দুই শাখা–একটি শাখার নাম পাপ। যা অকরণীয় তা করাকে পাপ বলে, আর যা করণীয় তা না করাকে প্রত্যবায় বলা হয়। পাপ ও প্রত্যবায় দু'টিই অবাঞ্ছনীয় জিনিস। তবে প্রাচীনকালের মুনিঋষিরা বলতেন যে পাপের চেয়েও প্রত্যবায় বেশী নিন্দনীয়। পাতকের তিনটে মাত্রাভেদ রয়েছে–১) পাতক, ২) অতিপাতক ও ৩) মহাপাতক।

কিঞ্চিৎ প্রয়াসের দ্বারা বা ত্যাগ স্বীকার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করলে যে পাপের প্রতিক্রিয়া নস্যাৎ হয়ে যায় তাই হ'ল সাধারণ ভাষায় পাতক। ধরো, কেউ কারও দু'শ টাকা চুরি করেছে। সে যদি কুসীদসহ ওই টাকাটা টাকার মালিককে ফেরৎ দেয়, স্বীকৃত কুসীদের অতিরিক্ত কিছু দিয়ে দেয় ও তৎসহ ক্ষমা চেয়ে নেয়, তা হলেও এই ধরণের সাধারণ পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। কারও মনে আঘাত দেওয়াটাও কতকটা এই সাধারণ মানের পাতক। কারও মনে যদি আঘাত দেওয়া হয় ও পরে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া হয়.......বার বার ক্ষমার জন্যে অনুরোধ করাও হয় ও সেই ব্যষ্টি যদি ক্ষমা অকপটে করে দেয় তবে ধরে নিতে হয় এই ধরণের পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। অতিপাতক ৰলতে সেই

ধরণের পাতককে বোঝায় যার প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলে বিরাট কৃচ্ছ্র সাধন বা ক্লেশবরণের প্রয়োজন ঘটে। যেমন–যদি তোমার ভুলের ফলে কারও স্থায়ী ক্ষতি হয় বা ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায় সেটাও অতিপাতক। সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় এই পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নেই। তবে তুমি যার ক্ষতি করেছিলে তার ক্ষতি বিদূরীকরণার্থে যদি সর্বতোভাবে তার সাহায্যে আত্মনিয়োগ কর বা করে যাও তোমার সমগ্র জীবনকালব্যাপী, আর এতে যদি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ মনে–প্রাণে তোমায় ক্ষমা করে দেয় তবে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বলে মনে করলেও করা যেতে পারে। তবে ঠিক তা হয় না, কারণ তুমি যার স্থায়ী ক্ষতি করেছ সে মনে প্রাণে ক্ষমা কি করে? আমরা ইতিহাসে এই ধরণের অতিপাতকজ ক্রিয়ার অনেক পরিচয় পাই। অজাতশত্রু তাঁর পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করেছিলেন যেভাবে সেটাও অতিপাতকজ ক্রিয়া। শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ করে এনে হত্যা করেছিলেন। সেটাও অতিপাতকজ ক্রিয়া। হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের স্ত্রী জয়শঙ্করী ও তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে যেভাবে হত্যা করেছিলেন তাও অতিপাতকজ ক্রিয়া।

সবচেয়ে অধম মানের পাতককে বলা হয় মহাপাতক। মহাপাতক বা অতিপাতকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে কারও অতিপাতকজ ক্রিয়া দেখে অন্যে সেই ক্রিয়ায় প্রলুব্ধ

নাও হতে পারে অথবা সেই ঘটনাটা লোকে মনে নাও রাখতে পারে। কিন্তু যা মহাপাতক ইতিহাসের বা মানব সমাজের ওপর তার পৌনঃপৌনিক প্রভাব থেকে যায়। রাবণ যদি সোজাসুজি এসে সীতাকে অপহরণ করত তবে তা হ'ত অতিপাতক। কিন্তু রাবণ সাধুর বেশে এসে সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে সীতাকে অপহরণ করে। সাধুর বেশে এসে রাবণ চোরের কাজ করেছিল। এর ফলশ্রুতি পৌনঃপৌনিক। আজও কোন সন্ন্যাসীকে দেখে কুলনারী ভাবলেও ভাবতে পারে লোকটা হয় তো রাবণের মত সাধু বেশধারী চোর।

পাতকের অন্য শাখা হ'ল প্রত্যবায়, যার অর্থ–যা করা উচিত তা না করা। যেমন পুত্রকে সুশিক্ষিত করা উচিত; সে যাতে স্বনির্ভর হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত; বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থ করা উচিত (তবে শিক্ষিতা বা স্বনির্ভরা কন্যা যদি বিবাহে অসম্মতা হয় তবে সে কথা স্বতন্ত্র); উপকারীর উপকার মনে রাখা উচিত; ধর্মপথে চলা উচিত। কিন্তু কেউ যদি এই উচিতগুলো না মানেন– 'কর্মণা মনসা বাচা'......যদি এর বৈপরীত্যকেই প্রশ্রয় দেন তবে তিনি প্রত্যবায়গ্রস্থ হচ্ছেন।

স্বীকৃত বিধান বিরোধী কাজকেই অপরাধ বলা হয়ে থাকে। এক একটি জনগোষ্ঠী বা এক একটি রাষ্ট্রিক কাঠামো

কতকগুলি বিধির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এই বিধি যখন হয় রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত তখন তাকে বলে সংবিধান বা রাষ্টবিধান (Constitution)। যখন তা হয় শাসন বা বিচার সংক্রান্ত ব্যাপার তখন তাকে বলা হয় সমাজবিধান (আইন-কানুন, Law)। যে কোন রাষ্ট্রেই সংবিধান বা রাষ্ট্রবিধান বিরোধী কাজকে অপরাধ বলা হয়। আবার সমাজবিধান বিরোধী কাজকেও অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। তাই সংবিধান বা রাষ্ট্রবিধান ও সমাজবিধান (Law) বিরোধী কাজকেও অপরাধ বলা হয়। কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কতকগুলো কার্ডিন্যাল হিউম্যান প্রিন্সিপ্ল বাদে অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই মতভেদ আছে। এই জন্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বা রাষ্ট্রে সংবিধানব্যবস্থা, আইনের সংরচনা বা শাসন ও বিচার-কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। সেইজন্যে মানুষকে যখন যে দেশে থাকতে হয় সেই দেশের সংবিধান, সমাজবিধান, বিচার তথা শাসন ব্যবস্থাকে মান্যতা দিয়ে চলতে হয়। অন্যথা তাকে অপরাধগ্রস্ত হতে হয়। যে কয়টি মৌলিক মানবীয় নীতি রয়েছে আমরা যদি সেগুলির পরিসর বাড়িয়ে চলি ও এই ৰর্দ্ধিত পরিসরের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বা খাপ খাইয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান, শাসন ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা বা আইন ব্যবস্থা গড়ে তুলি তা হলে মানবিক

ঐক্যের পথ সুগম হবে। মানবতা ও নব্যমানবতা এতে তার চলার পথের অন্যতম পাথেয় দ্রুতিকে ক্রমঃবর্দ্ধিত হারে পেয়ে যেতে পারে বা পাবে। মানুষের মৌলিক ঐক্যকে ক্রমশঃ ৰাড়াতে থাকলে ও বৈবহারিক অনৈক্যকে ক্রমশঃ কমাতে থাকলে বিশ্বমানব একদিন একভৌমিক হয়ে উঠবেই। এটা কোন কল্পনার রঙীন ফানুস নয়–এটা হবে বাস্তবের মানুষের প্রজ্ঞার প্রাথমিক পরিচিতি।

এমন যে কোন কাজ যা মানুষের শরীরকে বা মনকে কল্মষাত্মক প্রতিক্রিয়ায় নাড়িয়ে দেয় ও তাকে সেই কাজ বা ভাবনা থেকে দূরে রাখতে প্রেরণা ও প্রেষণা যুগিয়ে দেয় সেই ধরণের কাজের জন্যে বা কাজের সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াত্মক মনোবৃত্তি তৈরী হয়। সেই ধরণের প্রতিক্রিয়াত্মক মনোবৃত্তিকে 'ঘৃণা' বলা হয়। ঘৃণা একটি আরোপিত (imposed) মনোৰন্ধন। তাই এ পাশের অন্তর্ভুক্ত। যা মনোভূমিতে উৎসারিত (inherent or intrinsic) হয়ে বাহ্যিক জগতে বিস্তার লাভ করে তাকে বলা হয় 'রিপু'। আর যা বাইরে উৎসারিত হয়ে মনোভূমিকে প্রভাবিত করে তাকে বলা হয় 'পাশ'। বুদ্ধিমান মানুষ রিপুকে নিয়ন্ত্রিত রাখেন ও পাশকে প্রতিরোধ করেন। রিপুর প্রতিরোধ–ব্যবস্থা মুনি–ঋষিরা দেনা না কারণ রিপুকে প্রতিরোধ করা হলে অবদমিত রিপুটি অন্য একটি রিপুর মাধ্যমে অভিপ্রকাশের পথ খোঁজে। বাকি রিপুগুলি

(কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। কারও যদি লোভ-বৃত্তি প্রবল থাকে, সে যদি অভাবের চাপে পড়ে লোভ-বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাধ্য হয়-যেমন উৎকোচ-গ্রহণকারী যদি এনফোর্সমেন্ট বিভাগের চাপে উৎকোচ গ্রহণে বিরত থাকতে বাধ্য হয় তবে তার সেই অবদমিত লোভ-বৃত্তি ক্রোধ বা অন্য কোন রিপুর মাধ্যমে ব্যক্ত হবে অর্থাৎ উষ্মায় সে ফেটে পড়বে। তাই রিপু সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক বিধি হ'ল রিপুকে সংযত রাখতে হবে ও তাকে কোন অবস্থাতেই সমাজের বা সামাজিকতার বিরুদ্ধে যেতে দেওয়া চলবে না। কারও হয়তো খাবার লোভ খুব বেশী। অতিভোজনে বা নিষিদ্ধ ভোজনে তার পক্ষে অসুস্থ হওয়া বা অকালে মৃত্যুবরণ করা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। তাই সে তার লোভবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখে ও এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখে যা তার লোভবৃত্তিকে চরিতার্থ করে- অথচ রোগকেও প্রতিরোধ করে। ধরো, কোন নেশাগ্রস্ত মানুষ নেশায় পড়ে মদের গোলাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যদি ওই নেশাকে গানের নেশায়, ছবি আঁকার নেশায় বা কোন সূক্ষ্মতর আর্টবা কলার চর্চায় প্রধাবিত করে দেয় তবে তার নেশা-বৃত্তি চরিতার্থ হ'ল, কিন্তু তা ক্ষতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুল না। পাশের সম্বন্ধে প্রাচীনকালের বরিষ্ঠ মানুষদের দৃঢ় অভিমত এই ছিল যে পাশকে প্রতিরোধ করতে হবে। ভয়ের

বিরুদ্ধে যুঝতে গেলে ভয় বৃত্তির উৎসের দিকে দ্রুত পদবিক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে, প্রয়োজনীয় পাঞ্চভৌতিক ও মানসিক হাতিয়ারও সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ভয় পেয়ে দরজায় খিল এঁটে ঘরের মধ্যে বসে থাকলে মনের মধ্যেই ভয় ঢুকে বসে থাকৰে। ভয় পাশকে কোনকালে সরানো যাবে না। তাই মনে রাখবে, রিপুকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয় আর পাশকে প্রতিহত করতে হয়। এই পাশ–নির্মুক্তির সাধনা মানুষের ব্যাপ্তির সোপান–মানবিক ঐশ্বর্যের অধিরোহণ।

"পাশৰদ্ধো ভবেজীবো পাশমুক্তঃ ভবেচ্ছিবঃ।"

অন্যের যে আচরণ বা কার্য তোমার মনে পাশ বা রিপুর উদ্রেক করে' দেয় তার সেই আচরণ বা কার্যের বিরুদ্ধে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া তা–ই ঘৃণা। যেহেতু ঘৃণা একটি পাশ তাই ঘৃণাকেও প্রতিরোধ করতে হৰে যুক্তিশীলতা ও মননশীলতার মাধ্যমে।

আস্তিত্বিক প্রাণিনতার উৎস

সূচীপত্র

আমাদের আস্তিত্বিক সম্ভাবনার সবটাই অণুচৈতন্য থেকে উৎসারিত। ভৌতিক স্তরে তা' জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করে। মানসিক স্তরে তা' চিত্তবৃত্তির মাধ্যমে কাজ করে আর আধ্যত্মিক স্তরে তা মানসাধ্যাত্মিক পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এগিয়ে চলে। এ সমস্ত কিছু মিলেই তৈরী করছে জীবের আস্তিত্বিক প্রাণিনতা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে আস্তিত্বিক প্রাণিনতা এর উৎসটা কী? এটা কী ভাবপ্রবণতা (sentiment), যুক্তি (logic), লক্ষ্য (desideratum), অথবা কর্মৈষণা (actional faculty)?

বস্তুতঃপক্ষে উত্তরটা হচ্ছে "এদের কোনটাই নয়।" প্রকৃতপক্ষে আমাদের আস্তিত্বিক প্রাণিনতার যথার্থ উৎস অণুচৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে কোন সত্তার সংস্থিতি নিহিত রয়েছে চিত্তাধারে, চিত্ত অহংতত্ত্বের মাঝে ও অহংতত্ত্ব মহৎতত্ত্বের মাঝে। কিন্তু মহৎতত্ত্বের এই "আমি আছি" ৰোধটা জীবাত্মার সাক্ষিত্ব ব্যতিরেকে বিপর্যস্ত হয় না। "আমি আছি" ৰোধের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্যে আমাদের দরকার হয় 'জ্ঞ' ৰোধের অর্থাৎ "আমি জানি আমি আছি"। প্রথমে আসে "আমি জানি" এই ৰোধটা। তারপরেই না প্রশ্ন উঠছে "আমি আছি" এই ৰোধের। সুতরাং আস্তিত্বিক সত্তার মূল উৎস "আমি জানি

আমি আছি" এর "আমি"র ওপর নিহিত। আর সেই চরম পরিণতিই হচ্ছে আমাদের আত্মা, আমাদের অণুচৈতন্য বা জীবাত্মা।

এখন এই যে এইমাত্র চার ধরণের মানসপ্রবণতার (ভাব-প্রবণতার, যুক্তি, লক্ষ্য

ও কর্মৈষণা) কথা ৰললুম তাদের সীমাবদ্ধতা কোথায়?

ভাবপ্রবণতা: অভিব্যক্তির জন্যে মনকে বিশেষ বিশেষ ধরণের চিত্তাণুসঞ্জাত বিষয়কে গ্রহণ করতে হয়। এই মানস বিষয়গুলো (ভালবাসা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি) 'বৃত্তি' নামে পরিচিত। **মনের বৃত্তির এক একটা বিশেষ ধরণের অভিব্যক্তিকে বৃত্তি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।** মানসিক স্তরে এই বিষয়গুলোকে বলা হয় অভিব্যক্ত ভাবপ্রবণতা। সংক্ষেপে ভাবপ্রবণতা হচ্ছে মানসিক শক্তির বাহ্যিক প্রক্ষেপ যা যুক্তিপূর্ণ হতেও পারে, নাও পারে। ফলতঃ যেকোন মুহূর্তে ভাবাবেগ ভাবজড়তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। এই ধরণের এক অনিশ্চিত সত্তা আমাদের আস্তিত্বিক প্রাণিনতার উৎস হতে পারে না। তাছাড়া যেহেতু ভাবপ্রবণতা বিশুদ্ধ মানসবিষয়ক তাই তা আধ্যাত্মিকতা সহ আমাদের সার্বিক প্রাণিনতার উৎস হতে পারে না।

যুক্তিবাদ: যুক্তিবাদ তিনটে জিনিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে– প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। আগম উদ্ভূত হয় প্রামাণ্য পুস্তক বা প্রামাণ্য ব্যষ্টি থেকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্ঞানের এই উৎসত্রয়ের কোনটাই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বেলায় আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের সীমিতত্ব নিৰন্ধন ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহে ত্রুটির কারণে বা পারিপার্শ্বিকতায় ত্রুটি থাকলেও সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে যায়। যথেষ্ট ও প্রকৃত উপকরণ না থাকার ফলে অনুমানও ভুল হতে পারে। শেষ পর্যন্ত আগম ও কালিক ও পাত্রিক প্রভাব মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে ও করেও।

লক্ষ্য: প্রথম কথা হচ্ছে মানুষের লক্ষ্যকে অবশ্যই অভ্রান্ত হতে হবে। যদি কেউ কল্পনা করে যে তার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ধনোপার্জন প্রসিদ্ধিলাভ অথবা কেউ যদি তার মৃত্যুর পর পুরাণ–বর্ণিত স্বর্গরাজ্যে যাবার ছাড়পত্র পেতে চায় তবে তাও নিশ্চিতরূপে ভীষণ বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য যদি ঠিকও থাকে অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্তি বা পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া যদি ঠিকও থাকে তবু তা' আমাদের আস্তিত্বিক প্রাণিনতার স্থায়ী উৎস হতে পারে না। ধরো, কোন মানুষ তার জীবনতরীকে ভব–সমুদ্রে পরমপুরুষরূপী ধ্রুবতারার সাহায্যে পরিচালিত করছে। সেটা ঠিক। কিন্তু যদি তার চিত্তাকাশ পাশরিপুরূপী মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়

তবে কী হবে? বস্তুতপক্ষে অনেক মেঘই আছে যেমন বৃত্তি, সংসার, পাশ ও রিপু। এইভাবে দেখা যায় লক্ষ্য ঠিক থাকলেও তা' নির্ভরযোগ্য নয়।

কর্মৈষণা: কাজের উদ্দেশ্যেই কাজ করে গেলে তা' মুক্তি আনে না। বরং মানুষ তাতে অধিক থেকে অধিকতর কর্মৰন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রতিটি কর্মের সংস্কার থাকৰেই। যখন সংস্কার বাড়তে থাকে (তা সেগুলো 'সু' বা 'কু' যে সংস্কারই হোক, তা সে স্বর্ণশৃঙ্খল বা লৌহশৃঙ্খল যাই হোক) তখন মন সহজেই স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়। এ জীবনের কোন মানুষ পরবর্তী জীবনে পশু, বৃক্ষ, এমনকি ইট-কাঠ-পাথর হয়েও জন্মাতে পারে। তাহলে কর্মৈষণা কীভাবে আমাদের আস্তিত্বিক প্রাণিনতার উৎস হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে।

তাহলে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ভাবপ্রবণতা, যুক্তিবাদ, লক্ষ্য ও কর্মৈষণা-এই চারটের কোনটিই আমাদের আস্তিত্বিক প্রাণিনতার মূল উৎস নয়। তবে যাই হোক না কেন আমরা এই চারটে তত্ত্বকে উপেক্ষাও করতে পারি না। কারণ, তাদের দোষ-ত্রুটি থাকা সত্তেও তারা অবশ্যই আস্তিত্বিক প্রাণিনতার বোধগম্যতার ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করতে পারে।

ভাবপ্রবণতা যখন নব্যমানবতাবাদের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন ভক্তিমার্গ মানবতাকে উন্নীত করতে পারে। তর্কশাস্ত্র

সূচীপত্র

যখন বিচারপ্রবণ মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত তখন তা' সমাজে ভৌম–ভাবপ্রবণতার প্রভাবকে নির্মূল করে দিতে পারে; আর যখন তা' ৰোধির দ্বারা পরিচালিত তখন তা' জীবনের সর্বক্ষেত্রে আলোকবর্তিকার ভূমিকা নিতে পারে।

মানসাধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা আমাদের জীবনাকাশ থেকে সমস্ত মেঘকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা অভ্রান্তভাবে যুক্তির পথে চলতে সাহায্য করে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কর্মৰন্ধনই ত্রিবিধ – উপায়ে শেষ হয়ে যাবে। এই ত্রিবিধ উপায় হচ্ছে মধুবিদ্যা, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ।

শেষে বলি, কী ভাবে এই চারটে তত্ত্বকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পার। এই প্রশ্নের উত্তরে ৰলৰ, প্রমাসংবৃদ্ধি, প্রমাসমৃদ্ধি ও প্রমা সিদ্ধির পথে চলতে গেলে এই চারটে তত্ত্বকে কাজে লাগানো যাবে।

মানস–আভোগের মানসাধ্যাত্মিক আভোগে রূপান্তরণ

সূচীপত্র

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি অথবা স্থূল মানস-বৃত্তি মানুষকে সীমাহীনভাবে জাগতিক বস্তুর সঞ্চয় ও ভোগের দিকে প্রধাবিত করে। জড়বস্তু সঞ্চয়ের মানসিক ক্ষুধা প্রতিটি জৈবী সত্তার মধ্যে রয়েছে কিন্তু মানুষের মধ্যে এই ক্ষুধা রয়েছে অনন্ত ও তৃপ্তিহীন ভাবে। এই বিভিন্ন মানসিক ক্ষুধাগুলি বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক আভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানস-আভোগ ও পুঁজিবাদ

জড়বস্তুকে পাওয়ার সীমাহীন এষণাই পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে। জমি-জমা, টাকা-পয়সা, ধাতব-অধাতব পণ্যসামগ্রী এই সব জড়-জাগতিক ধনসম্পদ আহরণের মনস্তত্ত্বই পুঁজিবাদের প্রধান কারণ। পুঁজিবাদে এই ধরণের স্থূল-মানসিক ক্ষুধা ও মানসিক-আভোগ থেকে যায় বলে তা মানুষকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বুভুক্ষ লোভী জীবে পরিণত করে। ফলস্বরূপ, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যেন তেন প্রকারেণ অধিক থেকে অধিকতর ভৌতিক সম্পদ সঞ্চয়ের মানসিক রোগে ভুগতে শুরু করে। এমন কি সাধারণ মানুষকে তাদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিস থেকেও বঞ্চিত করতে দ্বিধাবোধ করে না। ওই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বৈষয়িক লাভের জন্যে মানসিক ক্ষুধা অথবা মানস আভোগ অতৃপ্ত

নিয়ে হন্যে কুকুরের মত ছুটে বেড়ায় ও অপরকে নির্মমভাবে শোষণ করতে দ্বিধা বোধ করে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ যেখানে অপরিগ্রহ (জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জাগতিক ভোগ্য দ্রব্য গ্রহণে অনীহা) নীতিকে লঙ্ঘন করছে, শোষণের সূত্রপাত সেখানেই। অখণ্ড অস্তিত্ব রক্ষা তথা প্রগতির জন্যে মানুষের যে পরিমাণ সম্পদের সত্যিকারের প্রয়োজন তদতিরিক্ত ধনসম্পদ সঞ্চয় করে। শোষকরা এই মৌলিক সত্যটিকে ভুলে যায় যে এই জগতের ভৌতিক সম্পদরাজি অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু মানসিক আভোগ এক অন্তহীন মানস এষণার দ্বারা পরিচালিত। সীমিত জাগতিক সম্পদ থেকে যখন অন্তহীন মানসিক আভোগ সন্তুষ্টি পেতে চায় তখনই শোষণ শুরু হয়। ফলে মুষ্টিমেয় মানুষ হয়ে ওঠে পুঁজিবাদী ও বাকীরা শোষিত দরিদ্রে পরিণত হয়। এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, গৃহহীন হয়ে পড়ে, শিক্ষার অভাবে দিনাতিপাত করে, বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পায় ও উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে দিনযাপন করে। সমাজ তখন স্পষ্টতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়–ধনী–নির্ধন; প্রথমটি পুঁজিবাদী শোষক, অপরটি শোষিত গোষ্ঠী–বিক্ষুব্ধ শূদ্র। মানুষের ভৌতিক সম্পদ সঞ্চয়ের এক বল্গাহীন মানসিক ক্ষুধা বা আভোগ একটা স্বাভাবিক প্রবণতা, আর নির্মম শোষণের মাধ্যমে এর পরিতৃপ্তি ঘটে। অমানবিক

শোষণের ফলেই কোটি কোটি মানুষ বঞ্চনার শিকার হয়। ধনতন্ত্রের অভিশাপই সমগ্র মানব সমাজে নিয়ে আসে ব্যাপক বঞ্চনা ও গণদারিদ্র আর এই বৈশ্য শোষণের সূত্রপাত নিহিত আছে জাগতিক বস্তু সঞ্চয়ের তৃপ্তিহীন ক্ষুধার মধ্যে। শোষণের এই অনিয়ন্ত্রিত অতৃপ্ত মানসিক ক্ষুধা মানুষের মৌল মানবিক মূল্যকে অস্বীকার করে ও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তা আত্মপ্রকাশ করে।

এই অতৃপ্ত মানসিক এষণা ও আভোগই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদ হ'ল মানবতাবিরোধী। পুঁজিবাদে ব্যাপক বেকার সমস্যা, নৈতিক অবস্থায় সাংস্কৃতিক বিকৃতি, সামাজিক ভেদ-বিভেদ, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, উপধর্মীয় ভাবজড়তা ও মানবতার অবমূল্যায়ন দেখা যায়। সমাজকে এই বৈশ্য শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে হলে পুঁজিবাদকে সমাজ থেকে নির্মূল করতে হবে। এর জন্যে মানসাধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বল্গাহীন মানসিক এষণা ও আভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মানস-আভোগ ও কম্যুনিজম্

কম্যুনিজম্ হ'ল জড়বাদের ওপর আধারিত এক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সাম্যবাদী সমাজের মানুষের মানসিক এষণা বা আভোগ জড়-সম্পদের আহরণ

তথা স্থূল জড়ভোগের পেছনে ছুটে বেড়ায়। যখন মানুষের মানসিক আভোগ এই জড়বাদী ভাবধারায় পরিচালিত হয় স্বভাবগতভাবে তখন তার মধ্যে অমানবোচিত ঋণাত্মক আচরণ ফুটে ওঠে। সেক্ষেত্রে তারা জীবনধারায় বহির্মুখী হয়ে পড়ে, জাগতিক সম্পদের প্রতি প্রবল আসক্ত হয়ে পড়ে, অপরের চিন্তা বা মতবাদের প্রতি উগ্র অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়, বিরোধী পক্ষকে দমন করার জন্যে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে, আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে। তথাকথিত সাম্যবাদী সমাজে এই অবগুণগুলি পুরোমাত্রায় রয়েছে। যেহেতু সাম্যবাদী সমাজে আধ্যাত্মিকতার কোন স্থান নেই, মন আধ্যাত্মিকতাকে তার মানস আভোগ করে' নিতে পারে না বলে জড়বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। তখন অর্থ, বিষয়–সম্পদ, ক্ষমতা ও ভোগলিপ্সাই মানুষের জীবনের সারকথা হয়ে দাঁড়ায়। ফলতঃ মানসিক আভোগ তখন জাগতিক সুখ ভোগের পানেই ছুটে যায়। সমাধানের নামে সাম্যবাদী দেশে শাসকগোষ্ঠী বেপরোয়া ভাবে পাশবিক শক্তি প্রয়োগে মানুষের জাগতিক ক্ষুধাকে অবদমন করে, যা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও যুক্তিহীন। এই অবস্থায় জড়বাদী সাম্যবাদ শোচনীয়ভাবে ত্রিবিধ বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়। প্রথমটি হ'ল সমবণ্টনের ত্রুটিপূর্ণ আদর্শ; দ্বিতীয়তঃ সাম্যবাদী দেশে বল্গাহীন মানসিক আভোগ থেকে জন্ম নেয় একটা অপ্রতিরোধ্য জড়াভিমুখী

প্রবণতা; তৃতীয়তঃ সেই অপ্রতিরোধ্য জড়াভিমুখী প্রবণতাকে অবদমিত করার জন্যে একচ্ছত্র কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের একটা অক্ষম প্রয়াস বলবৎ থাকে।

কিন্তু এই মানসিক এষণা ও আভোগকে পশুশক্তি প্রয়োগে কখনই লৌহ–যবনিকার অন্তরালে অবদমিত করে রাখা যায় না। মানুষের মন সমস্ত বৃত্তির সহায়তায় এক প্রচণ্ড ইষ্ছাশক্তির উৎসারণ ঘটায় যার অৰাধ অভিব্যক্তির তথা অভিপ্রকাশের জন্যে অনুকূল পরিবেশ অত্যাবশ্যক। বর্তমান সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন মানসিক আভোগের এই প্রেষণা অবৈজ্ঞানিক ও অমনস্তাত্বিক ভাবে দমিত হচ্ছে। মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র পীড়নমূলক বিধিব্যবস্থা, সামাজিক বয়কট, বহিষ্করণ, অনির্দিষ্টকালের জন্যে অন্তরীণ রাখা, সামাজিক নিপীড়ন, সামাজিক–অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চনা এমনি নানান রকম উপায় অবলম্বন করে চলেছে।

এমনই ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ তার জীবনের গতিময়তা হারিয়ে ফেলে, তার কল্পনা শক্তি নষ্ট হয়ে যায় ও কর্মৈষণা দুর্বল হয়ে পড়ে। এইভাবে জড়–সাম্যবাদী সমাজ এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে পড়ে যায় ও সাম্যবাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। এই বিশৃঙ্খলাবস্থা আরো চরম নৈরাজ্যের দিকে

ঠেলে দেয় ও দানবের রাজত্বে পরিণত করে। আজ সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা এমনই এক অবশ্যম্ভাবী বেদনাদায়ক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

সাম্যবাদ ও ধনতন্ত্র উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ

সাম্যবাদ ও ধনতন্ত্র তথা পুঁজিবাদ উভয়ই মানবতাবিরোধী। উভয় ব্যবস্থাতেই মানসিক এষণা ও মানসিক আভোগ ঠিক ভাবে চালিত না হওয়ায় ক্ষতিকারক শারীরিক, শারীরিক-মানসিক তথা মানসাভ্যন্তরীণ পাশবিক কর্মে নিযুক্ত থাকে যা মনের ঋণাত্মক প্রতিসঞ্চরাভিমুখী গতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ধনতান্ত্রিক দেশে ধনীরা প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে যথেচ্ছভাবে তাদের মানসিক ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করে ও মানসিক আভোগকে স্থূল ভোগ-সুখের দিকে চালিত করে। আর গরীবরাও তাদের চরম দারিদ্র্য-নিৰন্ধন মানস-এষণাকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে ও বাঁচার তাগিদে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হয়। সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় প্রভাবশালী সুবিধাভোগী দলীয় নেতারা মানসিক প্রবৃত্তিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। শুধু তাই নয় তারা তাদের মানস-আবেগকে পুরোপুরি ছুটিয়ে দেয় রাজনৈতিক অভিসন্ধির পূর্ত্তি তথা সামগ্রিক শোষণের দিকে। সাম্যবাদী প্রশাসনের নিপীড়নে সাধারণ মানুষের মানস

আভোগ অবদমিত হয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। উভয়ক্ষেত্রে মানস আভোগ ভৌতিক, ভৌত–মানসিক ও মানসিক ক্ষেত্রে এমনকি কার্যকলাপের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু কেমন করে এই অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

মানস আভোগের মানসাধ্যাত্মিক আভোগে রূপান্তরণ

মানস–আভোগের মানসাধ্যাত্মিক আভোগে রূপান্তরণই হ'ল একমাত্র উপায়। আভোগটা কী? না, আভোগ মানে হ'ল মানুষ যাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে। **সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ মূলতঃ জড়বাদী দর্শন**। উভয়েই জাগতিক আসক্তির মানসিকতাকে বাড়িয়ে দেয়। যার ফলে মানুষ অন্ধভাবে অর্থ, নাম, যশ, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুটে চলে। এখন এই যে জাগতিক আসক্তি তা এক বিরামহীন মানসিক আকুতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যা বহির্মুখী মানুষকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই ধরণের জাগতিক এষণার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে মনের চিত্তভূমি বিরামহীনভাবে বিষয়ভূতরূপে তৈরী করে চলে। এই মানসিক বিষয়গুলি মনের, এরাই মানস আভোগ নামে পরিচিত।

দৈহিক, মানস–দৈহিক ও মানসিক প্রতিকর্মে নিযুক্ত থাকার সময় মন ওই সময় আভোগের দিকে ছুটে যায়। এর দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য পরিবর্তিত হলে এর বিষয় ও আভোগও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এরা সংখ্যায় বহু, সর্বদা আকর্ষণকারী ও পথভ্রষ্টকারী বিভিন্ন মানসাভোগ কর্তৃক তাড়িত হয়ে মন 'অসংখ্য পরিস্থিতির পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। এতদবস্থায় মানব মন হয়ে ওঠে বহির্মুখী, জড়বাদী ও দুর্বল। তখন মন অশান্ত, অস্থির ও ভোগবাদী হয়ে আত্মসুখতত্ত্বের অনুগমন করে। মন সর্বদা আধিভৌতিক, দৈহিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে যা মানুষকে প্রতিসঞ্চরের পথে নিয়ে যায়। তখন সে সংশ্লেষণাত্মক পথই গ্রহণ করে।

নিজের অনন্ত মানসাকুতির জন্যে মন সসীম জগতে বিভিন্ন মানসাভোগের তৃপ্তির জন্যে যত্নবান হয়। কিন্তু তা' না পেয়ে পারস্পরিক স্বার্থে পরস্পরের মধ্যে ও বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত ৰাধিয়ে দেয়। অজস্র বিষয়ী মনের দ্বারা গঠিত সামবায়িক মানসিকতাতেই তৈরী হয় সামাজিক অসাম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক অবদমন, ধর্মীয় ভ্রান্তি, সাংস্কৃতিক বিকৃতি আর সর্ববিধ সামাজিক ও বৈয়ক্তির অধোগতি যা সামবায়িক মনের অধোগতি ও সমাজের পতনকে ডেকে আনে।

সূচীপত্র

তাই মানসিক আকুতি বিষয়মুখী হলে চলবে না বা তাদের অবদমন ঠিক নয়। বরং যথার্থ মানসাধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তাদের পরম লক্ষ্যের দিকে প্রধাবিত করতে হবে। পরমসত্তা সর্বদা একই, সেখানে দ্বৈত–র কোন স্থান নেই। মানসাধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানসিক লক্ষ্য কিন্তু সর্বদা সহস্রবৃত্তিযুক্ত মন এক বিন্দুস্থ হয়ে পরম একক সত্তার পানে ধাবমান হয়। সহজ কথায় মানসাধ্যাত্মিক উন্নতির উষ্চাবস্থাতে মনের এষণা তথা মনের সমুদয় আভোগ এগিয়ে চলে এক মানসাধ্যাত্মিক আভোগের দিকে ও শেষপর্যন্ত তা এক ভূমা চৈতন্যে মিলিত হয়।

এই আভ্যন্তরীণ প্রবাহ তথা মানসাত্মিক আভোগের এক বিন্দুমুখী রূপান্তরণ বৈয়ক্তিক জীবনে ও সমাজ সংরচনায় এক সার্বিক পরিবর্তন সংঘটিত করে। মানুষকে করে তোলে গভীর ভাবে অন্তর্মুখী, আধ্যাত্মবাদী ও আত্মলীন। বস্তুজগতের সঙ্গে পারমার্থিক জগতের সন্তুলন ঘটিয়ে সে তখন পরিণত হয় শান্ত, সংযত ও জড়ভোগের প্রতি নিরাসক্ত জীবে। শুধু তাই নয় মানুষ তখন কঠোর হয়েও হয় নীতিবাদী, বিপ্লবী কিন্তু ভক্ত, কর্মচঞ্চল কিন্তু আত্মসংযমী, ঐতিহ্যবাহক কিন্তু প্রগতিশীল ও সম–সমাজতত্ত্বের প্রতিপালনে কঠোরভাবে তৎপর। এই অবস্থায় মানুষ শারীরিক, মানসিক–শারীরিক ও মানসিক কর্মের ক্ষেত্রে ভূমা ভাব আরোপ করে সংশ্লেষণ–

বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ায় বুদ্ধি ও বোধী–জ্ঞানের উন্মেষ সাধন করে নেয়। সামাজিক ক্ষেত্রে আরও সামাজিক, বন্ধুত্বপূর্ণ, সহায়ক, উদার হয়ে ব্যষ্টিগত ও দলগত বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটায়। সামাজিক সমতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও সার্বিক মানবমুক্তির ওপর নির্ভর করে সমাজকে পুঁজিবাদের দাসত্ব ও সাম্যবাদের অবদমন থেকে মুক্ত করে নব্যমানবতাদের গৌরবে প্রতিষ্ঠা করে।

এইভাবে মানসিক আভোগের মানসাধ্যাত্মিক আভোগে রূপান্তরণের ফলে মন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে ভূমা চৈতন্যে। তখন প্রতিটি ব্যষ্টি হয়ে যাবে সদবিপ্র আর সমস্ত সমাজটাই হয়ে যাবে সদবিপ্র সমাজ–আনন্দ পরিবার। তাই বলা যায়, মানসাভোগের মানসাত্মিক আভোগে রূপান্তরণই একমাত্র মকরধ্বজ।

কলিকাতা, আক্টোবর, ১৯৮৬

অর্থকে সচল রাখো

সূচীপত্র

অর্থের মূল্য বেড়ে চলে তার চলমানতায় অর্থাৎ টাকা যত হাত ঘুরতে থাকে ততই তার মূল্য বাড়তে থাকে। টাকা যত সিন্ধুকে ৰন্ধ থাকৰে তত মরচে পড়বে, ছাতা ধরবে, তার মূল্য তত কমে যেতে থাকৰে। এইটাই অর্থনীতির মৌলিক কথা। এই জনকল্যাণের কথা ভেবে কৌশীদ ব্যবস্থা রাখতে হয় ও জনগণের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির কথা ভাবতে গেলে কৌশীদ ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে যায়। keep the wagons moving এর মত keep coins (money) moving- কথাটা সমভাবে সত্য। তবে কৌশীদকে এ ব্যাপারে দু'টি জিনিসের দিকে নজর রাখতে হবে। একটা হচ্ছে কৌশীদ ব্যবস্থা এমন যেন না হয় যার রাক্ষুসী ক্ষুধায় সাধারণ মানুষের জীবন কুশীদ যোগাতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে...... পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এককালে যা হয়েছিল ও আজও কিছু কিছু শুধু অনুন্নত দেশেই নয়, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশেও হয়ে থাকে।

কৌশীদ ব্যবস্থার দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে–অবিবেকী রাষ্ট্রপরিচালকেরা বা রাষ্ট্র–পরিচালন ব্যবস্থা অনেক সময় রাজকোষে বা কৌশীদে উপযুক্ত মূল্যের বিত্তকোষ (Bullion) না রেখে যথেচ্ছভাবে নোট ছাপিয়ে যায়। প্রথমোক্ত ত্রুটিটা কেবল মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারকেই যে ধ্বংস করে তাই নয়, যারা ধনী পরিবার তাদেরও পথে বসায়। দ্বিতীয়

ত্রুটিটা হচ্ছে এই যে সমগ্র পরিমাণ বিত্তকোষ জমা না রাখলে সমস্ত সমাজ জীবন ধ্বস্ত–বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ব্যাপকভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় যা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক আদান–প্রদান দুইকেই বিপন্ন করে দেয়। শেষে দেশে উৎপাদন যত বেশীই হোক না কেন সাধারণের ভোগে তা' লাগে না। তাতে ধনী আরও স্ফীতোদর হয়, আরো নির্মম ভাবে তাদের শোষণযন্ত্র চালাবার সুযোগ পেয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (state capitalism) জনগণের ওপর রাষ্ট্রশাসক শোষকের ভূমিকায় আরও দৃঢ়ভাবে জগদ্দল পাথরের মত বুকের ওপর চেপে বসে। এই রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (state capitalism) নিজেকে ধনতান্ত্রিক (capital- ism), সমাজতান্ত্রিক (socialism), ধনসাম্যবাদী (communism) যাই বলুক না কেন জনসাধারণের কাছে তা রাক্ষুসী পিশাচারী চেয়েও ভয়ানক ও রক্তমোক্ষক।

কুশীদ ব্যবস্থা যা কৌশীদ রাখতেই হবে, নইলে অর্থের চলমানতা ব্যাহত হবে। ব্যষ্টিগত ভাবনা বা অন্য কোন ভাবনায় প্রেষিত হয়ে যদি কৌশীদ বা কুশীদ ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তবে তাকে আর্থিক ব্যাপারে অন্ধকার যুগেই থেকে যেতে হবে। প্রাপঞ্চিক লোকে (physical sphere) সে তার প্রমা হারিয়ে ফেলৰে ও একতরফা বা একপেশে (lopsided) হয়ে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতেও অন্যের কাছে উপহাসের

পাত্র হয়ে দাঁড়াবে। এমন অবস্থাটি কারো হোক তা ভাবতেও পারা যায় না। তাহলে বুঝলে কৌশীদ বা কুশীদ ব্যবস্থার মোদ্দা কথা হ'ল টাকাকে ঘুরতে দাও, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সচল করে তোল, চাল, ডাল, নুন, তেল, টাকা দিয়ে কেনো কেনো যত পার। টাকাটা যাক মুদীর দোকানে (রাঢ়ী বাংলায় লটকনের দোকানে), সেখান থেকে যাক আখের গুড়ের শালে......... সেখান থেকে যাক ময়রার দোকানে......সেখান থেকে যাক কারখানায়.......সেখান থেকে যাক মজুরের হাতে......সেখান থেকে যাক হাটে শাড়ী-বেচা তাঁতীর কাছে। তাঁতীর কাছ থেকে সে যাক নববধূর রঙিন শাড়ীতে ......রঙিন শাড়ী সমাজে এনে দিক বর্ণাঢ্যতা।

('শব্দচয়নিকা' দশম খণ্ড)

***　　***　　***　　***

কোন সূত্র থেকে ঋণ নিয়ে যদি কোন ব্যবসায়ের পত্তন করা হয় অথবা যদি কোন কিছু নির্মাণ করা হয় তবে সেই ব্যবসাকে বা সেই নির্মিত সত্তা বা সংস্থাকে 'কালিকা' বলা হয়; যেমন কারও টাকা-পয়সা নেই ঋণ নিয়ে সে ব্যবসা শুরু করলে। তবে সে ব্যবসাকে ৰলৰ 'কালিকা ব্যবসা'।

কোন দেশের অর্থভাব রয়েছে। অন্য কোন দেশ থেকে ঋণ নিয়ে সে দেশ নদীতে বাঁধ তৈরী করলে। তবে সে বাঁধকে ৰলৰ 'কালিকা বাঁধ' বা কালিকা নদী–পরিকল্পনা। অর্থনীতি এই শিক্ষাই দেয় যে কালিকায় অর্থের কখনই গতি রোধ করতে নেই অর্থাৎ কোন ব্যবসায়ী ঋণ নিয়ে সেই টাকা দোকানের ঘর তৈরী করার কাজে বা শো–কেস তৈরী করার কাজে ব্যবহার যেন না করে, কারণ তা থেকে ৰাড়তি অর্থাগম হয় না। এই ঋণের টাকায় সে যেন পণ্য–সম্ভার বাড়ায়। অফলপ্রদ (non-yielding) ধরণের কাজে কালিকার ব্যবহার অবাঞ্ছনীয়। বৈদেশিক অর্থের বিনিয়োগ রেল ইষ্টিশন তৈরীর কাজে ব্যবহার না করে নূতন রেললাইন পাতার কাজে লাগানো উচিত।

(২০শে মার্চ, ১৯৮৬, কলিকাতা, 'শব্দচয়নিকা', চতুর্থ খণ্ড)

সুসমঞ্জস অর্থনীতি

সূচীপত্র

যে সমস্ত জনপদ একাকালে সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরুঢ় থাকে পরবর্তীকালে তারা নানান কারণে শ্রী ও সম্পদহীন হয়ে পড়ে–অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এর পেছনে কয়েকটিই কারণ থাকে। প্রথম কারণ হচ্ছে যে নদীর তীরে যে জনপদ গড়ে ওঠে সেই নদীর সরে যাওয়া ও মরে যাওয়া; দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে গ্রামজীবন থেকে শিল্পের সরে যাওয়া; তৃতীয় কারণটি হচ্ছে শিক্ষাগত ত্রুটি। গ্রাম্যজীবন শিক্ষাগত ত্রুটির ফলে ও ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সাধরণতঃ কোন অঞ্চলে বলিষ্ঠ অর্থনীতি গড়ে তুলতে গেলে সেই অঞ্চলের জনসংখ্যার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিনির্ভর হিসেবে রাখা চলে। তার কমও নয়, তার বেশীও নয়। কম হলে কৃষি উপেক্ষিত হয়, বেশী হলে কৃষির ওপরে বিরাট চাপ পড়বে। এই রাঢ় অঞ্চলে তা–ই ঘটেছিল। শুধু রাঢ়ই বা বলি কেন গোটা বাংলায়, গোটা ভারতে, এমনকি চীন ও সমগ্র দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়াতেও এই ধরণের ঘটনাই ঘটেছে। এর প্রতিবিধান করবার জন্যে আজ নবতর সামাজিক –অর্থনৈতিক মূল্যায়ন প্রয়োজন।

কৃষিকে যেমন উন্নত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শিল্পকেও তেমনি কৃষির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। কৃষিনির্ভর মানুষের শতকরা হার কিছুতেই ৪০–এর উপরে

উঠতে দেওয়া উচিত নয়। গ্রামীণ শিল্প নষ্ট হওয়ায় সেইসব শিল্পের বৃহদংশ আজ কৃষির দিকে ঝুঁকেছে। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশের জন্যে যেমন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের মত কৃষিজীবী থাকা দরকার তেমনি জনসংখ্যার অনুমানিক ২০ শতাংশের মত থাকা দরকার কৃষি-নির্ভরশীল শিল্পে, ২০ শতাংশের মত থাকা দরকার কৃষিসহায়ক শিল্পে, ১০ শতাংশের মত থাকা দরকার সাধারণ ব্যবসায়ে আর ১০ শতাংশের মত থাকা দরকার বুদ্ধিজীবী বা চাকুরীজীবী হিসেবে। গ্রামীণ শিল্প ধ্বংস হওয়ায় সেই সব শিল্পের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সন্তানেরা কৃষির দিকে ঝুঁকেছে। ব্যবসায়ীর শতাংশের হারও তেমনি বাড়েনি। বরং বাড়ার সুযোগ কমেছে। কিন্তু চাকুরীপ্রার্থী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বেড়েছে। ফলে বেড়েছে বেকারের সংখ্যা।

চাষীর ছেলে দু-চারটে বই পড়ার পর সে আর লাঙ্গল ঠেলতে চায় না। সে বাবু হতে চায়, চাষের কাজকে সে ছোট কাজ মনে করতে থাকে। ফলে একদিকে যেমন চাষে শিক্ষিত ছেলের অভাব রয়েছে অন্যদিকে তেমনি বৃত্তিজীবী চাষের দিকে ঝুঁকছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীর হার দাঁড়িয়েছে ৭০% থেকে ৮০% মত। কী দুর্বিষহ অবস্থা!

অকৃষি-শিল্প (যেমন ষ্টীল প্ল্যান্ট, বাসন-শিল্প, ধাতব শিল্প, তৈল শোধনাগার, লবণ শিল্প, অনুদ্ভিজ্জ ঔষধের কারখানা) বলতে বোঝায় যে শিল্প কৃষি-সহায়কও (যেমন কোদাল, কুড়ুল, ট্রাক্টর তৈরী) নয়, আবার কৃষিজ পণ্যের ওপর নির্ভরশীলও (যেমন পাটকল, কাপড়কল, তেলকল, ময়দাকল, কাগজকল, উদ্ভিজ্জ ঔষধের কারখানা প্রভৃতি) নয়। এই অকৃষি-শিল্পে নিযুক্ত মানুষের শতকরা হার তৈরী করে নিতে হয় কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের হার কিছুটা কমিয়ে, কৃষি-সহায়ক শিল্পে নিযুক্ত মানুষের হার কিছুটা কমিয়ে, আর কৃষিজ শিল্পে নিযুক্ত মানুষের হার কিছুটা কমিয়ে। এই অকৃষি-শিল্পে নিযুক্ত মানুষের শতকরা হার মোট জনসমষ্টির ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে। ২০-এর কম হলে তাকে শিল্পাবনত দেশ বলতে হবে। সেখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় কিছুতেই খুব বেশী উন্নত হতে পারে না। জীবন-যাত্রার মানও কিছুতেই খুব বেশী উন্নত হতে পারে না কারণ তাদের ক্রয়-ক্ষমতা খুবই সীমিত থাকে। ভোগ্যপণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা কম থাকায় তাদের আমদানীর মূল্যাঙ্ক রফতানীর মূল্যাঙ্কের চেয়ে কম থেকেই যায় অথবা অন্য কোন উন্নত এলাকার উপগ্রহ হয়ে থাকতে হয় ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ্বে শক্তিসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের সম্ভাবনা সব সময় আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। অকৃষি-শিল্পে নিযুক্ত

সূচীপত্র

মানুষের সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে থাকলে সেটাই হয় একটা সন্তুলিত অবস্থা......... সন্তুলিত সামাজিক অর্থনৈতিক সংরচনা (balanced socio-economic structure)। এর শতকরা হার তিরিশের বেশী থাকলে তা হয়ে দাঁড়ায় শিল্পোন্নত এলাকা। শতকরা হার ৩০-এর যত বেশী হতে থাকে তত বেশী শিল্পোন্নত থেকে অতি শিল্পোন্নত হতে থাকে। অতি-শিল্পোন্নত দেশ কৃষিজ পণ্যের জন্যে কৃষিপ্রধান এলাকা বা এলাকাগুলিকে নিজের উপগ্রহরূপে পাবার চেষ্টা করে। তৈরী মাল বিক্রীর বাজার হিসেবেও তারা শিল্পাবনত দেশকে হাতের মুঠোয় রাখার দরকার বোধ করে। তার শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের ৰাজার না পেলে তাকে অর্থনৈতিকমন্দায় ভুগতে হয়... ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর জ্বালায় জ্বলে মরতে হয়।

এ ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট-অকম্যুনিষ্ট বিচার নেই। সবাই সমান আগ্রাসী-সবাই সামান্য মাত্র খড়-বিচালি-ভুষিমাল খাইয়ে ঘরের দোরে দড়ি বেঁধে রাখবার জন্যে কামধেনুর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই না বিশ্বে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ.....তাই না এত রণোন্মাদনার আবহসঙ্গীত......তাই না এত রণভেরীর পাঁয়তারা।

বিশ্বের প্রতিটি দেশই যাতে কৃষি-শিল্পে সন্তুলিত অবস্থায় থাকতে পারে তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় বিশ্বের অর্থনৈতিক-সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বাধ্য।

অতিরিক্ত শিল্পোন্নত হওয়ার আভ্যন্তরীণ কুফল হচ্ছে এই যে এতে বৈয়ষ্টিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্বাস্থ্য তো নষ্ট হয়ই, ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্রমাগত মানসিক অবক্ষয় ঘটতে থাকায় এক ধরণের মানসিক মহামারী যে কোন সময় দেখা দিতে পারে যা জীবনের প্রতিটি অভিব্যক্তিকেই বিশঙ্কিত তথা ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে দিতে পারে.... আজ না করলেও নিকট ভবিষ্যতে করবে।

যেখানে শিল্প-ব্যবস্থা (তা সে কৃষিজ, কষি-সহায়ক বা অকৃষি যাই হোক না কেন) বাইরের শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল সেখানকার অবস্থা তো শেষ পর্যন্ত আরও শোচনীয় হয়ে উঠবে। সেখানে মানসিক অবক্ষয়ের গতি হবে দ্রুততর। তাকে খাদ্যাভাবে প্রায় স্থায়ীভাবেই ভুগতে হবে। তার ভোগ্য পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবার সম্ভাবনাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, বর্দ্ধমানের কথা বলতে পারি। এখানে শ্রমজীবী বহিরাগত হওয়ায় স্থানীয় মানুষ কখনই সুখের দিন চোখে দেখতে পাবে না। এখানে এলাকা যত বেশী শিল্পোন্নত থেকে

অতি–শিল্পোন্নত হতে থাকুক না কেন, অতি–শিল্পোন্নত হবার কুফলে এই এলাকা ভুগবে কিন্তু সুফলের এক ফালিও ভোগ করতে পারবে না। আমাদের হাওড়া জেলার এই চিত্র আমরা দু'বেলা দেখছি। অথচ এই ভারতেই এমন এলাকা অনেক রয়েছে যেখানে শতকরা নব্বই জন মানুষই কৃষিজীবী। শিল্প বলতে কোন কিছুই নেই–সম্পূর্ণভাবে বাড়তি–শ্রম (surplus-labour area) এলাকা। একটা সন্তুলিত সামাজিক–অর্থনৈতিক সংরচনায় বাড়তি–শ্রমিক (surplus labour) বা কমতি শ্রমিক (deficit labour) কোন কিছুই হবে না........বা হতে দেওয়া যাবে না।

কৃষি ব্যবস্থার সংরচনাও কতকটা শিল্প ব্যবস্থার ধরণ–ধারণে গড়ে তুলতে হবে অর্থাৎ কৃষিপণ্যের দর নির্ধারিত হবে কৃষিগত আয়–ব্যয় ও প্রয়োজনের কথা খতিয়ে দেখে। অর্থাৎ বর্দ্ধমান–বীরভূমের চাষীকে যেন জলের দরে ধান বেচতে না হয়, হুগলীর চাষীকে যেন সস্তায় আলু বেচতে না হয়, নদীয়ার চাষীকে যেন ঋণ শোধের তাগিদে জলের দরে পাট বেচতে না হয়।

প্রভাতরঞ্জনের গল্প সঞ্চয়ন: ৫খণ্ড

*** *** *** ***

তোমরা জান, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের একটা সুসন্তুলিত অবস্থা বজায় থাকা উচিত। যেমন, জনসাধারণের এক সুনির্দিষ্ট শতাংশ নিযুক্ত হওয়া উচিত কৃষিতে, অপর এক নির্দিষ্ট শতাংশ শিল্পে ও কিছু অংশ বাণিজ্যে। অন্যথায় জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য (equilibrium) ও ভারসার (equipoise) বজায় থাকবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবীর কোন দেশেই এমন সুসন্তুলিত অবস্থা নেই। এমনকি গ্রেট–ব্রিটেনের মত শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও এমন সুসন্তুলিত অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। এক গ্রেট–ব্রিটেনের ভেতরেই ইংল্যাণ্ড যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে কিন্তু স্কটল্যান্ড রয়েছে পিছিয়ে। আবার ইংল্যাণ্ডের ভেতরের কিছু এলাকা খুবই উন্নত ও কিছু এলাকা অনুন্নত। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ল্যাঙ্কাশায়ার যেখানে যথেষ্ট শিল্পোন্নত, ইয়র্কশায়ার সেখানে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। সাসেক্স, এসেক্স ও কেল্ট সমভাবে উন্নত।

আমাদের বাঙলার কথাই ধরা যাক্। এখানকার কতকগুলি জেলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব উন্নত, আবার কিছু কিছু জেলা রয়েছে যারা তুলনামূলক ভাবে কম উন্নত। অর্থনৈতিক সংরচনার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার জন্যেই এমন হয়েছে। মানুষ এই জন্যেই কষ্ট ভোগ করে থাকে।

সূচীপত্র

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও চব্বিশ পরগণা শিল্পে যথেষ্ট উন্নত কিন্তু সে তুলনায় প্রতিবেশী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া–বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাগুলি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই তোমরা সারা দেশ জুড়ে একটা শিল্প–বিপ্লব ঘটাবার জন্যে অবশ্যই তৎপর হও। ঠিক যেমন ফরাসী–বিপ্লব হয়েছিল তেমনি শিল্প–বিপ্লবও হওয়া উচিত।

এই শিল্প–বিপ্লবের জন্যে আমাদের কোন মতেই বিদেশী রাষ্ট্র থেকে আনা কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে থাকা চলবে না। তোমাদের মনে রাখা উচিত বিদেশ থেকে আমদানী করা কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো যায় না। শিল্পোন্নয়নের জন্যে আমাদের অবশ্যই দেশীয় কাঁচামালকে ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে।

যারা সমাজকে ভালবাসে, দেশের মানুষকে ভালবাসে, যারা দেশের সামাজিক–অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে আগ্রহী, তারা অবশ্যই তাদের নিজস্ব শিল্প এলাকাগুলিতে উৎপন্ন কাঁচামালের ওপর নির্ভর করেই শিল্প–বিপ্লবের কথা চিন্তা করবে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুর–উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলির শিল্পোন্নয়নের জন্যে প্রচুর পরিমাণে

কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে ওই সহজলভ্য কাঁচামালকে আমাদের পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। মনে রেখো, এই ধরণের এক বিপ্লবকে তোমাদের ত্বরান্বিত করতে হবে। সম্মিলিত ভাবে তোমরা এক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে বিপ্লব আনয়নে প্রয়াসী হও। এ ব্যাপারে বিলম্ব করা মোটেই উচিত হবে না।

এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের এক একটি জেলা এক এক ধরণের ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন কোচবিহার জেলা পাট ও তামাক সরবরাহ করতে পারে, জলপাইগুড়ি দিতে পারে আনারসের তন্তু, পশ্চিম–জলপাইগুড়ি বিশেষ করে সরবরাহ করতে পারে পাটের সূতো, মালদা ভোজ্য তেলের উপকরণ হিসেৱে ধানের তুষ যোগান দিতে পারে, সেইসঙ্গে কাগজ শিল্পের জন্যে পাট ও ভুট্টার আঁশ দিতে পারে, আরো দিতে পারে আঁব, তাঁত–শিল্পের উপকরণ, রেশম ইত্যাদি। মালদার রেশম শিল্প এত উন্নত মানের যে তা' সাফল্যের সঙ্গে চীন ও জাপানের রেশম–শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এত শিল্প–সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মালদা আজ বাঙলার তৃতীয় দরিদ্রতম জেলা হিসেবে পরিগণিত। এই উন্নয়নমূলক কাজ খুব অল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত ও তা এমন কোন শক্ত ব্যাপার নয়।

বাঙলার কোন শিল্পকেই বাইরে থেকে আমদানী করা কাঁচামালের ওপর নির্ভর করা উচিত হবে না, দেশজ উপকরণের ওপর নির্ভর করাটাই ঠিক হবে।

১৭–৯–৮৭, কলিকাতা

অর্থনীতির চারটি ধারা

কোন অর্থনীতিকে 'উন্নত অর্থনীতি' (Developed economy) অভিধায় অভিহিত করতে গেলে তাতে থাকবে চারটি মুখ্য ধারা–**গণ–অর্থনীতি** (People's economy), **মানস–অর্থনীতি** (Psycho-economy), **বাণিজ্যিক অর্থনীতি** (Commercial economy) ও **সাধারণ অর্থনীতি** (General economy)। অর্থনৈতিক জগৎকে কেন্দ্র করে সমকালে যত ভাবনা–চিন্তা–মতবাদ গড়ে উঠেছে অর্থনীতির এই যে চারটি বিভাজন তার পরিধি অনেক বেশী বাড়িয়ে তুলল। আজকের অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই সাধারণ অর্থনীতি সম্বন্ধে খুব অল্পই বোঝেন আর বাণিজ্যিক অর্থনীতি তার চেয়ে অবশ্য কিছুটা বেশী বোঝেন। কিন্তু মানস–অর্থনীতি আর গণ–অর্থনীতির

সঙ্গে তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। আর তাই তাঁদের বর্তমান অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণায় অর্থনীতির এই. দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শাখাই কোন স্থান পায়নি। অর্থনীতির এই চারটি মুখ্য ধারা নিয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

গণ-অর্থনীতি (People's economy) - অর্থনীতির এই শাখাটি সাধারণভাবে মানুষের অত্যাবশ্যক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবে-যেমন, উৎপাদন, বন্টন, পণন ও বিপণন ব্যবস্থা, ষ্টোরেজ, মূল্য নির্ধারণ, বিক্রয় ব্যবস্থা, মাশুল (freight charges), প্রোফর্মা কষ্টিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল এই যে অর্থনীতির এই শাখাটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদার দিকগুলি নিয়েই আলোচনা করবে। যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, যানবাহন ব্যবস্থা, শক্তির যোগান, জলের সরবরাহ ইত্যাদি। যাতে এই সমস্ত অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি সহজেই পাওয়া যায় ও তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটানো যায় অর্থনীতির এই শাখাটি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দেবে।

মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্যে সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের ক্রয়-ক্ষমতার নিশ্চিততা লিখিত ভাবে থাকবে। আর এই ক্রয়-ক্ষমতাকে সংবিধানে এক মৌলিক মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যদি

কোন নাগরিক মনে করেন যে তাঁর ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের করতে পারবেন। তাই গণ–অর্থনীতির উন্নতির পেছনে সাংবিধানিক ক্ষমতাও কাজ করবে।

যেহেতু গণ–অর্থনীতি মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন তথা জনগণের জীবনধারণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে তাই অর্থনীতির অন্যান্য শাখার চেয়ে এই শাখাটির গুরুত্ব অধিক। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যদি কখনো কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাবে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থনৈতিক বিচারে লাভজনক বলে গণ্য হচ্ছে না সেগুলিকে খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন তথা সরবরাহের কাজে লাগানো যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ধরণের শিল্প–প্রতিষ্ঠান যদি খাদ্যোৎপাদন করে তাহলে তা সাধারণ অর্থনীতির মৌলনীতিগুলি তথা চাহিদা ও যোগানের নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করছে বলে বিবেচিত হৰে।

গণ–অর্থনীতির আরও আলোচ্য বিষয় হৰে ব্যষ্টিগত ও সামবায়িক সংস্থা পরিচালিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নয়ন। ব্যষ্টিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্পগুলি আকারে আয়তনে অবশ্যই সীমিত হৰে। উদ্দেশ্য হৰে একচেটিয়া উৎপাদন ও মুনাফাকে

প্রতিহত করা। আর যখনই তারা আয়তনে বড় হয়ে উঠবে তখনই তারা সামবায়িক সংস্থার পরিচালনার আওতায় এসে যাবে। সামবায়িক সংস্থা পরিচালিত শিল্পগুলি হ'ল মানুষকে স্বাধীনভাবে সুসংঘটিত করার একটি সর্বোত্তম পন্থা। এতে সকলেই জীবিকা–অর্জনের যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

গণ–অর্থনীতির পরিভূর মধ্যে আসবে সার্বিক কর্মসংস্থান, সার্বিক দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামীণ অর্থনীতি, যারা সত্যিকারের উৎপাদনের জন্যে কায়িক ও ৰৌদ্ধিক শ্রম দিচ্ছে তাদের হাতে যাতে সমস্ত জমি চলে যায় তার জন্যে পর্যায়ক্রমিক সামাজিকীকরণ, সংশ্লিষ্ট শহর ও গ্রামীণ এলাকায় মানুষের যাতে কর্মসংস্থান হয় তার জন্যে তাদের বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্য, শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রকল্প, কর্মবিভাজন, যানবাহন, দ্রব্যসামগ্রীর পরিবহন, লোডিং ও আন–লোডিং সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এদের অনেকগুলিই অর্থনৈতিক বিচারে লাভজনক বিবেচিত নাও হতে পারে তবুও তারা অর্থনীতির এই শাখটির আলোচ্য বিষয় বলেই বিবেচিত হবে। গণ–অর্থনীতির আরও একটি আলোচ্য দিক হৰে শক্তি (power), জল সরবরাহ কারণ মানুষকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে গেলে ক্ষুদ্রায়তন ও সুলভ শক্তি ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। পরিশেষে, একথাই বলৰ যে, গণ–অর্থনীতিকে

সূচীপত্র

আরও যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেগুলি হ'ল অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, গণশক্তি (People's power) সামবায়িক শক্তির উৎস (Co-operative Dynamo), ব্লকভিত্তিক পরিকল্পনা। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের বাঙলার কথায় ধরা যাক। মানুষের ন্যূনতম চাহিদা সংক্রান্ত গণ–অর্থনীতিকে কি করে গড়ে তোলা যায় তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে ৰাঙলাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। প্রথমেই খাদ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। আমাদের এই বাঙলাদেশের মাটি বেশ উর্বর। এতে রয়েছে মুখ্যতঃ দু'টি অংশ। একাংশে রয়েছে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা, অপরাংশে যদিও বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা নেই তবুও শীত ঋতুতে জলাভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই উভয় অঞ্চলেই জল সঞ্চয়ের প্রয়োজন। সেচ–সমস্যার সমাধানকল্পে চারটি উপায়ের যেকোন একটি অবলম্বন করা যেতে পারে– (১) শিফ্‌ট ইরিগেশন সিষ্টেম (যেমন ক্যানেল), (২) লিফ্‌ট ইরিগেশন সিষ্টেম (যেমন পাম্প), (৩) ট্যাঙ্ক ইরিগেশন সিষ্টেম (যেমন বড় বড় জলাধার) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রকল্প। বিভিন্ন নদীর জলের গুণাগুণ ভিন্ন ভিন্ন। কোন নদীর জল মিষ্টি আবার কোন নদীর জল নোনা। তাই উপযুক্ত ক্ষেত্রে নির্বাচিত জল সেচনের ফলে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। যদি ঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় তাহলে বাঙলার নিজস্ব কৃষিজ সম্পদের দ্বারা ছ'কোটি মানুষের ভরণপোষণের

ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে, কারণ বাঙলার মাটি ও আবহাওয়া নানান ধরণের ফসল, ফলমূল, শাক–সব্জি চাষের পক্ষে অনুকূল।

বস্ত্রঃ কোন অঞ্চলের মানুষের পোষাক–পরিচ্ছদ নির্ভর করে সেখানকার জলবায়ু ও কাঁচামালের যোগানের উপর। আমাদের বাঙলাদেশে মূলতঃ বস্ত্র উৎপাদনের জন্যে চার ধরণের উপকরণ পাওয়া যায়–তুলো, তুঁত রেশম, (Mulberry silk), অ–তুঁত রেশম (Non mulberry silk) ও সংশ্লেষণজাত উপকরণ (Synthetic materials)। তুলো, রেশম ও সংশ্লেষণজাত উপকরণ সরবরাহে ৰাঙলা যে কেবল স্বয়ংনির্ভর হতে পারে তাই নয়, এমনকি সে অন্যান্য অঞ্চলে উদ্বৃত্ত উপকরণাদি রফতানি করার যথেষ্ট সামর্থ রাখে। তুঁত রেশম ৰাঙলার পক্ষে খুবই উপযোগী কেননা, তুঁত রেশম ব্যবহারের জন্যে শুকনো আবহাওয়া দরকার যা আমরা বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে লক্ষ্য করে থাকি। অদ্ভুত রেশম বাঙলার সর্বত্রই জন্মায় আর নারকোলের খোলা (copra), খড়, বাঁশ, নারকোলের ছোবড়া, কলা ও আনারসের পাতা থেকেও সিন্থেটিক ফাইবার ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে। ৰাঙলায় পশমও পাওয়া যাবে। বাঙলার পাটকেও বস্ত্র উৎপাদনের উপকরণ হিসেৰে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাসস্থানঃ বাঙলার সর্বত্রই গৃহনির্মাণের উপকরণের ছড়াছড়ি। বাড়ী তৈরী করবার জন্যে মুখ্যতঃ বালি, সিমেন্ট ও চুণ অত্যাবশ্যক। বাঙলার মাটি ইট, ঝামা ও টালি তৈরীর পক্ষে খুবই উপযুক্ত, আবার সম্প্রতি বাঙলার একটি জেলাতে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথরের খনিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। বাঙলাদেশ কেবল গৃহ নির্মাণের উপকরণের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ তাই নয় এমন কি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকে উদ্বৃত্ত ব্যবসা করলে তাঁরা বেশ লাভান্বিতই হবেন।

চিকিৎসাঃ ঙলার মাটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ঔষধের উপাদান। বাঙলার মোটামুটি রোগ হ'ল জ্বর ও পেটের অসুখ। দেখা যায় প্রকৃতির একটা সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে এই যে যেখানকার যে রোগ সেই রোগ নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ভেষজ উৎপাদনের যোগান দেওয়া। ৰাঙলার কয়েকটি জেলার মাটি ভেষজ উৎপাদনের জন্যে খুব উপযুক্ত। আবার কয়েকটি জেলার মাটির নীচে খনিজ ঔষধোপকরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও রয়েছে।

শিক্ষাঃ মাতৃভাষা হ'ল মানুষের অভিব্যক্তির স্বাভাবিক মাধ্যম। কাজেই ৰাঙলার স্কুলগুলিতে ৰাঙলাকেই শিক্ষার মাধ্যম করা উচিত। আজকের দিনে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ভাষা

হিসেৰে ইংরেজীকেও দ্বিতীয় ভাষা হিসেৰে পড়ানো উচিত। বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যে সংস্কৃতেরও পঠন–পাঠনেরও ব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষার অন্যান্য উপকরণও যেমন কাগজ, কালি ইত্যাদি বাঙলার সর্বত্রই পাওয়া যায়। ৰাঙলার বিভিন্ন জেলায় অতি সহজেই বিভিন্ন ধরণের ঘাস ও উদ্ভিদ থেকে কাগজ উৎপাদন করা যেতে পারে। নীল বা কোন সংশ্লেষাত্মক উপকরণ থেকে কালি উৎপন্ন করা যেতে পারে।

শক্তি ও পরিবহনঃ যতদিন না সস্তায় সৌরশক্তি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে ততদিন শক্তির অন্যান্য উৎসগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে; যেমন জলবিদ্যুৎ, কয়লা, তাপ বিদ্যুৎ, তরঙ্গ শক্তি, ভূ–তাপ শক্তি, বায়ুশক্তি ও প্রাকৃতিক গ্যাস। পরিবহনের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণও বাঙলার সর্বত্র পাওয়া যায়। যেমন রাবার, ইস্পাত, অভ্র, পারদ, রুপো, তামা, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। তাই বাঙলা চাইলে এই সমস্ত উদ্বৃত্ত উপকরণ অন্যত্র সরবরাহও করতে পারে।

মানস–অর্থনীতিঃ আমরা আগেই বলেছি যে গণঅর্থনীতির মুখ্য আলোচ্য বিষয় হ'ল জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আর মানস–অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হ'ল কিভাবে যথোপযুক্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা

বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক মনকে কিভাবে অধিক থেকে অধিকতর আভোগ (pabula) সরবরাহ করা যায় তা। গণ-অর্থনীতির যেখানে রুগ্ন ও অনুন্নত অর্থনৈতিক ইউনিটগুলি নিয়ে কারবার, আর যেখানে মানুষের জীবনধারণের সমস্যার সমাধান হয়েছে সেখানে মানস-অর্থনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। যেদেশে অর্থনীতি অতি উন্নত ও যান্ত্রিকীকরণের চূড়ান্ত প্রয়োগ ঘটেছে যেখানে মানুষ সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাজ করবে ও হাতে প্রচুর অবসর সেই সব দেশে মানস-অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

মানস-অর্থনীতির থাকবে মূলতঃ দু'টি শাখা। একটি শাখার প্রচেষ্টা হবে কিভাবে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচরণ ও সংরচনা (structure) মানুষের সমাজে শোষণ ও অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে তার দূরীকরণ করা। এই মানস-অর্থনীতি সর্ববিধ অর্থনৈতিক ও মানস অর্থনৈতিক শোষণকে প্রতিহত করবে, মানুষকে সচেতন করবে কিভাবে পুঁজিপতিরা এককভাবে ও যৌথভাবে তাদের বিপুল প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে সমাজকে শোষণ করে চলেছে, সমাজে একটি অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে চলেছে যা মানুষের মনকে বিষিয়েই দিচ্ছে না, বরং এমন কতকগুলি মারাত্মক কু-অভ্যাসকে উৎসাহিত করছে যা মানসিক শুচিতা ও প্রসারের পরিপন্থী। মানস-অর্থনীতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হ'ল আজকের

সমাজে যে ধরণের ক্ষতিকারক ও মানবতা বিরোধী অর্থনৈতিক প্রবণতা চলছে তার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

মানস–অর্থনীতির দ্বিতীয় শাখার কাজ হৰে বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক মনের আভোগের (pabula) বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটানো। আজকের অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতির এই শাখাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত বললেই চলে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা বলে পরিগণিত হবে। বিশেষ করে যখন মানুষ তার জড়জাগতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করে ফেলবে তখন এই মানস–অর্থনীতি আরও বেশী ভাস্বর বা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠৰে।

সৃষ্টির বুকে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের উপযোগ নিতে গেলে ও সর্ববিধ অর্থনীতির সর্জনশীল সমাধান খুঁজে বের করতে এই মানস–অর্থনীতি এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

মানস অর্থনীতিতে মুখ্যতঃ যে বিষয়গুলি স্থান পাবে তারা হ'ল–সুসন্তুলিত (Balanced economy) অর্থনীতি, উৎপাদনের বিষয় নির্বাচন, আর্থিক ব্যয়–বরাদ্দ, কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, পূর্বাদ্রনীতির প্রয়োগ, সার্বিক কর্মসংস্থান নীতি, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় শ্রমিকের ভূমিকা, নারীর অর্থনৈতিক

স্বাধীনতা, উৎসাহ–প্রদান নীতি (Incentive policy), ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি, অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রভাব, উৎপাদন–বৃদ্ধি ও শ্রম হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, জীবনের মান–উন্নয়ন, ব্যবসায়নীতি, সুষ্ঠু সামবায়িক উদ্যোগের নীতি নিয়ম ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলতে গেলে অর্থনৈতিক জীবনের যা কিছু প্রত্যক্ষভাবে বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক জীবনের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও বিকাশ আলোচনার পরিভূ–র মধ্যেই পড়বে। অদূর ভবিষ্যতে মানস–অর্থনীতির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

সমাজ হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জৈবী সত্তার মত, তার একেকটি অঙ্গের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য থেকে এর নিজস্ব একটা মৌল বৈশিষ্ট্য রয়েছে; বহু জীবকোষ সমন্বিত একটি মানবদেহের যেমন জীবকোষগুলির পৃথক পৃথক প্রাণধর্ম থাকা সত্ত্বেও সমগ্র মানবাধারটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে সমাজের ক্ষেত্রেও তাই। মানব–সমাজ এক অখণ্ড গতিময় সত্তা, যা তার স্বকীয় ছন্দ ও প্রাণচাঞ্চল্যে ছন্দায়িত। সে শুধু তার আভ্যন্তরীণ সত্তাগুলির যান্ত্রিক সমাহারই নয়। সামুহিক মনস্তত্ত্ব হ'ল সামুহিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত চালিকা শক্তি। মানবের অধিবিদ্যা ও অতিজাগতিক সম্পদের মধ্যে পড়ে তার উদ্ভাবিত ভাব–ভাবনা–মতবাদ ইত্যাদি; যেমন আমাদের এই

মানস–অর্থনীতি যা মানুষকে চিন্তায় ও কাজে প্রধাবিত করে। ভবিষ্যতের নেতারা সামূহিক মনস্তত্ব জিনিসটা কী ও কী করে এটাকে পরিচালিত করা যায় সেটা যত বেশী করে জানবে, ততই মানস অর্থনীতির বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

<u>ৰাণিজ্যিক অর্থনীতিঃ</u> অর্থনীতির এই শাখাটি মুখ্যতঃ আলোচনা করবে কী ভাবে বৈজ্ঞানিক ও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা আর্থিক ক্ষতিকে এড়ানো যায় ও যাতে কম বিনিয়োগে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। ৰাণিজ্যিক অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হবে বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের সর্বাধিক উপযোগ ও সুষম বন্টনকে বাস্তবায়িত করা। এর অন্যান্য আলোচ্য বিষয়গুলো হৰে যেমন অর্থকরী ফসল নির্বাচন, উৎপাদন ও বন্টন, অঞ্চলভিত্তিক ও আন্তরাঞ্চলিক নীতি, আমদানী ও রফতানী, সুসংহত বিপণন ব্যবস্থা, মুনাফার হার নির্ণয়, কষ্ট–এ্যাকাউন্টিং বা পরিব্যয়–হিসেৰ, লাইসেন্স নীতি, প্রযুক্তি বিদ্যার স্থানান্তর নীতি, প্রযুক্তিগত মান নিয়ন্ত্রণ, ৰাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত ও লেনদেন নীতি, মূলধন সৃষ্টি, ঋণ সংক্রান্ত নীতি, সরকারী হস্তক্ষেপ, আর্থিক ও সরকারী রাজস্বনীতি, ব্যাংক ব্যবস্থা, মূলধন যোগান, বিনিময় ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা, ৰাণিজ্যিক– সংঘটন, কৃষি সহায়ক, কৃষিজ ও অকৃষি শিল্পের পরিকল্পনা প্রভৃতি।

<u>সাধারণ অর্থনীতি</u>: সাধারণ অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হবে এযাবৎ প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি–তা সে ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা প্রাউটিষ্ট যাই হোক না কেন। আজকাল সাধারণ অর্থনীতির নাম দিয়ে যার পঠন–পাঠন হচ্ছে তা–ও সাধারণ অর্থনীতির আওতাভুক্ত। সাধারণ অর্থনীতি নিয়ে ইতোমধ্যে কিছু আলোচনা হয়েছে একথা ঠিক, তবুও এই শাখাটির যথেষ্ট প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাউটের সাধারণ অর্থনীতির কাঠামো মুখ্যতঃ ত্রিস্তরীয়–বৃহৎ মুখ্য শিল্প, সামবায়িক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র (প্রাউটের অর্থনীতিতে এটাই সর্ব বৃহৎ ক্ষেত্র), আর ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যা ব্যষ্টিগত মালিকানায় চলবে। বৃহৎ শিল্প পরিচালিত হবে "না–মুনাফা না ক্ষতি" নীতির ভিত্তিতে। সাধারণ অর্থনীতির আরও আলোচ্য বিষয় হবে–অর্থনৈতিক ইনফ্রাস্টাকচার, সর্বস্তরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমন্বয় সাধন, ব্লকভিত্তিক পরিকল্পনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, জনসংখ্যা নীতি, কর্মসংস্থান নীতি, সার্বিক কর্মসংস্থান নীতি, কৃষি শিল্প সমন্বয় নীতি, অর্থনীতির সামাজিকীকরণ, সামবায়িক সংস্থাগুলির ক্রমোন্নয়ন, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি, মাইক্রোম্যাক্রো অর্থনৈতিক সমস্যা, কর ব্যবস্থা, শহর ও গ্রামের উন্নয়ন ব্যবস্থা (urban and rural development), বিকেন্দ্রীকরণ, শিল্পের ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাস, প্রতিরক্ষা প্রকল্প ও ব্যয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক আয়–ব্যয়

ব্যবস্থা (Bud- geting), উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রগতি ইত্যাদি। প্রাউটিষ্টিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনীতির এই চারটি শাখার মধ্যে নব্যমানবতাবাদের ভিত্তিতে এমনভাবে সমন্বয় ও সংযোগ সাধন করা হবে যাতে বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের সর্বাধিক উপযোগ ও সুষম বন্টনকে ত্বরান্বিত করা যায়, যার ফলে মানব প্রগতির সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য শাখার ও প্রগতির সমন্বয় সাধন করা যাবে।

জুলাই, ১৯৮৬ কলকাতা

ৰাণিজ্য ও বিনিময়

ক্রী + অচ্ = ক্রয়। 'ক্রু' ধাতুর অর্থ হ'ল বিনিময় করা। এই বিনিময় মুদ্রাতেও হয়, আবার পণ্যের মাধ্যমেও হয়। কাউকে এক কুণকে চাল দিলুম তো বিনিময়ে পেলুম দু' কুণকে শুশনি শাক। একে বলৰ ক্রয়। আবার কিছু পয়সা দিলুম, বিনিময়ে পেলুম এক ঝুড়ি পুণকো শাক*

সূচীপত্র

⁕ পুণ্যক শাক > পুনকো শাক। শীতকালে জন্মায়। বর্ধমান অঞ্চলে সুপরিচিত মিষ্টি স্বাদের শাক।

হিংচে**

⁕⁕ হিলমোচিকা > হেলেঞ্চ হিংচে।

শাক। দুই ধরণের কেনাই ক্রয় পর্যায়ভুক্ত। বাঙলায় প্রাচীনকালে মুদ্রা বিনিময়ের চেয়ে বস্তু বিনিময়ে কেনাই বেশী জনপ্রিয় ছিল। রাঢ়ের কথ্য ৰাঙলায় একে বলা হত অদল–বদল প্রথা। বীরভূমের বোলপুরের কাছে একটি গ্রামে দেখেছিলুম একজন ছুতোর বেচতে এসেছিল জোয়াল। সে বাড়ী ফিরল জোয়ালটির বিনিময়ে পেতলের বড় আকারের একটি ঘটি নিয়ে। বললুম, কত–য় কিনলে গো'। সে বললে– 'জোয়াল দিয়ে অদল–বদলে পেলম'।

বৈদেশিক বাণিজ্য যেখানে অদল–বদল প্রথায় বা বিনিময় প্রথায় হয় তাকে বলা হয় বাটার ট্রেড (Barter trade)। যে সব দেশের বেচবার বেশী কিছু জিনিস নেই, কিন্তু কেনবার আছে অনেক কিছু, আর বেচবার জিনিসগুলি সংখ্যায় কম হলেও আয়তনে বেশী তাদের পক্ষে বিনিময়–বাণিজ্য বেশী লাভজনক। অন্যথা তাদের স্বর্ণবিত্তের (gold-bullion) অল্প সময়ে ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের বাঙলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তিব্বত, কম্বোডিয়া বা

কম্পুচিয়া (সংস্কৃতে 'কম্বোজ') প্রভৃতি দেশের পক্ষে বিনিময়-বাণিজ্য বেশী সুবিধাজনক। প্রাচীন বাঙলায় বেচবার জিনিস অনেক ছিল কিন্তু কেনবার জিনিস ছিল কম। তবু ৰাঙ্গালী বেণেরা (সেকালের বাঙলায় বৈদেশিক ৰাণিজ্য গন্ধৰণিক ও সুবর্ণৰণিকেরাই বেশী করতেন; তবে অন্যান্য ৰণিকেরাও করতেন) বিনিময়-বাণিজ্য বেশী পছন্দ করতেন। তার কারণ হচ্ছে বাঙলার পোতসম্ভারের ছিল প্রাচুর্য। বাঙ্গালী সূত্রধরেরা ও জালিক কৈবর্তেরা অর্ণববিদ্যায় (marine industry) ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তাঁরা তাঁদের পণ্যসম্ভার নিয়ে বিদেশে বেচতে যেতেন। সেখান থেকে তাঁরা যদি মুদ্রা-বিনিময় প্রথায় ব্যবসা করতেন তবে ফেরার পথে তাঁদের বড় বড় জাহাজগুলিকে খালি অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হত। পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থায় তাঁরা জাহাজ-বোঝাই পণ্য নিয়ে আসতে পারতেন। সেকালের বাঙলার বিনিময়-ৰাণিজ্যের জনপ্রিয়তার এটাই ছিল মুখ্য কারণ। প্রাচীন বাঙলার- বিনিময়-বাণিজ্য সম্বন্ধে বলা হয়-

"কুরঙ্গ বদলে লবঙ্গ নিব কুমকুম বদলে চুয়া
গাছফল বদলে জায়ফল পাৰ ৰহেড়ার বদলে গুবা।"

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ছিলেন রাঢ়-বাঙলার মানুষ। সেকালের রাঢ়ের মানুষেরা সেই জিনিসই বিদেশের বাজারে চালাতেন রাঢ়ে যার উদ্ধৃত্তি ছিল আর সেই জিনিস-জাহাজ

বোঝাই করে নিয়ে আসতেন রাঢ়ে যার প্রয়োজন ছিল–যেমন লবঙ্গ, চুয়া, জায়ফল ও গুবা (প্রাচীন বাঙলায় সুপুরিকে 'গুবা' বলা হত। শব্দটি এসেছে গৃহীত সংস্কৃত 'গুবাক' থেকে। 'সুপুরি' শব্দটি উত্তর ভারতীয় শব্দ–বাঙলায় এসেছে অনেক পরে)। রাঢ়ের পশ্চিমাংশে বীরভূম, সামন্তভূম, সেনভূম, মল্লভূম, মানভূম, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সরু বাদশাহভোগ চাল (সেকালে বলা হত রাজভোগ চাল–এতেই পলান্ন রান্না করা হত), বিষ্ণুপুরী রেশম, পশমী কাল কম্বল, শালকাঠ ও শাল কাঠের সামগ্রী, বিরি কলাইয়ের ডাল, সূতীবস্ত্র, চীনী, গুড়, কাঁচা তাঁবা ও তাম্রপণ্য, সরষের তেল প্রচুর পরিমাণে লংকা দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, মিশর ও ইউরোপে রফতানী করা হত। এদের মধ্যে যে সব পণ্য জাহাজে বেশী জায়গা নিত তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য আনা হত আর অল্প জায়গা নেওয়া বেশী দামী পণ্যের বিনিময়ে আনা হত বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রা (সীনক)। বাঙলায় সিংহলপাটন, তাম্রলিপ্ত, চট্টগ্রাম বা চাটিগ্রাম বন্দরগুলি মুখ্যতঃ রফতানী ৰাণিজ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। ধূমঘাট, বেড়াচাঁপা, মহিষাদল, জীবনখালি (গেঁয়োখালি–মীর্জাপুর), নলচিতি, ঝালকাঠি প্রভৃতি মধ্যম বর্গীয় বন্দরগুলি আমদানী–রফতানী দুই কাজই অল্পস্বল্প করত। যাই হোক, তোমরা জানলে বাঙলায় মুদ্রা বিনিময় ও পণ্য বিনিময় দুই ভাবেই ক্রয়–বিক্রয় চলত।

সূচীপত্র

অতি প্রাচীন কালে ঋগ্বেদীয় যুগে (১৫,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর আগে) সভ্যতা ছিল অনগ্রসূত অবস্থায়। সে যুগে তাই ঠিক কেনাবেচা বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। সে যুগে যা ছিল তাকে বলতে পারি বিনিময় প্রথা বা অদল–বদল ব্যবস্থা। কাউকে কিছুটা যব দিলুম (সে যুগে ধান–গমের সঙ্গে মানুষ পরিচিত হয়নি), পেলুম একটা পাত্র; আবার কাউকে হয়তো দিলুম কিছুটা মুগ ডাল (মুদ্‌গ্বিদল: প্রাচীনকালে অড়হর, মসুরী ও খেসারীর সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল না। তাদের বেশী পরিচয় ছিল মটর বা কলায়ের সঙ্গে, বিরি বা মাষের সঙ্গে, আর মুগ তো ছিলই) আর সেইসঙ্গে পেলুম একটা কুলো (শূর্প > শূপ)।

অনুমান করতে পারি এই অবস্থা চলেছিল বহুকাল ধরে। এতে বৈবহারিক ক্ষেত্রে মানুষকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। যার যে জিনিসটা যখন পাওয়া দরকার সেটা হয়তো তখন সে পাচ্ছে না অথবা যে জিনিসটা যখন বেচার সেটা হয়ত তক্ষুণি বেচার সুযোগ নেই। এই অবস্থায় ক্রয়–বিক্রয়ের সম্পদকে সংরক্ষিত বিত্তে রূপান্তরিত করে সেই বিত্তকে দুঃসময়ে কাজে লাগাবার জন্যে মানুষ এই ধরণের বিনিময় বিত্তের কথা ভাবতে লাগল। ভারতে এই বিনিময়–বিত্ত প্রথম ব্যবহৃত হতে শুরু হ'ল কড়ি (কপর্দক/কর্থিকা) দিয়ে। এই

কড়িই হ'ল ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবহৃত প্রথম মুদ্রা। কোন কিছুর সঙ্গে কোন কিছুর বিনিময় করা বা অদল-বদল করার জন্যে প্রাচীন ধাতু হ'ল 'ক্রী'। এটি একটি আত্মনেপদী ধাতু অর্থাৎ 'ক্রীণীতে'। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমরূপে কড়ির যখন প্রচলন হ'ল তখন সাধারণ-বিনিময়ের ক্ষেত্রে (Barter Trade বা Barter Transaction) কড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের বৈশিষ্ট্য জানানোর দরকার মানুষ অনুভব করলে। বিনিময় যখন হতে থাকল বস্তুতে বস্তুতে, তখন সেখানে ব্যবহৃত হ'ল আত্মনেপদী রূপে 'ক্রী' ধাতু, আর বিনিময় যখন হতে থাকল কড়ির মাধ্যমে অর্থাৎ যে ধরণের বিনিময়কে আজকাল বলা হয় কেনাবেচা (to purchase or to buy: ইংরেজীতে ব্যবহৃত 'purchase' শব্দটির অর্থ বিনিময়; 'buy' শব্দটির অর্থ কেনা) সেজন্যে ধাতুটি অবশ্যই 'ক্রী' রয়ে গেল। কিন্তু তার বৈবহারিক রূপ হ'ল পরস্মৈপদী অর্থাৎ 'ক্রীণাতি'। এইজন্যে বৈদিকযুগের শেষের দিকে 'ক্রী' ধাতু হয়ে গেল উভয়পদী। পাণিনিও একে উভয়পদী বলে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন পরবর্তীকালের বৈয়াকরণিকেরাও। গুপ্তযুগ থেকে দেশে দেশে বিনিময় বাণিজ্য (Barter Trade বা Barter Transaction) যথেষ্ট মাত্রায় থেকে গেল বটে কিন্তু হাটে-বাজারে অদল-বদল ব্যবস্থা গেল কমে, মুদ্রা মাধ্যমে

কেনাবেচা চলতে থাকল। কড়ির বদলে ক্রমশঃ উন্নততর ব্যবস্থা হিসেৰে ধাতব মুদ্রা চলতে থাকল।

শব্দ চয়নিকা: একাদশ খণ্ড

*"কড়ি দিয়ে কিনলুম
দড়ি দিয়ে বাঁধলুম,
হাতে দিলুম মাকু–
একবার ভ্যাঁ কর তো ৰাপু।।"

ব্লকভিত্তিক ও আন্তৰ্ব্লক পরিকল্পন

প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাউট পরিকল্পিত অর্থনীতিকে সমর্থন করে। এই যে অর্থনীতি যার মধ্যে রয়েছে মূলতঃ চারটি ধারা –গণ–অর্থনীতি (People's economy), সাধারণ অর্থনীতি (General economy), মানসভৌম অর্থনীতি (Psycho-economy) ও বাণিজ্যিক অর্থনীতি (Commercial economy) -এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ক্রমবর্দ্ধমান হারে মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। প্রাউট ধাপে ধাপে

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে এক সুসন্তুলিত অর্থনীতিকে কায়েম করতে চায়।

পরিকল্পনার চারটি মৌলনীতি: যাঁরা বিভিন্ন স্তরে যোজনা পর্যদের সঙ্গে সংযুক্ত সেই ধরণের বড় বড় অর্থনীতিবিদদের কোন পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে যে কয়েকটি বিষয়ের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত সেগুলি হ'ল- উৎপাদনের ব্যয়, উৎপাদন-ক্ষমতা, ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা ও সামূহিক প্রয়োজনীয়তা।

এবার উপরি-উক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

উৎপাদন ব্যয়: গ্রামীণ অর্থনীতির একটা দীর্ঘ প্রচলিত রীবাজ হচ্ছে এই যে গ্রাম্য কর্ষক পরিবারে ক্ষেতে-খামারে খেটে ফসল ফলান। কিন্তু ফসলের দাম নির্ধারণের সময় দেখা যায় যে কৃষিতে সকলে মিলে যে শ্রম বিনিয়োগ করেন তার সবটার দাম হিসেবে ধরেন না। চাষীর পরিবারের সবাইকে বেতন দিতে হয় না; জমি চাস করতে গিয়ে যে যতটা খরচ পড়ে তার সবটা হিসেবে নেন না আর জমি চাস করতে গিয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় তার হিসেবও ধরেন না। সুতরাং প্রতি ইউনিট উৎপাদনের যে বাস্তবিক খরচ তার বিজ্ঞান-সম্মত হিসেৰ

তাঁরা করেন না। আর তারই ফলস্বরূপ কৃষিতে তাঁরা বরাবরই ক্ষতিগ্রস্ত হন ও ফসলের কম দাম পান।

ঠিক ভাবে কৃষিজ পণ্যের প্রতি ইউনিট উৎপাদনের যে আসল ব্যয় তা ঠিকভাবে নির্ধারণ করতে গেলে অর্থনীতির এই দিকটাকে নোতুন করে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে ও সমবায় পদ্ধতিতে শিল্পের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করা হয় সেই নীতিই কৃষির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে। প্রাউটের মতে কৃষিকেও সুসংঘটিত শিল্প হিসেবে গণ্য করতে হবে। তবেই কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রতিটি ইউনিটের আসল খরচ কত পড়ল তা ঠিক ভাবে জানা যাবে, কর্ষকের দারিদ্র্য দূর হবে, কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাৰে ও কৃষির ক্ষেত্রে একটা নিশ্চিততা দেখা দেবে।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতির এই দিকটার আরও একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে কোন শিল্পেই –তা সে কৃষিনির্ভর বা কৃষিসহায়ক যাই হোক না কেন–কোন নির্দিষ্ট কৃষিপণ্যের উৎপাদন–মূল্য তার বাজার দরের চেয়ে যেন কোন ক্রমেই বেশী না পড়ে। প্রতিটি অর্থনৈতিক ইউনিট যেন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন যোগ্য হয়।

উৎপাদন ক্ষমতা: অর্থনীতিকে এমন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে অর্থনীতি যেন আপন অন্তর্নিহিত শক্তিৰলেই অধিক

থেকে অধিকতর উৎপাদন–সামর্থ্য অর্জন করে। উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যকে বাজারে বেচে যে টাকা পাওয়া গেল তাকে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে নোতুন ভোগ্যপণ্য বিনিয়োগ করতে হবে; টাকাকে ফেলে না রেখে সচল রাখতে হবে; ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা ও সমাজের সামুহিক ধনসম্পদের পরিমাণকে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়াতে হবে।

এই নীতি অনুযায়ী চলে প্রাউটের অর্থনৈতিক সংরচনাকে গড়তে গিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা অর্থনীতিকে এমন ভাবে ঢেলে সাজাবেন যে তাতে সমাজের সামুহিক চাহিদা অনুযায়ী সর্বাধিক উৎপাদন নেওয়া যেতে পারে। এর অর্থ হ'ল পূর্ণ বিনিয়োগ নীতি ও উপভোগের লক্ষ্যের ভিত্তিতে বর্ধিত উৎপাদন নীতিকে সমর্থন জানানো। এই অনিবার্য ফলশ্রুতি হবে এই যে এতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যাবে বেড়ে। দ্বিতীয়তঃ কোন উৎপাদনক্ষম অর্থনৈতিক ইউনিটই বেকার বা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে না। তৃতীয়তঃ যদি পুরো অর্থনৈতিক কাঠামোটার সর্বাধিক উৎপাদন সামর্থ্যকে কাজে লাগানো যায় তাতে এমন একটা অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠবে যাতে বিনিয়োগকারী উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ করতে চাইবেন, ব্যাপকতর শিল্পায়নের পরিবেশ তৈরী হবে, বেশী চাকুরী সংস্থান হবে, উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি

পাৰে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাবে, ও বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যাৰে ক্ষমবর্দ্ধমান হারে।

মানুষ যেখানে সামাজিক–অর্থনৈতিক ইউনিটের চাহিদা ও সামর্থ্যকে বিচার করে চলৰে, সেক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতার নীতি কল্যাণপ্রদ হতে বাধ্য। যেখানে কাঁচা মাল সস্তা ও সহজলভ্য, উৎপাদনও সেখানে সহজসাধ্য হয়ে উঠৰে।

ক্রয়ক্ষমতা: পরিকল্পনার আরও একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল সমাজের প্রতিটি মানুষের ক্রয়–ক্ষমতা বাড়ানো। মানুষের মাথা পিছু আয়কে এ পর্যন্ত জনসাধারণের অর্থনৈতিক সূচক উন্নতির যথার্থ মান বলে গণ্য করার যে প্রথা প্রচলিত আছে প্রাউট তা সমর্থন করে না। মাথা পিছু আয়ের হিসেবে সমাজের সামুহিক সম্পদের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা একটা বিভ্রান্তিকর প্রতারণামূলক ও অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতি। সাধারণ মানুষকে বোকা বানাবার জন্যে ও তাদের শোষণকে জনসমক্ষে ধামাচাপা দেবার জন্যে পুঁজিবাদের তল্পীবাহক অর্থনীতিবিদরা এই তত্ত্বটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রাউটের সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল এই যে মানুষের যথার্থ অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাবে মানুষের মাথা–পিছু আয় দেখে নয়, তার বাস্তবিক ক্রয়ক্ষমতা দেখে। কে কত হাজার টাকা নগদ আয় করল সেটা বড়

কথা নয়, আয়ের টাকায় সে কতটা ভোগ্যপণ্য পেল সেটাই বড় কথা।

জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে গেলে যে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে সেগুলি হ'ল–(১) মানুষের সামূহিক প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত সামগ্রীর যোগান দিতে হবে; (২) ভোগ্যপণ্যের বাজার–দর মূল্য বেঁধে দিতে হবে; (৩) মুদ্রাস্ফীতিকে রোধ করতে হবে; (৪) ক্রমবর্দ্ধমান হারে মাঝে মাঝে মজুরী ও মাসিক আয়ের পরিমাণ ৰাড়াতে হবে; (৫) সামূহিক সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে যেতে হবে।

প্রাউট অর্থনীতিতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার কোন সর্ব্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ প্রাউট অর্থনীতির রূপায়নকারীদের দায়িত্ব থাকবে এই যে তাঁরা মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে ক্রমবর্দ্ধমান হারে বাড়িয়েই যাবেন। কোন একটা বিশেষ সময়ে মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করা হবে ও তার পর থেকে স্থান–কাল–পাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রয়ক্ষমতাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়েই যেতে হবে। তাই প্রাউটের লক্ষ্য হ'ল সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ইউনিটের আর্থিক উন্নতি অনুযায়ী মানুষের ক্রয়–ক্ষমতা ক্রমবর্দ্ধমান হারে বাড়িয়ে চলা।

সূচীপত্র

সামূহিক প্রয়োজন: যাঁরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপকার তাঁদের উচিত আজকের মানুষের সামূহিক প্রয়োজনটা কী, আবার ভবিষ্যতের মানুষের প্রয়োজনটাই বা কী হবে সে সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা রাখা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমাদের ভারতবর্ষে এ যাবৎ অনেক শিল্প–কারখানা স্থাপিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃদ্ধির কোন বাস্তব পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে শিল্পোন্নয়ন যে হারে হয়েছে সে হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়নি। বাঙলা ও বিহারের ক্ষেত্রে এ জিনিসটা অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটে উটেছে। মানুষের সামূহিক প্রয়োজন পূর্তির ক্ষেত্রে এক একটা বড় রকমের সমাঞ্জস্যহীনতা–একটা বড় রকমের প্রমাহীনতা।

প্লানিং মেসিনারী: প্রাউটের যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা–মেসিনারি, তা মুখ্যতঃ কাজ করবে কেন্দ্রীয় স্তরে, রাজ্যস্তরে, জেলাস্তরে ও ব্লক স্তরে (অবশ্য ওয়ার্লড গবমেন্ট প্রতিষ্ঠার পরে গ্লোব্যাল স্তরেও এই পরিকল্পনা মেসিনারী কজে করবে।) যে পরিকল্পনা –মেসিনারী কাজ করবে প্রাউটের অর্থনীতিতে তাই হবে সর্বনিম্ন পরিকল্পনা–সংস্থা। অর্থনৈতিক ক্ষমতার

বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে পবিকল্পনাকে নীচের থেকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সেটাই হচ্ছে নীতি।

আজকাল যেভাবে ব্লকগুলির সীমানা নির্ধারিত হয় তা অনেকটা রাজনৈতিক বিচার–বিবেচনার ভিত্তিতে। প্রাউট এ ধরণের রাজনৈতিক খেয়ালখুসীমত সীমানা নির্ধারণ নীতিকে সমর্থন করে না। প্রাউটের বক্তব্য হ'ল, কয়েকটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্লকগুলির সীমানা নির্ধারিত করতে হবে– (১) সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূ–প্রকৃতি (নদী–উপত্যকার কথাও মনে রাখতে হবে), (২) জলবায়ুগত অবস্থা (varying climatic condition), (৩) জমির ঢাল (Topography), (৪) স্থানীয় মৃত্তিকার প্রকৃতি (Nature of soil), (৫) সংশ্লিষ্ট এলাকাটির মানুষের সামাজিক–অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সমস্যা, (৬) সেখানকার পশু–পক্ষী ও উদ্ভিদের কথা, (৭) সেখানকার মানুষের শারীরিক, মানসিক আশা–আকাঙ্ক্ষার কথা। সুষ্ঠু, বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই এই বৈজ্ঞানিক ও বিধিসম্মত ব্লক সীমানা নির্ধারণই ভিত্তি হিসেবে নেওয়া উচিত। যখন বিশেষ কোন একটা নির্দিষ্ট ব্লকের সর্বাত্মক বিকাশের জন্যে পরিকল্পনাসূচী তৈরী করা যায় তাকে বলা হয় আন্তর্ব্বক পরিকল্পনা (Intrablock planning)। প্রাউট অর্থনীতির কাঠামোয় প্রতিটি ব্লকের জন্যে পৃথক পৃথক উন্নয়ন

সূচীপত্র

পরিকল্পনা থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সেই সংশ্লিষ্ট ব্লকটিকে ওই অর্থনৈতিক এলাকার (Economic Zone) উন্নয়ন পরিকল্পনার সর্ব্বোচ্চ পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হবে।

আবার একটি ব্লকেরই এমন অনেক সমস্যা থাকতে পারে যার সমাধান ওই সংশ্লিষ্ট ব্লকটির হাতে নেই–যেমন বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদী–উপত্যকা পরিকল্পনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বন–রচনা, আর্থিক উন্নতির পরিবেশগত প্রভাব, বড় বড় শিল্পের স্থাপনা, ভূমিক্ষয় রোধ, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সুপরিচালিত বাজার ইত্যাদি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কোন একটি ব্লক নিশ্চয় করতে পারবে না। তাই ইন্টার–ব্লক (Inter-block planning) পরিকল্পনা অবশ্যই দরকার। এই ইন্টারব্লক পরিকল্পনা হ'ল সুনির্বাচিত কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন এক অর্থনৈতিক উদ্যোগ যার দ্বারা পাশাপাশি কয়েকটি ব্লকের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলির যৌথ উন্নয়ন ঘটানো যায়। প্রাউট অর্থনীতিতে ব্লকস্তরীয় পরিকল্পনা সংস্থাগুলিকে সংবিধানগত স্বীকৃতি দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, পঞ্জাবের উন্নয়ন–প্রকল্প ও কৌবেরী উপত্যকার উন্নয়ন প্রকল্প নিশ্চয়ই এক ধরণের হবে না। পঞ্জাব উন্নয়ন প্রকল্প রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে পঞ্জাব মানেই হ'ল পঞ্চ নদীর দেশ–শতদ্রু (Sutle), বিপাশা (Bias), ইরাবতী

সূচীপত্র

(Ravi), চন্দ্রভাগা (Chenub) ও বিতস্তা (Jhelam)। সব ক'টি নদীই হিমালয় পর্বত থেকে বেরিয়েছে। তাই হিমালয়ের বরফ–গলা জলে তারা বার মাসই পূর্ণ থাকে। অপর দিকে কৌবেরী উপত্যকার নদীগুলি ঘাট থেকে উৎপন্ন ৰলে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে জল থাকে। পঞ্জাবের নদীগুলির মত বার মাস বরফগলা জলে পুষ্ট থাকে না। অবশ্য এটা ঠিক যে কৌবেরী উপত্যকায় বছরে দু'বার বর্ষাঋতু আসে; তা সত্ত্বেও নদীগুলি বরফগলা জলে টইটুম্বুর থাকে না। তাই সেখানে পঞ্জাবের নদীগুলি থেকে অনায়াসে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে, কৌবেরী উপত্যকার নদীগুলিতে সে সুযোগ নেই। যেমন ভাকরা–নাঙ্গাল বাঁধ থেকে আমরা যেভাবে বা যতটা জলবিদ্যুৎ পেতে পারি কৌবেরী বা তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে আমরা সে পরিমাণ জলবিদ্যুৎ আশা করতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ কৌবেরী উপত্যকা বিষুবরেখার নৈকট্য নিবন্ধন তাতে শীত–গ্রীষ্ম ঋতুর প্রভাব প্রকটভাবে অনুভূত হয়– জলবায়ু চরম ধরণের। পঞ্জাবের জলহাওয়াও চরম কিন্তু সেটা অন্য কারণে। পঞ্জাবের উত্তর–পূর্ব ও পূর্ব কোণ থেকে বয়ে আসা দুরন্ত বায়ুর প্রকোপে পঞ্জাবের জলবায়ুও চরম আকার ধারণ করে। কৌবেরী উপত্যকায় এ ধরণের দুরন্ত বায়ুর প্রকোপ নেই।

সূচীপত্র

তৃতীয়তঃ কৌবেরী উপত্যকার যে অংশটাকে আমরা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বলি তা মুখ্যতঃ ঢেউখেলানো লাল মাটির দেশ। কৌবেরী উপত্যকার একটা ছোট অংশ পলিমাটি দিয়ে তৈরী সমভূমি। পঞ্জাবের সবটাই সমভূমি। কাজেই উভয় ভূমির জন্যে উন্নয়ন–পরিকল্পনা তৈরী করতে গিয়ে জলবায়ু ও ভূ–প্রকৃতিগত তারতম্যের কথা মনে রাখতে হবে।

চতুর্থতঃ দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপে রয়েছে চারটি উপকূল ভাগ– মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত উৎকল উপকূল, গোদাবরী থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত করমণ্ডল উপকূল, কন্যাকুমারী থেকে গোয়া পর্যন্ত মালাবার উপকূল, ও গোয়া থেকে গুজরাত পর্যন্ত কোঙ্কন উপকূল। এই বিস্তীর্ণ উপকূল ভাগকে ভারতবর্ষের শস্যভাণ্ডার Granaria of India বলা হয়। কিন্তু তেলেঙ্গানা এলাকায় খাদ্যাভাব লেগেই আছে।

কৌবেরী উপত্যকার পূর্বাঞ্চল–করমণ্ডল উপকূল ভাগের জন্যে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা উচিত। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে তালগাছ জন্মায়, নারকোল গাছ জন্মায় না কিন্তু উপকূলভাগে তাল–নারকোল দুই–ই জন্মায়।

তাই বলছিলুম বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে গেলে সেখানকার ভূ–প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকার ধরণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির কথা মনে রেখে তদনুযায়ী

পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। তাই পঞ্জাব ও কৌবেরী উপত্যকার পরিকল্পনা কখনও এক ধরণের হবে না।

***   ***   ***   ***

আগেই বলেছি, ব্লক-স্তরীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনা থেকে নানান সুফল পাওয়া যাবে। যেমন, যে ব্লকের জন্যে উন্নয়ন-পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে তার ভৌগোলিক আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়ায় পরিকল্পনা-প্রণেতারা সংশ্লিষ্ট ব্লকটির ছোট-বড় সব সমস্যার কথাই জানতে পারছেন, স্থানীয় নেতারা এলাকাটির জরুরী সমস্যার সমাধান কল্পে এগিয়ে আসতে পারবেন; সুদূর রাজধানী শহরের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে নয়, একেবারে সংশ্লিষ্ট ব্লকটির কঠোর মাটিতে বসে উন্নয়ন-পরিকল্পনার ছক তৈরী হচ্ছে বলে সে পরিকল্পনা অধিক বাস্তবোচিত ও ফলপ্রদ হতে বাধ্য; ও শীঘ্র তার সুফলও পাওযা যাবে। স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যদগুলিও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনবল ও বস্তুসম্পদকে কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে, স্থানীয় বেকার-সমস্যার সহজেই সমাধানের সুযোগ আসবে। গ্রাম্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, আর সুসন্তুলিত অর্থনীতির একটা মজবুৎ বুনিয়াদ তৈরী হবে।

সূচীপত্র

প্রমার প্রতিষ্ঠা

যে ধরণের ব্লক উন্নয়ন প্রকল্পের কথা বলা হ'ল সেই ধরণের পরিকল্পনা রচিত হলে একটা সুসন্তুলিত অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠবেই, সমাজের প্রতিটি সদস্যের আর্থিক নিরাপত্তা আসবেই কেননা তার দ্বারা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির (খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা) পূরণ করা সম্ভব হবে। এতে সমাজে একটা উপযুক্ত ভারসাম্য ও স্থিতাবস্থা (যাকে এককথায় বলৰ 'প্রমা') প্রতির্ষ্ঠিত হৰে, সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপত্রিকোণগুলির মধ্যে একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য আসবে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শক্তি ও জল সরবরাহ, মূলধন বিনিয়োগ, উৎপাদন, বণ্টন, যোগান ও চাহিদা-সব ক্ষেত্রেই একটা প্রমার অনুকূল পরিবেশ তৈরী হবে। অর্থনীতির প্রতিটি উপস্তরে ও আন্ত-উপস্তরীয় ক্ষেত্রের প্রমা প্রতির্ষ্ঠিত হবে।

ভৌতিক ক্ষেত্রে প্রমা প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে ৰলৰ তখনই যখন নিম্নোক্ত চারটি জিনিস দেখতে পাবো-

ভৌতিক স্তরে সামরস্যপূর্ণ লোক-ত্রিকোণ তথা প্রমা-ত্রিকোণ তৈরী করতে গেলে চারটি তত্ত্বের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

(১) বর্তমান কালের ভৌতিক চাহিদা ও নিকট ভবিষ্যতের ভৌতিক চাহিদা;

(২) বর্তমান কালের ভৌতিক যোগান ও নিকট ভবিষ্যতের ভৌতিক যোগান;

(৩) ভূমির সর্বাধিক উপযোগ গ্রহণ;

(৪) প্রাউটের পঞ্চ মৌল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ের সমস্যা

সমাধান;

উপরি-উক্ত চারটি তত্ত্বের যেখানে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখন ধরে নিতে হবে যে ভৌতিক স্তরে প্রমা-সংবৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর থেকে মানুষ মানসিক স্তরে প্রমা-ঋদ্ধি ও আধ্যাত্মিক প্রমা-সিদ্ধির জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

শাসন ব্যবস্থার কয়েকটি রূপ

সূচীপত্র

'খণ্ডিণ' শব্দের একটি অর্থ হ'ল যে বস্তু অনেকগুলি টুকরো বা অংশের সমবায়ে তৈরী যেমন 'বল্কান'। বল্কান বলতে বোঝায় সেই ভূখণ্ডকে যা গ্রীস, রোমানিয়া, এ্যালবানিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রের সমবায়ে 'তৈরী'।

'খণ্ডিণ' শব্দের অপর একটি অর্থ হ'ল ইংরেজীতে যাকে বলে Federal state অর্থাৎ যে রাষ্ট্র অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যের সমবায়ে তৈরী যেমন ভারত রাষ্ট্র। এখানকার সংবিধান অনুযায়ী Federal government বা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছে অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য বা Unitary state। মনে রাখা দরকার unitary আর unitar- ian শব্দ দু'টি সমার্থক নয়, Totalitarian-এর থেকে এদের দুয়ের পার্থক্যও স্মর্তব্য। সংবিধানে Federal state বা কেন্দ্রীয় সরকার ও Unitary state বা অঙ্গরাজ্যের সীমানা ও অধিকার নির্দ্ধারিত করে দেওয়া আছে। শিল্প, শক্তি (power), সেচ, যোগাযোগ ব্যবস্থা আংশিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের, আংশিকভাবে অঙ্গরাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে। আবগারীও আংশিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের (যেমন চীনী, তামাক, পাট, চা, কয়লা) হাতে, তেমনি আংশিকভাবে অঙ্গরাজ্য সরকারের হাতে (গাঁজা, ভাঙ, মদ) দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে পাট,

চা, তামাক ও কয়লা বাঙলার এই চারটি প্রধান অর্থকরী পণ্যের কোন একটিও কিন্তু অঙ্গরাজ্যের এক্তিয়ারে নেই।

এমন কতকগুলি ক্ষমতা ছিল যা অঙ্গরাজ্যে দেওয়া হয়েছিল। পরে সংবিধান সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পাটশিল্প গোড়ার দিকে রাজ্য সরকারের হাতে ছিল, পরে চলে যায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। শিক্ষা গোড়ার দিকে মোটামুটি বিচারে অঙ্গরাজ্যের হাতে ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করে দিতেন, ব্যয় বরাদ্দ করে দিতেন, কিন্তু এখন শিক্ষা দুয়েরই হাতে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও অন্যান্য বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা, মুদ্রা প্রভৃতি যা গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল তা আজও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই রয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ ব্যবস্থা গোড়ার দিকে সম্পূর্ণভাবেই অঙ্গরাজ্যের হাতে ছিল। এখন তা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আসায় অঙ্গরাজ্য সরকারের অধিকার খর্বিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংরক্ষিত পুলিশ CRP (Central Reserve Police) গোড়ায় সংবিধানগতভাবে ছিল না, এখন তা হয়েছে।

যাই হোক পৃথিবীর অনেকগুলি দেশে এ ধরণের ফেডারাল্যাল সরকার রয়েছে। রয়েছে আমেরিকাতে, রয়েছে

সূচীপত্র

রাশিয়াতে। কোন কোন ফেডারাল রাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের কিছু কিছু বৈদেশিক ক্ষমতাও আছে। তারা রাষ্ট্রসংঘে (UNO) সদস্য পাঠাবার অধিকারীও। রুশ দেশের অঙ্গরাজ্যগুলির কাগজে কলমে অনেক ক্ষমতা থাকলেও এমনকি স্বায়ত্ত-শাসনের তো বটেই, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকলেও কার্যক্ষেত্রে কিন্তু কোন ক্ষমতা নেই বললেই চলে। গ্রেট ব্রিটেনের অঙ্গরাজ্য রয়েছে-যেমন ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড, আলষ্টার (উত্তর আয়ারল্যাণ্ড)। তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। দু'একটি বিশেষ ক্ষমতা বাদে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির অবস্থা প্রায় নগরপালিকা বা Municipality-র মতই। তাঁরা ভালভাবে শাসন চালাতে পারছেন না, এই যুক্তি দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত রাজ্যপালের পরামর্শক্রমে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন, বিধানসভা (Legislative As- sembly) বা ব্যবস্থাপক পরিষদকে (Legislative Council) খারিজও করে দিতে পারেন, তা' সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্য সরকারের পরিষদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যত বেশীই হোক না কেন। লক্ষ্ণীয় এই যে সংবিধান সংশোধনের ফলে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা ৰাড়ানো হয়নি বললেই চলে; বরং ধাপে ধাপে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়েছে।

ফেডারাল স্টেটগুলির মধ্যে কোন কোনটি আবার রাষ্ট্রপতিগত; কোন কোনটি আবার পার্লামেন্টগত। যেখানে

পার্লামেন্টগত সেখানে সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর হাতে; যেখানে রাষ্ট্রপতিগত সেখানে সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের হাতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হাতে আছে দুর্দান্ত ক্ষমতা। ভারতে প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা নেই বললেই চলে। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনসাধারণের কোন প্রত্যক্ষ অধিকার বা দায়দায়িত্ব নেই। কিন্তু কোন কোন দেশের, বিশেষভাবে যে দেশের শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিগত (presidential) সেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় জনসাধারণের বোটের আধারে, কতকটা যেন প্লেৰিসাইটের মত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, ফেডারাল্যাল রাষ্ট্রের শাসনে অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজও পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলছে। নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে বলৰ পার্লামেন্টগত গণতন্ত্রে আজও ব্রিটেন সবার ওপরে চ্যাম্পিয়ান হয়ে রয়েছে। কেউ তাকে টেক্কা দিতে পারেনি। আর presidential বা রাষ্ট্রপতিগত শাসন ব্যবস্থায় রুশের চেয়ে আমেরিকা অনেক বেশী এগিয়ে। ফ্রান্সের সংবিধানগত ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা থাকলেও তা এমনভাবে নির্মিত যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কিছুটা নড়বড়ে হতে বাধ্য। ফ্রান্সের

পেত্যা–র আমলে জিনিসটা খুব ভালভাবে ধরা পড়েছিল। যাইহোক, তোমরা বুঝলে federal state বা federated state এর উপযুক্ত শব্দ হচ্ছে 'খণ্ডিণ রাষ্ট্র'।

*** *** *** ***

'খণ্ডিণ' শব্দের আরেকটি অর্থ হ'ল যার নানান বিভাজন রয়েছে। এই ধরো না আমাদের আনন্দমার্গ দর্শন। এটি মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক দর্শন (based on spirituality)। কিন্তু এর মধ্যে মানসিক স্তরের ভারসার (equipoise) ও ভারসাম্য (equlibrium) রক্ষার জন্যে বিশেষ ভাবে যে তত্ত্বটি রচিত হয়েছে তার নাম Neo-humanism বা নব্যমানবতাবাদ। আবার যদিও মানুষের অস্তিত্ব মুখ্যতঃ মানসিক ও আধ্যাত্মিক কিন্তু স্থৌল অস্তিত্বের জন্যে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের অর্থনৈতিক–রাজনৈতিক টানাপোড়েনও রয়েছে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে একটি সুষম সমাধান চাই। এই সমাধানের দিগ্দর্শনের জন্যে যে দর্শনটি রয়েছে তার নাম 'প্রাউট' (Prout: Progressive Utilisation Theory)। তাই আনন্দমার্গ দর্শন হচ্ছে সর্বানুস্যূত খণ্ডিণ দর্শন।

***   ***   ***   ***

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে নানান পরীক্ষা–নিরীক্ষা করছে। দীর্ঘকালের রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলস্বরূপ মানুষ যে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো উদ্ভাবন করেছে তাদের কয়েকটির সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হ'ল–

(১) **স্বায়ত্তশাসন** (Autonomy)- যেখানে কোন জনগোষ্ঠী আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন।

(২) **স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র** (Autocracy)- যেখানে শাসনকর্তার স্বেচ্ছাচার– খেয়ালখুশী মাফিক শাসনতন্ত্র পরিচালিত হয়। (Ruling as per one's whims).

(৩) **আমলাতন্ত্র** (Bureaucracy)- যে শাসন ব্যবস্থায় রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নয়, রাজ্যের বা রাষ্ট্রের সরকারী আমলাদের খেয়ালখুশী মত শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয় (Ruling as per the whims of government offcials)।

(৪) **ওলিগার্কি** (Oligarchy)- যে শাসন ব্যবস্থায় সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থের প্রেরণায় রাষ্ট্রপরিচালনা করে।

(৫) **রাজ্য** (Kingdom)-যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় রাজাই হলেন সর্বময় কর্তা (A state having a king as a ruler)। রাজ্য ও রাজতন্ত্রের মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে যে অঞ্চলটায় রাজার শাসন চলছে তা হ'ল রাজ্য। আর রাজতন্ত্র এক শাসন–ব্যবস্থা। তাই Kingdom হ'ল material noun আর রাজতন্ত্র হ'ল ভাববাচক বিশেষ্য।

(৬) **সাম্রাজ্য (**Empire)-যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় একজন সম্রাট রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। এখানে সম্রাট বলা হচ্ছে তাঁকে যিনি নিজের রাষ্ট্রে ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেও স্বীকৃত (An emperor is a king ruling over other countries along with his own)।

(৭) **সামন্ততন্ত্র** (Feudalism)- যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় কোন সামন্ত নৃপতি বড় নৃপতির অধীনে শাসন পরিচালনা করেন (A feudal chief is a king under a big king)|

(৮) **সাধারণতন্ত্র** (Republic)- যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত।

(৯) **গণতন্ত্র** (Democracy) - যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় সংশ্লিষ্ট সরকার সীমিত অথবা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। যে গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হন তাঁকে বলা হয় সাধারণতন্ত্র। আর যে গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত নন সে দেশকে সাধারণতন্ত্র বলা যাবে না। হয় সেটা একটা রাজ্য বা সাম্রাজ্য (Kingdom or monarchy) অথবা ওলিগার্কি অথবা সীমিত সাধারণতন্ত্র (Restricted Republic)। এ বিচারে ভারতবর্ষ গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র দুই–ই। আমেরিকা যুক্তরাজ্যও তেমনি গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র দুই–ই। কিন্তু গ্রেটব্রিটেনকে ৰলৰ গণতন্ত্র ও রাজ্য (Kingdom)। এ বিচারে অস্ট্রেলিয়া হ'ল গণতন্ত্র, কিন্তু তাকে সাধারণতন্ত্র বলা যাবে না, কারণ অস্ট্রেলিয়া সংবিধান অনুযায়ী ব্রিটিশ রাজা বা রাণীকে অস্ট্রেলিয়ার নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে মান্যতা দেয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রাজা অথবা বংশানুক্রমিক কোন রাষ্ট্রপ্রধান নেই। সেইসঙ্গে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ও (People's democracy) নেই। তাই তা' হ'ল একটি সীমিত সাধারণতন্ত্র (Restricted Republic)।

("Sarkar's English Grammar & Composition" থেকে উদ্ধৃত)

(১০) **পূর্ণতন্ত্রবাদ** (Totalitarianism)- যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করে। Totalitarian মানে হ'ল সমগ্র–সম্বন্ধীয়। এই ধরণের

শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের মতামতের কোন মূল্য থাকে না। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলটির ইচ্ছা–অনিচ্ছাই সব কিছু। ষ্ট্যালিনের আমলে তার মুখের কথাই ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আইন।

(১১) **ফ্যাসিবাদ** (Fascism)- যে শাসন ব্যবস্থা স্থূল ক্ষাত্রমনোভাবাপন্ন এক বা একাধিক নেতার পাশবিক শক্তির (brute force) দ্বারা চালিত। বেনিতো মুসোলিনীর আমলে ইতালীতে এই ধরণের ফ্যাসিবাদ প্রচলিত ছিল, যদিও সে দেশে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল আসলে বেনিতো মুসোলিনীর হাতে।

(১২) **নাৎসীবাদ** (Nazism)-এমন এক ধরণের শাসন ব্যবস্থা যা স্থূল ক্ষাত্রমনোভাবাপন্ন এক বা একাধিক নেতার পাশবিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল এই যে হিটলারের সময় জার্মানীতে এক নির্বাচিত উপদেষ্টা পরিষদ ও (Elected Advisory Council) ছিল।

(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৭ কলিকাতা)

আদর্শ সংবিধানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ

সমাজচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে মানুষের সমাজে কিছু সংস্থার উদ্ভব হয়। তাদের মধ্যে রাষ্ট্র হ'ল একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। একটা বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠী নিজের মঙ্গল ও উন্নতির প্রয়োজনে নিজেদের শাসন পরিচালনার জন্যে যে সংস্থার সৃষ্টি হয় তাই হ'ল রাষ্ট্র। এই সংস্থা খুবই শক্তিশালী কারণ দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা তারই হাতে ন্যস্ত।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হ'ল খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার যদি কোন আইন বা আদর্শের দ্বারা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা না করা হয়। যে নির্দেশক পুস্তকে রাষ্ট্রের আচরণবিধি, আইন ও আদর্শকে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বলে সংবিধান। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রকে তার নীতি ও আদর্শের সাহায্যে জনসাধারণকে দ্রুত প্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নমূলক সেবাকাজের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করে।

সূচীপত্র

বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান রচিত হয়েছিল আড়াই হাজার বছর আগে বৈশালীর লিচ্ছবি রাজত্বকালে। তার আগে রাজার মুখের কথাই ছিল আইন, আর রাজা মন্ত্রিমণ্ডলীর উপদেশ অনুসারেই রাজ্য শাসন করতেন। প্রথম প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লিচ্ছবীদের দ্বারা। লিচ্ছবীরাজ্যের এলাকা ছিল বর্তমান বিহারের মুজাফফরপুর, বেগুসরায়ের কিয়দংশ, সমস্তিপুর, গণ্ডক ও কমলা নদীর অন্তর্বর্তী হাজিপুর নিয়ে। লিচ্ছবী রাজ্যই ছিল বিশ্বে প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাদের নিজস্ব লিখিত সংবিধান ছিল।

ব্রিটিশ সংবিধান বলে কিছু নেই, এর কোন লিখিত রূপ নেই। এ শুধু কতকগুলি লোকাচার ও দেশাচারের সংকলন। তত্ত্বের দিক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাজা অথবা রাণী। তত্ত্বতঃ সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা রাজা বা রাণীর হস্তে ন্যস্ত কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীই সমস্ত ক্ষমতা সংসদীয় সরকারের প্রধানরূপে কাজে লাগান। ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential form of government)। মার্কিন যুক্তরাষ্টেও রয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। ফ্রান্স ও আমেরিকা উভয় দেশেরই লিখিত সংবিধান রয়েছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তাঁর সেক্রেটারীদের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করেন ও দেশশাসন করেন। রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ

কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন, তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন না, পরিবর্তে কিছু সংখ্যক সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। কিন্তু ফ্রান্সে মন্ত্রিমণ্ডলী আছে। যখন ব্রিটেনে কোন মন্ত্রিমণ্ডলী থাকে না তখন রাজা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা (Lame-duck ministry) তৈরী করে নেন। যতদিন না নির্বাচনের মাধ্যমে নোতুন সংসদ গঠিত হচ্ছে ততদিন এই অন্তর্বর্তীকাল মন্ত্রিসভা দিয়ে রাজা কাজ চালান। ভরতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেই বললেই চলে, তিনি শুধু সই দেন বা রাবার–ষ্ট্যাম্প। রাষ্ট্রপতির এমন ক্ষমতাও নেই যার দ্বারা তিনি একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারও (caretaker) পরিচালিত করতে পারেন। ভারতীয় সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারেন; কিন্তু রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করতে পারেন না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীকে সংবিধানে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। তিনি প্রথমে সংসদের সদস্য হিসেৰে নির্বাচিত হন; তারপর তাঁর দল তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেৰে মনোনীত করে। রাষ্ট্রপতিশাসিত আমেরিকার সংবিধান তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সংবিধান থেকে ভালো, কিন্তু আমেরিকার সংবিধানেও কিছু ত্রুটি আছে। আর সেই ত্রুটি হ'ল এই যে বৈয়ষ্টিক অধিকারের ওপর সেখানে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ।

ভারতবর্ষেও আজ সেই একই দুরবস্থা আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতে আজ আঞ্চলিকতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আদর্শ সংবিধান রচনার জন্যে অতিরিক্ত ব্যষ্টি স্বাধীনতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার। সব কিছুর ওপরই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন যাতে সমষ্টির স্বার্থ সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার নিশ্চিততা নেই। রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার। রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে হবে আর সেখানে ব্যষ্টিস্বাধীনতা অবশ্যই কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হবে।

সংবিধানের সাধারণ কতকগুলি ত্রুটি:

প্রতিটি মানুষেরই জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের অধিকার আছে। কিন্তু কিছু কিছু দেশের সংবিধান এমনভাবে লিখিত হয়েছে যে সেখানে সকল মানুষের সার্বিক বিকাশের কোন সুযোগ রাখা হয়নি। সংবিধান হবে ত্রুটিমুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত। সংবিধান যাঁরা রচনা করবেন, তাঁদের পক্ষে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠী বা ভাষাগোষ্ঠী অথবা বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত কোন গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করতে পারে। এর ফলস্বরূপ সমাজের সামগ্রিক শান্তি ও সমৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়।

এ বিচারে ভারতীয় সংবিধানের কিছু কিছু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে। মনে রাখতে হবে, এই ভারতবর্ষ একটি নানান জাতি–ধর্মমত–বর্ণ–ভাষা–সম্প্রদায়ের বাসভূমি। তাই যে দেশ বা রাষ্ট্রে এত বৈচিত্র্যময়তা তার সংবিধান রচনা করতে গিয়ে সংবিধান প্রণেতাদের সকল দিকে নজর রাখতে হবে যাতে এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা সুগভীর ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে।

ভারতের জনসংরচনার বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে এখানে অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয়ান, নিগ্রোয়েড ও আর্য এই চারি জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভুত এক সংকর (blended) জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্নিহিত ত্রুটির কারণে এই সব বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক নৈকট্য, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (cultural legacy) সমতাৰোধ ও জাতীয় ঐক্য প্রতির্ষ্ঠিত হয়নি। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জেগে উঠেছে।

ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটি:

ভারতীয় সংবিধানে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ত্রুটি আছে তার মধ্যে অন্যতম হ'ল–এখানে **পুঁজিপতি শোষণকে প্রতিহত করার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।** কারণ স্বাধীনতা

আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ কোন অর্থনৈতিক আন্দোলন করেননি। তাঁদের আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ–বিরোধী আন্দোলন যার ফলে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তা কখনই অর্থনৈতিক আন্দোলনের রূপপরিগ্রহ করেনি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শ্বেত জনগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের অবসান ঘটল ঠিকই কিন্তু বাদামী জনগোষ্ঠীর শোষণ (brown exploita- tion) শুরু হ'ল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতায় শুধু রাজনৈতিক মুক্তি এসেছে, অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। আজও সেই অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এই **সংবিধানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থাই নেই।** তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপতির হাতে এমন কোন ক্ষমতা নেই যার দ্বারা তিনি রাষ্ট্রীয়–অর্থনীতি সংক্রান্ত যে কোন বিষয় বা বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কতিপয় ব্যবসায়ী কর্তৃক পরিচালিত 'চেম্বার্স অব কমার্স' নামে কয়েকটি সংস্থার দ্বারা। দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করা অথবা অর্থনৈতিক শোষণকে প্রতিহত করার কোন ক্ষমতা ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নেই। শুধু রাষ্ট্রপতি নন প্রধানমন্ত্রীও এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। চতুর্থতঃ সংবিধানে সামাজিক–অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে ব্লকভিত্তিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। পঞ্চমতঃ দেশে

অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কোন স্বচ্ছ ধারণাও এই সংবিধানে নেই।

এছাড়াও ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলো মনস্তাত্বিক ত্রুটিও রয়েছে। প্রথম ত্রুটি হ'ল জাতীয় ভাষা রূপে একটি বিশেষ ভাষাকে সমগ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া। একটা বিশেষ অঞ্চলের ভাষাকে সংবিধান মারফৎ রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করায় অন্যান্য ভাষাভাষীর ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। সংবিধান কর্তৃক এই ধরণের ত্রুটিপূর্ণ ভাষানীতি গৃহীত হবার ফলে অন্যান্য ভাষীরা জাতীয় স্তরে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের হিন্দী অথবা ইংরাজী শিখতে ও ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ হিন্দী বা ইংরাজী কোনটাই ভারতের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক ভাষা নয়। এর ফলে অ–হিন্দী ভাষাভাষীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হন। ভারতের মত বহু ভাষাভাষী, বহুজাতিক ও বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্যে কোন অঞ্চল বিশেষের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্থান দেওয়া উচিত নয়। এমন কোন ভাষাকে স্থান দেওয়া উচিত যা বিশেষ কোন অঞ্চলের ভাষা নয়। হিন্দী হ'ল তামিল, তেলুগু বা টুলু ভাষার মতই একটা আঞ্চলিক ভাষা। ভাষা হিন্দী হিসেৰে যেমনই হোক না কেন জোর করে তা কখনই অন্যের ওপর চাপানো উচিত নয়।

সংবিধানগতভাবে ভারতবর্ষ হ'ল 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র, আর পাকিস্তান হ'ল ইসলামিক রাষ্ট্র ও নেপাল হ'ল হিন্দু রাষ্ট্র। তারা বিশেষ কোন ভাষাকে অপরের ওপর ইচ্ছা করলে চাপাতেও পারে, নাও চাপাতে পারে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা চলতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে চাই সকল মানুষের মানসিক–সামাজিক–অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে সমান সুযোগ ও সুবিধা।

ভারতীয় সংসদে যখন রাষ্ট্র ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল তখন গণ পরিষদ এই প্রশ্নে সমানভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেদিন সেই সংকটজনক মুহূর্তে তার বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে হিন্দীর অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর একটামাত্র জয়–পরাজয় নিষ্পত্তিমূলক ৰোটে **(casting vote) হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি পেল।**

সংস্কৃত ভাষাকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করা উচিত। সংস্কৃত হ'ল ভারতবর্ষের বর্তমান ভাষাগুলোর প্রায় সকলেরই আদি জননী। এ ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ওপরেও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব খুব বেশী। সংস্কৃত ভাষা শিখতে হয়তো ৫, ১০, ১৫ অথবা ১০০ বছরও লাগতে পারে। সংস্কৃতের নিজস্ব কোন লিপি নেই, তাই রোমান লিপি

ব্যবহার করাই বিধেয়। যাই হোক, সমস্ত জনগোষ্ঠী ও ভাষাতাত্ত্বিকদের মিলিত হয়েই ও বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয় মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটি হ'ল, আইনের দিক থেকে কতকগুলো বৈষম্য থেকে গেছে। ভারতীয় সংবিধান ঘোষণা করেছে যে এখানে আইনের চোখে সকলেই সমান। কিন্তু বৈবহারিক ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসৃত হয় না। যার ফলে আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে নানারকম বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এই বৈষম্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। সকলেই ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক অথচ সকলের জন্যে আইন সমান সুযোগ সুবিধা দেয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিন্দু–আইনে একজন হিন্দু নাগরিক একাধিক বিবাহ করতে পারেন না; কিন্তু মুসলিম–আইনে একজন মুসলমান নাগরিক একাধিক বিবাহের অধিকারী। হিন্দু স্বামী অথবা হিন্দু স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়; কিন্তু একজন মুসলমান নাগরিক আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকেই বিবাহ–বিচ্ছেদের অধিকারী। এছাড়া মুসলমান স্বামী তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেন; কিন্তু একজন মুসলমান স্ত্রী তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করতে পারেন না। এছাড়াও মুসলমান স্বামীকে স্ত্রীকে ত্যাগের জন্যে কোন কারণও দেখাতে হয় না।

আইনের চোখে বৈষম্য এই ধরণের নানা সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। এই সব ত্রুটি আসলে সংবিধানে অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটি জনিত ব্যাপার। সংবিধানে এক জনগোষ্ঠীর জন্যে এক আইন, ও অপর জনগোষ্ঠীর জন্যে অন্য ধরণের আইন–এই রকমই বা থাকবে কেন? সেখানে একটা আইন–ভারতীয় আইন–ই (The Indian Law) থাকা উচিত। এই ভারতীয় আইন অবশ্যই মৌল মানবীয় মূল্যবোধের (cardinal human values) ওপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তবেই বৈবহারিক ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান–এই নীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর তখনই সকলকে আইনের দিক থেকে রক্ষা করা সম্ভব। সুতরাং ভারতীয় সংবিধান থেকে অবিলম্বে এই ধরণের আইনগত বৈষম্যজনিত মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটিগুলোকে দূরীভূত করা উচিত।

তৃতীয় মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটি হ'ল প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে নেই। নব্যমানবতাবাদের আদর্শ না থাকায় ব্যাপকভাবে জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎকে ধ্বংস করা হচ্ছে, সংবিধানে এদের সুরক্ষারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা পরিষ্কার বা স্পষ্টভাবে সংবিধানে উল্লিখিত হয়নি। এরজন্যে কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে আর তার ফলে মানসিক দিক থেকে গোটা দেশেরই ক্ষতি হতে পারে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় সংবিধানে – পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল–(১) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে কেউ ইচ্ছা করলে সরে যেতে পারে কিনা।

পঞ্চমতঃ সংবিধানে উপজাতি ও তপশীলী জাতি সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। জাত–পাতের ভিত্তিতে তপশীলী জাতি বলে খেয়ালখুশীমত চালানো হচ্ছে। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও শিক্ষাগত পশ্চাদ্বর্তিতার ভিত্তিতে কোন পরিবার বা গোষ্ঠীকে উপজাতি বা তপশীলীভুক্ত করা উচিৎ।

সাংবিধানিক সংশোধন

আজকের পৃথিবীতে **সকল দেশের সংবিধানেরই কম–বেশী সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।** সংবিধান প্রসঙ্গে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ সংশোধনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) মন্ত্রিসভা বা সংসদকে রদ্দ করা বা বাতিল করা–রাষ্ট্রপতি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারেন বা সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন, যদি দেশের অভ্যন্তরে

কোন অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপের ফলে কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়। অথবা, যদি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, অথবা যদি কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত শাসকদল সংসদে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে সংখ্যালঘুদলে পরিণত হয়।

মন্ত্রিসভা যেদিন বাতিল করা হবে, তার থেকে এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে সংসদের সামনে তাঁর কাজের জন্যে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দাখিল করতে হৰে। যদি সংসদ ইতোপূর্বেই বাতিল বলে ঘোষিত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙ্গে ফেলার ছয় মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের বন্দোবস্ত করতে হবে, ও নবনির্বাচিত সংসদ ভবনে নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে সমস্ত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পেশ করতে হবে।

(২) জরুরী অবস্থা বিষয়ক সংশোধন: রাষ্ট্রপতি সংসদের অনুমতিসাপেক্ষে কোন উপদ্রুত এলাকায় ছয় মাসের জন্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন; তবে সংসদের অনুমতি নিয়েও রাষ্ট্রপতি কোন স্থানে দু'বছরের বেশী জরুরী অবস্থা চালু্ রাখতে পারেন না।

(৩) অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা (Lame-duck ministry)- রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ বা নির্দেশ মানতেও পারেন, নাও পারেন। যদি রাষ্ট্রপতি ওই

অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার উপদেশ অগ্রাহ্য করেন, তাহলে ওই সংসদ স্বাভাবিকভাবেই ভেঙ্গে যাবে, আর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নোতুন সংসদ নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি এক মাসের মধ্যে নবনির্বাচিত সংসদের সমক্ষে স্বয়ং যাবতীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নৈতিক মান ও আচরণ: রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই এক উচ্চ নৈতিক মান ও আচরণের প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হৰে। তাই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে থাকাকালীন তাঁরা কেউ বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারবেন না, অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রাপ্ত কোন নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকতে কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় পতি বা পত্নী থাকৰে না।

(৫) বিবৃতিদান প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা: সাধারণ অবস্থায় বিবৃতিদান প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অবশ্যই নিরঙ্কুশ হওয়া উচিত নয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংসদ অথবা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি কোন প্রকার বিবৃতি দেবেন না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যখন মন্ত্রিপরিষদ বলবৎ থাকৰে, তখন রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

(৬) গণপরিষদ (Constituent Assembly): সংসদ গণপরিষদের ভূমিকাও পালন করতে পারে যদি সংসদের শাসকদলের ৭/৮ ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে; কারণ ঘন ঘন সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করলে সংবিধানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

(৭) ভাষা: দেশের সমস্ত জীবিত ভাষাকেই রাষ্ট্র বা সরকারকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

(৮) সকল নাগরিকের সমানাধিকার–রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে আইনের চক্ষে সমান অধিকার দিতে হবে। সকল নাগরিকের ন্যূনতম প্রয়োজনপূর্ত্তির সমানাধিকার দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকেই বৈয়ষ্টিক ও সামুহিক জীবনে প্রমাসীনতায় বা ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

(৯) সমীক্ষক সংস্থা: সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রগতির মান পর্যালোচনার জন্যে রাষ্ট্রপতি এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমীক্ষক সংস্থা নিয়োগ করবেন। মন্ত্রিমণ্ডলী ও সমীক্ষক সংস্থার মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সংসদের উপদেশ অনুযায়ী চলবেন। আবার সংসদ ও সমীক্ষক সংস্থার মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট দেশের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের (Supreme Court) উপদেশ চাইবেন। এ বিষয়ে সর্ব্বোচ আদালত

সংবিধান অনুযায়ী যে আনুষ্ঠানিক উপদেশ দেবেন রাষ্ট্রপতি তদনুযায়ী চলবেন।

(১০) রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা: আইন ও সংবিধানের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার। তাই দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতে দেশের যে কোন মানুষের বিরুদ্ধেই মামলা রুজু করা যেতে পারে। এমন কি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও করা যেতে পারে।

(১১) আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণবোটের অধিকার: দেশের কোন একটি অঞ্চলে গণবোটের ভিত্তিতেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া যেতে পারে। আর সেই গণবোটকে পরিচালনা করবে গণ-পরিষদ। কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ব্যবস্থাপনায় ওই গণবোট পরিচালিত হৰে।

(১২) শিক্ষাঃ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের জন্যেই প্রাথমিক শিক্ষার গ্যারান্টি দিতে হবে। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বাইরে রাখতে হবে।

(১৩) রাষ্ট্রব্যাপী একই আইন ও সংবিধান: এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সর্বত্র একই আইন (Law) ও সংবিধান (Constitution) প্রচলিত থাকা উচিত। কারণ আইন ও

সংবিধানের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নাগরিকেরই সমান অধিকার স্বীকৃত। এটাই সংগত যে একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা একই ধরণের আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করবেন। এ বিচারে কশ্মীর যে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, সেটা আদৌ সমীচীন নয়। এটা অত্যন্ত বিসদৃশ যে একজন কশ্মীরের অধিবাসী বাঙলা বা মহারাষ্ট্রে গিয়ে জমিজমা কিনে বাড়ি ঘর তৈরী করে সুবিধামত বসবাস করতে পারবেন; কিন্তু একজন মহারাষ্ট্রী বা ৰাঙালী একই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবেন–এ ধরণের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত কি?

(১৪) বিশ্বরাষ্ট্র: বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে একটা বিশ্ব সংবিধানেরও প্রযোজন। তাই এই ধরণের সংবিধানে এমন অনেকগুলি নীতি ও অধিকারের তালিকা (A charter of Principles or Bill of Rights) সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যাতে অন্ততঃ চারটি বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ক) আমাদের এই পৃথিবী–গ্রহের যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিদবর্গের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চিততা দিতে হবে;

(খ) সকল দেশকেই সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতার নিশ্চিততা দিতে হবে।

(গ) সকল দেশের সংবিধানেই সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের অন্ততঃ চারটি মৌলিক অধিকারের নিশ্চিততা দিতে হবে–

(i) ধর্মানুশীলনের অধিকার; (ii) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার অধিকার; (iii) শিক্ষা ও মাতৃভাষায় ব্যক্তীকরণের অধিকার; (iv) উল্লিখিত তিনটি অধিকারের কোন একটির সঙ্গে মৌল–মানবীয় নীতির বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট অধিকারটিকে তৎক্ষণাৎ সংকুচিত করতে হৰে, অর্থাৎ সর্বাবস্থাতেই মৌল মানবিক নীতিকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে।

পরিশেষে আবার বলছি পৃথিবীর সব দেশের সংবিধানেই কিছু কিছু দোষ–ত্রুটি রয়েছে। সংবিধান–রচয়িতাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল তাঁরা যেন নিজের নিজের দেশের সাংবিধানিক ত্রুটি–বিচ্যুতিগুলোকে দূর করার সময় উল্লিখিত বিষয়গুলির দিকে একটু দৃষ্টি দেন।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, কলিকাতা

সেবা–মনস্তত্ত্ব ও গোষ্ঠী মনস্তত্ত্ব

সূচীপত্র

মানবসমাজ এক ও অবিভাজ্য। কিন্তু আজ কুসংস্কার, ভাবজড়তা, সংকীর্ণতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিভিন্ন 'ইজমের' কবলে পড়ে মানব সমাজ ধ্বংস হতে বসেছে। এই অবস্থায় মানব সমাজকে এক ও অখণ্ডরূপে গড়ে তুলতে গেলে সেবা ও কল্যাণের মনোভঙ্গী নিয়ে সংশ্লেষণের পথটি বেছে নেওয়া দরকার। সমাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে কেউ সংশ্লেষণের পথ, আবার কেউ বা ভ্রান্তিবশতঃ অথবা স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে জ্ঞাতসারে বিশ্লেষণের পথটি বেছে নিতে পারে। তবে প্রথমেই বলা প্রয়োজন বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন ব্যষ্টির স্বার্থ হয়তো সিদ্ধ হতে পারে অথবা সাময়িকভাবে কোন গোষ্ঠী–স্বার্থ কিছু দিনের জন্যে পূর্ণ হতে পারে কিন্তু তা স্থায়ী ভাবে ও সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে একান্তভাবেই দরকার সংশ্লেষণের পথটি। এখন দেখা যাক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বলতে ঠিক কী বোঝায়? সার্বভৌমিক আদর্শের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, সহজ কথায় অনেককে এক করার মধ্যেই রয়েছে সংশ্লেষণের যথার্থ রূপটি। অন্যদিকে

সূচীপত্র

এক অবিভাজ্য সত্তাকে অনেক করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে বিশ্লেষণের পথ।

সমাজবিজ্ঞানীরা একথা ভালোভাবে জানেন যে পরিবেশগত, দৈহিক সংরচনাগত, সংস্কারগত ভৌগোলিক প্রভৃতি কারণে মানুষের মধ্যে আপাতঃ তারতম্যের সৃষ্টি হয়। 'আপাতঃ' বললুম এই কারণে যে আপেক্ষিক তারতম্যের ভিত্তিতে এই পার্থক্য থাকলেও বস্তুতঃপক্ষে মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য। এখন কেউ যদি এই আপাতঃ পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে অবিভাজ্য মানব সমাজকে বিভক্ত করতে চান তবে বলতে হবে তিনি বিশ্লেষণের পথ নিচ্ছেন। এই ধরণের চিন্তাধারা একান্তভাবেই মানবতা বিরোধী। এর মধ্য দিয়ে মানব সমাজের প্রকৃত কল্যাণ কখনই সম্ভব নয়।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। ধরুন, রামৰাৰু নামে জনৈক ভদ্রলোকের দুই ছেলে–যদু ও মধু। এখন পরিবেশগত, সংস্কারগত প্রভৃতি কারণে এদের একজন শিক্ষিত, অন্যজন অশিক্ষিত হতে পারে। স্পষ্টতই লক্ষণীয় এই আপাতঃ পার্থক্যের মাঝেও রয়েছে এক নিবিড় সত্য–উভয়েই রামবাবুর পুত্র। কিন্তু ওই পরিবেশগত স্বভাবকে আশ্রয় করে কেউ যদি উভয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় তবে বলতে হবে সে

বিশ্লেষণের পথ নিয়েছে আর যদি কেউ উভয়কে একই দৃষ্টিতে দেখেন তবে তার পথ হবে সংশ্লেষণের পথ।

এখন এই যে বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী যা এককে অনেকে রূপান্তরিত করছে তার দ্বারা কোন স্থায়ী কল্যাণ করা সম্ভব নয়। কেননা, এরূপ চিন্তা বিচ্ছিন্নতাবাদকে ডেকে আনে যার পরিণতি ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং মানুষের কল্যাণ যারা চায় তাদের বিশ্লেষণাত্মক পথকে পরিহার করে সংশ্লেষণাত্মক পথটিকে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা তারা মানব সমাজকে আরো বেশী ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবেন।

তোমরা দেখৰে, বিচ্ছিন্নতাবাদকে আশ্রয় করে অনেক রাজনৈতিক দলই নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়। যারা এই ধরণের কাজ করে থাকে তারা অনেক সময় নিজেদের বাঁচানোর জন্যে ও জনগণকে ধোকা দেবার জন্যে অন্যকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ৰলে চীৎকার করতে থাকে, যাতে জনগণ বুঝতে না পারে আসল বিচ্ছিন্নতাবাদী কারা। বলা প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনস্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থ, মানবকল্যাণ অপেক্ষা গোষ্ঠীর স্বার্থ বড় হয়ে ওঠে। আর এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথা ভাবতে গিয়ে তারা অন্যের সাংস্কৃতিক–অর্থনৈতিক অধিকারকে খর্ব করে বসে যা' মানুষের সার্বিক বিকাশের পক্ষে বিরাট অন্তরায়। আমি এর আগে

কয়েকবারই বলেছি এ পৃথিবীতে কেউই উপেক্ষণীয় নয়। অথচ গোষ্ঠীস্বার্থকে বড় করে দেখতে গিয়ে যদি অন্যে উপক্ষিত হয়, অন্যের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তাকে মানা যাবে কি? তাই সংশ্লেষণের পথটা উপেক্ষার পথ নয়। বরং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার পথই হ'ল সংশ্লেষণের পথ।

এই ৰাঙলাতে জাত-পাত, উচু-নীচু প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ চিন্তার মাধ্যমে অথবা ছোট ছোট অনুন্নত গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে নিছক দলীয় স্বার্থে একই ৰাঙালীর মধ্যে ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই যে ক্ষুদ্রস্বার্থসম্পৃক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা তা একান্তভাবেই বিশ্লেষণাত্মক। স্বভাবতই এতে ৰাঙলা ও বাঙালীর সামগ্রিক কল্যাণ তো হবেই না, বরং তা নূতন করে বাঙালীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করবে। এক্ষেত্রে সত্যিই যদি ৰাঙালীস্তানের কল্যাণ করতে হয় তবে ব্লক ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ও সেই সংশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে আনতে হবে। যাই হোক, এই যে প্ররোচনামূলক উস্কানি তা একান্তভাবেই বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গী প্রসূত বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা।

এখন কথা হচ্ছে সমাজগঠনের ক্ষেত্রে দু'ধরণের মনস্তত্ত্ব কাজ করতে পারে। একটি হচ্ছে সেবা-মনস্তত্ত্ব যা' সার্বিক

সূচীপত্র

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে উদ্বোধিত; অপরটি হচ্ছে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব যা' ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উন্নতির মধ্যে সীমায়িত। যে সমস্ত রাজনীতিবিদ সেবা ও জনকল্যাণমূলক মনস্তত্ত্বের ধারক ও বাহক তাঁরা কখনো রাজনীতিকে 'নীতি'র থেকে পৃথক করে দেখেন না। স্বভাবতই তাঁদের চিন্তাধারা বৈয়ষ্টিক–স্বার্থ তথা গোষ্ঠী–স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে যায়। অন্যদিকে যাঁরা গোষ্ঠী মনস্তত্ত্বের পরিপোষক তাঁরা গোষ্ঠীর স্বার্থকে বড় করে দেখতে চান বলে যে কোন ভাবেই নিজ নিজ গোষ্ঠীকে অপরের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টায় মত্ত হয়ে ওঠে। তারই ফলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ হয়ে ওঠে অনিবার্য। সংশ্লেষাণাত্মক মনোভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সে সমিতি প্রতির্ষ্ঠিত হতে পারে তা থেকে যায় অনেক দূরে। আর শুধু তাই নয়, নিজের প্রভুত্বকে প্রতির্ষ্ঠিত করতে গিয়ে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বাক্সর্বস্ব বিপ্লবী মনোভাবের আশ্রয় নিয়ে থাকে.....'নীতি' থেকে দূরে সরে 'রাজ' চালানোর চেষ্টায় উদগ্র হয়ে ওঠে।

এখন এই যে দুই ধরণের মনস্তত্ত্ব এর থেকেই জন্ম নেয় সমাজকে দেখার দু'ধরণের চেতনা। যারা সেবার মনোভাব নিয়ে এগোয় তাদের চেতনা অবশ্যই হয় সংশ্লেষণধর্মী। আর যারা ব্যষ্টিস্বার্থ ও সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থকে বড় করে দেখে তাদের চিন্তাধারা হয় বিশ্লেষণধর্মী।

শোণা যায় বিভিন্ন জীব–জন্তুর মধ্যে মানুষের মাংস নাকি বেশী সুস্বাদু। তাই যে বাঘ একবার নরমাংসের স্বাদ পেয়েছে সে বনে মানুষ না পেলে গ্রামে ঢুকে পড়ে। গ্রামে ঢুকে তারা গৃহপালিত পশু অপেক্ষা মানুষকে পেলে তারই ওপর আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোষ্ঠীচেতনায় যারা উদ্বুদ্ধ, বিশ্লেষণমূলক মনোভঙ্গী যাদের চেতনায় ও বিচ্ছিন্নতাবাদ যাদের মজ্জায়, ধমনীতে, রক্তের গতিপ্রবাহে তারা আজ মানুষের মাংসের লোভে লোভাতুর। তাই তারা আজ সংশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারাকে পরিহার করে গোষ্ঠী মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে চালিত হয়ে রাজনীতির নীতির বনে বিচ্ছিন্নতাবাদকে আশ্রয় করে ওৎ পেতে বসে আছে–কখন কোন গোষ্ঠীকে করায়ত্ত করে রক্ত পান করা যাবে আর তাদের চামড়া দিয়ে তৈরী ডুগডুগি ৰাজাতে ৰাজাতে অন্যকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ৰলে প্রচার করা যাবে।

তোমরা যারা প্রাউটের আদর্শে বিশ্বাসী তোমাদের এদিকে নজর রাখতে হবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে বন্দুকের নল নয়, সেবা–মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে জয় করা মানুষের আত্মিক শক্তিই ক্ষমতার উৎস। জনগণ সেবা চায়। সত্যিকারের সেবা চায়। প্রাউট এই সেবা তথা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই, সর্বজনের হিতের উদ্দেশ্যেই রচিত। তোমরা তাই অনতিবিলম্বে 'প্রাউট' দর্শনের মাধ্যমে এক ও অবিভাজ্য মানবসমাজ গড়ে তোল।

পরমপুরুষকে সেবার আকুতি থেকে মানুষের সেবা মনস্তত্ত্ব জন্ম নেয়। মানুষের যখন সেই ভূমা–সত্ত্বাকে সেবার মনোবৃত্তি যার মধ্যে নেই তার মধ্যে কখনও সেবামনস্তত্ত্ব জন্ম নিতে পারে না। তাই একটা সুন্দর ও অখণ্ড সমাজ সংরচনা তৈরী করতে গেলে আধ্যাত্মমুখী মানসিকতা থাকতেই হবে নতুবা সেবামনস্তত্ত্বের জাগরণ তথা বিকাশ সম্ভব নয়।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭ কলিকাতা

কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

প্রঃ–মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষা ও মানুষের সামর্থ্য–এ দুয়ের মধ্যে কোন সমতা আছে কি অর্থাৎ মানুষ যা যা পেতে চায়, আর তা পেতে গেলে যতটা শক্তি–সামর্থ্য দরকার তা মানুষের আছে কি?

উঃ–মানুষের আশা–আকঙ্ক্ষার যেন শেষ নেই, আবার তা' কত বিচিত্র ধরণের। সে তুলনায় মানুষের সামর্থ্যের একটার সীমা আছে যদিও মানুষের সামর্থ্যের পরিমাণ অনেকখানি। তাই আপেক্ষিক জগতে মানুষের সীমিত সামর্থ্য

আর অফুরন্ত আশা–আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন আপাতঃ সমতা আছে বলে তো মনে হয় না। তবে যদি মানুষ অনবরত মানসাধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তার প্রসুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে বা বাড়িয়ে তুলতে পারে তাহলে আকাঙ্ক্ষার ও সামর্থ্যে মধ্যে একটা সমতা আসতে পারে বৈকি। সাধারণ অবস্থায় একজন অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষও তাঁর শক্তির শতকরা পাঁচ বা দশ ভাগ মাত্র কাজে লাগান। বাকী অংশ অব্যবহৃতই থেকে যায়। যদি একশ' ভাগ সামর্থ্যই কাজে লাগানো যায় তাহলে মানব সমাজে কত উপকারই না হতে পারে।

প্রঃ–সামূহিক স্বার্থ (collective spirit) ও বৈয়ষ্টিক স্বাধীনতা (individual right)-এ দুয়ের মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান কী করে সম্ভব?

উঃ–ব্যাপারটা একটু শক্ত হলেও অসম্ভব নয় যদি মোটামুটিভাবে কয়েকটা বিশেষ দিকে যদি নজর দেওয়া হয়, যেমন;

(১) যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক জীবনে সম–সমাজতত্ত্বকে নিষ্ঠাসহকারে মেনে চলা হয়;

(২) বৈয়স্টিক ও সামুহিক জীবনে নব্য–মানবতাবাদী ভাবধারাকে মেনে চলা হয়;

(৩) ভৌতিক স্তরে মোটামুটিভাবে সীমিত স্বাধীনতা (কারণ ভৌতিক সম্পদ তো সীমিত), আর মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে পূর্ণ স্বাধীনতার নীতি মেনে চলা হয় (কেননা মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ অসীমিত)।

(৪) যদি মানসাধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একটি সংশ্লেষণাত্মক পথ ধরে চলা হয়।

*** *** *** ***

প্রঃ–জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদও কি ভাবজড়তাদোষে দুষ্ট?

উঃ–হ্যাঁ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ দুই–ই ভাবজড়তা দোষে দুষ্ট। কারণ, জাতীয়তাবাদ জন্ম নিচ্ছে মানুষের ভৌম–প্রবণতা (geo-sentiment) থেকে, আর সাম্প্রদায়িকতাবাদ জন্ম নিচ্ছে যুক্তিবর্জিত অবৈজ্ঞানিক উপধর্ম বা মহবে অন্ধ বিশ্বাস থেকে।

প্রঃ–পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ–এ দু'য়ের কোনটি অধিকতর মনস্তত্ত্বসম্মত?

উঃ–কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদের তুলনায় ক্যাপিটালিজম্ বা পুঁজিবাদ কিছুটা মনস্তত্ত্বসম্মত, যদি দুই–ই ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক–অর্থনৈতিক মতবাদ। আর তাই তা সমর্থন যোগ্যও নয়।

সূচীপত্র

কম্যুনিজমে মানুষের স্বাধীন অবারিত মানস অভিব্যক্তির সুযোগ নেই অজস্র সামাজিক–অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাধানিষেধের বেড়াজালে মানুষের চিন্তাধারা সীমিত গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরে।

পুঁজিবাদে তত্ত্বতঃ আপাতঃদৃষ্টিতে এই ধরণের কোন বাধানিষেধ নেই। কিন্তু, বস্তুতঃ বাধানিষেধ অবশ্যই কিছু রয়েছে।

প্রঃ–কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে সবকিছুকে লৌহ যবনিকার অন্তরালে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয় কেন?

উঃ–কারণ, তাঁরা তাঁদের দর্শন বা মতবাদের আভ্যন্তরীণ ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসঙ্গতিগুলি সম্পর্কে খুবই সজাগ। তাই তাঁরা চান না যে স্বাধীন বিশ্ব তাঁদের সবকিছুই জেনে যাক।

প্রঃ–কম্যুউন সিষ্টেম কি মানুষের বহুদৈশিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? মানুষের সার্বভৌমিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ এই কম্যুউন সিষ্টেমে আছে?

উঃ–অবশ্যই না। এই ধরণের সামাজিক–অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হ'ল, মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও গৌণতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানো। কিন্তু মানুষের বহুদৈশিক উন্নতির জন্যে কম্যুউন সিষ্টেমকে কখনই একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ,

মানুষের যথার্থ প্রগতি জানতে গেলে মানুষকে ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক তিনটি মুখ্য স্তরেই, ও পাঁচটি উপস্তরে–যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসাধ্যাত্মিক স্তরে উন্নতি ঘটাতে হৰে। কেবল তখনই তাকে বলা যাবে Multilateral development বা বহুবাহিক প্রগতি। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি নব্যমানবতাবাদ বা Neo- humanism এর উপর আধারিত না হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে চরম লক্ষ্যের দিকে চলার গতিতে দ্রুতিও থাকে না, আর যতটুকু উন্নতি ঘটে তাকে সর্বাত্মক বা সর্বদেশিক বলাও যাবে না। খণ্ডিত প্রগতি, প্রগতিই নয়।

প্রঃ–কম্যুউন সিষ্টেমের মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটিগুলো কি কি?

উঃ–কম্যুউন সিষ্টেম অনুযায়ী সমাজ পরিণত হয় একটা উৎপাদন ও বিনিময় কেন্দ্রে; আর তা পরিচালিত হয় কতকগুলো কঠোর ও জবরদস্ত নিয়ম–কানুনের দ্বারা। এই ধরণের শ্বাস–রোধকারী যান্ত্রিক জীবন–যাপন পদ্ধতি নাস্তিক মানোভাবাপন্ন নেতৃস্থানীয় মানুষগুলোর মনে এক স্থূল ভোগবাদী মানসিকতার জন্ম দেয়। যারা শ্রমিক বা কর্মচারী তারা তাদের কাজের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করার প্রেরণা পায় না, তাদের আভ্যন্তরীণ বৈষষ্টিক শক্তিসামর্থকে বিকশিত করার স্বাধীনতাও থাকে না। কর্ষক যদি অনুভব করে যে

কৃষিক্ষেতটা তার নিজের আর তাই কৃষিক্ষেতের উন্নতি হলে তারও আর্থিক সাশ্রয় হবে, তবেই না সে মন–প্রাণ ঢেলে কৃষির উন্নতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেবে। ঠিক তেমনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে যদি মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে মানবসমাজ অবশ্যই অধিকতর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করবে।

প্রঃ–বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ কী কী সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবে?

উঃ– বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ যে বিশেষ কতকগুলি সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবে সেগুলো হ'ল,–

(১) প্রতিটি রাষ্ট্রকে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে গিয়ে সামরিক ও প্রতিরক্ষা খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, তা ৰন্ধ হৰে ও সেই পরিমাণ অর্থ অন্যান্য উন্নয়ন মূলক খাতে ব্যয় করা যাবে।

(২) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায়ই বিবাদ–বিসম্বাদ বা ভুল বোঝাবুঝির ফলে যে প্রভূত পরিমাণ মানসিক যাতনা বা মনঃ ক্লেশে ভোগে, মানুষ তার থেকে অব্যাহতি পাবে।

(৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হলে নিরীহ সৈনিক ও অসামরিক নরনারীর অযথা রক্তপাত ৰন্ধ হবে।

(৪) মানুষ মুক্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অবাধ যাতায়াতের, বসবাস ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের বহু সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবে।

প্রঃ–আমরা কী চাই–মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি না ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি?

উঃ–প্রাউটের মতে মাথাপিছু আয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কোনো বৈজ্ঞানিক নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। তাই মানুষের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে কোন দেশ বা জাতির আর্থিক উন্নতির সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে না। বরং মাথা পিছু আয়কে উন্নতির মাপকাঠি ধরলে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কেননা, এই পদ্ধতিতে সরল আঙ্কিক হিসেবে দেশের জনসংখ্যাকে মাথাপিছু আয় দিয়ে গুণ করলে যে পরিমাণ সম্পদ পাৰ সেটা হবে দেশের Gross mational income। তা দিয়ে কোনো দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের খাঁটি চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ, এর দ্বারা সমাজের ধনবৈষম্যের চিত্র ফুটে ওঠে না। মাথাপিছু আয়ের মাধ্যমে কোন একক মানুষের গড় আয় কত হয়তো জানতে পারলুম। কিন্তু জাতীয় আয় বিলিবণ্টনের ক্ষেত্রে যে একটা বিরাট ব্যবধান রয়ে গেছে তার চিত্র তো পাৰ না। আবার যদি মুদ্রাস্ফীতির কথা ধরা হয়, তাহলে তো মাথাপিছু

আয় তত্ত্বের যৌক্তিকতা আরও কমে যায়। অন্যদিকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাই হ'ল একটা দেশ বা জাতির আর্থিক উন্নতির সত্যিকারের দ্যোতক। কারণ ক্রয়–ক্ষমতা আছে মানেই হ'ল মানুষ তার আয়ের দ্বারা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটা করতে সক্ষম হবে। তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাউটের যাবতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই হ'ল জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো। সাধারণ ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রই জানে যে অনেক সময় অনেক টাকা আয় করেও মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন না। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে আর্থিক আয় কম হলেও মানুষের যে পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে তা নিয়ে তারা সহজেই তাদের জরুরী প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে পারছেন। তাই বলছিলুম যে মাথাপিছু আয় নয়, ক্রয়–ক্ষমতাই অর্থনৈতিক উন্নতির সত্যিকারের মাপকাঠি। মোদ্দা কথাটা হ'ল এই যে প্রতিটি মানুষের যেন তার প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য নুন–তেল, চাল–ডাল, তরি–তরকারী, কাপড়–চোপড়, কয়লা, ওষুধ–পত্র, বইখাতা সবকিছুই যেন তাঁর আর্থিক সামর্থের পরিভূ'র মধ্যে এসে যায়।

প্রঃ–কৃষিনির্ভর ও কৃষিসহায়ক শিল্পের মধ্যে পার্থক্য কী?

উঃ- কৃষিনির্ভর শিল্প ৰলৰ তাদের যারা কৃষি-উৎপাদিত পণ্যের উপর নির্ভর করে। যেমন, চটকল, তেলকল, ধানকল প্রভৃতি। আর কৃষিসহায়ক শিল্প ৰলৰ তাদের যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির গুণগত বা পরিমাণগত উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়তা করে। যেমন-ট্রাক্টর কারখানা, সার কারখানা, সেচের সাজসরঞ্জাম, পাওয়ার টিলার প্রভৃতি।

কণিকায় প্রাউট

ত্রয়োদশ খণ্ড

সূচীপত্র

সমানম্ এজতি ইতি সমাজঃ

"সমানম্ এজতি ইতি সমাজঃ" অর্থাৎ সবাই মিলে যখন ঠিক করলে যে তারা একসঙ্গে চলবে, সুখে-দুঃখে একসঙ্গে থাকবে তখন তাদের মিলিত নাম হলো সমাজ। কেউ হয়তো অনেকটা এগিয়ে গেছে, কেউ বা পেছিয়ে পড়েছে, কারো পা ব্যথা করছে বলে হাঁটতে পারছে না, কেউ বা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। তাদের দিকে না তাকিয়ে যে চলে গেল সে সমাজের লোক নয়। সমাজকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, আর তাদিকে নিয়ে চলতে গেলে একটা বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ে। যেমন যে লোকটা চলতে পারছে না তাকে তুলে নিতে হবে যাতে চলার ছন্দ এক হয়। এখন আমাদের গোটা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নাই বা পারি কিন্তু এই সৌর জগৎটাকে একভাবে দেখে এগিয়ে যেতে হবে। পরে ভবিষ্যতে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেও যেখানে যত মানুষ আছে তাদিকেও সঙ্গে নিতে হবে। তাদিকে নিয়েই আমাদের সমাজ গড়ে উঠবে। আজকের দিনে অন্ততঃ এই পৃথিবীটাকে এক অখণ্ডভাবে নিতে হবে।

আমরা কী দেখছি? কারো ঘরে প্রাচুর্যের স্রোত বয়ে যাচ্ছে কেউ বা অনাহারে শুকিয়ে মরছে। সমাজের একটা অংশ আলো–হাওয়ায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, আর একটা অংশকে অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ জন মানুষকে ঘরের মধ্যে ৰন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। একটা অংশ যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, নিন্দে করার কেউ নেই। আর একটা অংশ যদি অজ্ঞাতসারেও কোন ভুল করে ফেলে সমাজ তার প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করছে। এ রকম করলে তো চলবে না। অনেক দিন ধরে এইভাবে চলতে চলতে আজ তফাৎটা খুব বেশী হয়ে পড়েছে। একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধানটা অনেক বড়। একজন পুরুষ খুব শিক্ষিত আর তার স্ত্রী হয়ত অশিক্ষিতা, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। এই রকম নানান ধরণের অসুবিধা রয়েছে। তা করলে তো চলবে না। যদি বুঝি যে গতিতে দ্রুতি নেই তা হলেও যারা আস্তে আস্তে চলছে, যারা পেছিয়ে পড়ছে, তাদের সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে। আর এই চলতে গিয়ে যদি আমার গতি কিছুটা কমেও যায়, তাও স্বীকরণীয়। কিন্তু সবাইকে নিয়েই চলতে হৰে। এইটাই হলো বড় কথা। যারা সবাইকে নিয়ে চলতে চায় তাদের নিজেদের চলতে গেলে যতটুকু পায়ের জোর থাকা দরকার, যতটুকু মনের জোর থাকা দরকার সেটুকু তো চাই–ই আবার যারা পেছিয়ে পড়েছে

তাদের বোঝা বইবার জন্যেও আরও খানিকটা বাড়তি শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেইজন্যে আমি তোমাদের বলি ঠিক সাধারণ মানুষের মত হলে চলবে না। তার চেয়েও কিছুটা বেশী হতে হবে। নিজেকে নিয়ে চলতে পারাটাই যথেষ্ট নয়, আরও দু'-একজনকে সঙ্গে নিতে হবে, নিয়ে চলার সামর্থটা অর্জন করতে হবে ও সেইভাবে নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে। কিছুদিন আগে বলেছিলুম-"ত্রিবিধ দুঃখস্য আত্যন্তিকী নিবৃত্তিঃ পরমার্থঃ"। অর্থাৎ যার সাহায্যে দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে তাকে বলি অর্থ। বস্ত্র নেই, শীত করছে। পয়সা থাকলে বস্ত্র কেনা যাবে; অন্ন নেই, ক্ষুধা পাচ্ছে; পয়সার সাহায্যে অন্ন ক্রয় করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে, সেই দুঃখটা দূর হবে। তাই যার দ্বারা দুঃখ দূর হয় তাকে বলি অর্থ। যেহেতু টাকার দ্বারা অন্ন কেনা যায়, সেইজন্যে টাকাকেও সংস্কৃতে 'অর্থ' বলা হয়। কিন্তু সেটা অর্থই, পরমার্থ নয়। পরমার্থ হলে যার দ্বারা দুঃখ একবার জয় হলো তো আর দ্বিতীয়বার এলো না। টাকা দিয়ে অন্ন কেনা হলো কিন্তু কালকে আবার তো খিদে পাবে। সুতরাং টাকা অর্থ, পরমার্থ নয়। পরমার্থ হচ্ছে যার দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়। মানুষের তিনটে দুঃখ-জাগতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অথবা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। ভৌতিক জগতে যা কিছু দুঃখ-অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, এগুলো হলো আধিভৌতিক

দুঃখ, ফিজিক্যাল দুঃখ। এই দুঃখ দূর করতে অর্থ কতটুকু পারে? সাময়িক ভাবে দুঃখ দূর হলো ঠিকই কিন্তু পরের দিন সেই দুঃখটা আবার ফিরে এল। আর স্থায়ীভাবে দুঃখ দূর করতে হলে চাই পরমার্থ। পরমার্থের সাহায্যে মানুষ এমনভাবে সামাজিক ব্যবস্থা তৈরী করবে যাতে কোনদিনই মানুষের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব না হয়–একটা rudemental change অর্থাৎ মূলেতেই পরিবর্তন এনে দেওয়া হলো। আর এ কাজটা করতে গেলে যাঁরা এর অগ্রপথিক (vanguard) হবেন তাঁদের কী করতে হবে। তাদিকে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তি অর্জন করতে হবে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে যারা আগে যাবে তাদরে জঙ্গল কেটে পথ তৈরী করে তবে গাড়ী চালাতে হবে। আর যাঁরা পেছনে আসবেন তাঁরা খুব সহজেই গাড়ী চালিয়ে চলে আসবেন, তাঁদের জঙ্গল কাটতে হচ্ছে না, পথ তৈরী করতে হচ্ছে না।

মানসিক দুঃখগুলো কেমন? ধরা যাক, জাগতিক দুঃখগুলো আমরা দূর করেই ফেললুম, ওগুলো একেবারেই নেই। প্রাউট থিয়োরীটা তৈরী করা হয়েছে এজন্যেই–যাতে করে জাগতিক দুঃখগুলো দূর হয়, যাতে মানুষের পরমার্থ লাভ হয়। আমি কোথাও বলিনি যে সব মানুষকে প্রচুর টাকা দাও। আমি বলেছি, প্রতিটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে দাও। চালের দাম ২০০টাকা হোক, ক্ষতি নেই যদি প্রতিটি মানুষের

আয় ১০০০ টাকা হয়ে যায়। সুতরাং বেশী টাকা পাওয়া বড় কথা নয় বা কম টাকা পাওয়াও বড় কথা নয়, মূল কথা হ'ল ক্রয়ক্ষমতা চাই। ক্রয়ক্ষমতাটা যদি প্রতিটি মানুষের মধ্যে এসে যায়, তাহলে তো আর তার আধিভৌতিক দুঃখটা থাকছে না। ফিজিক্যাল দুঃখটা থাকছে না। কিন্তু তার পরেও আধিদৈবিক বা মানসিক দুঃখটা তো থাকছে। তখনও তাদের শোক আছে, দুঃখ আছে, মান আছে, অপমান আছে, কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিয়োগ-ব্যথা আছে। অর্থাৎ এই আধিদৈবিক দুঃখটা থেকেই যাচ্ছে। এই আধিদৈবিক দুঃখ থেকে বাঁচবার জন্যে দরকার উপযুক্ত শিক্ষার, যথোপযুক্ত মানসাধ্যাত্মিক শিক্ষার, যাতে সে তার মনকে ভালভাবে তৈরী করতে পারে, বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে যুঝতে পারে। তোমরা যারা জিনিসটা ভালভাবে বুঝেছ-তাদের এই উদ্দেশ্যে ভালভাবে তৈরী হতে হবে ও নিজেদের প্রস্তুত করতে গেলে যতটা শক্তি অর্জন করা দরকার তার চেয়েও বেশী শক্তি অর্জন করতে হবে। কারণ যারা এটা বোঝেনি, বোঝবার সামর্থ্য নেই, যারা অল্পজ্ঞ, তারাও তো একই রক্তের মানুষ, তারাও তো আত্মীয়, তারাও তো পৃথিবীতে আমাদের অতি নিকট আত্মীয়। সুতরাং তাদিকে সাহায্য করার জন্যে আমরা প্রয়োজনের চেয়েও কিছুটা বেশী শক্তি অর্জন করবো। তা না হলে তো হবে না। যেমন ভারতের ব্যাপারটা দেখো না। আমাদের যতটা উন্নত

হওয়া উচিত ছিল ততটা হইনি। তার কারণ, ভারতের নারী সমাজকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এর ফল হয়েছিল এই যে সমাজের কেবল শতকরা ৫০ জন পুরুষের অগ্রগতি হয়েছিল, কারণ সমাজের অর্ধেকের মত পুরুষ মানুষ, অর্ধেকের মত নারী। অর্ধেকের মত পুরুষ এগোচ্ছে, অর্ধেকের মত নারী ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ হয়ে থাকছে। সুতরাং পুরুষরাই এগোচ্ছে আর ওই ৫০ জনের বোঝা নিয়ে এগোতে হচ্ছে যার ফলে অগ্রগতি কম হচ্ছে। নারীও তার নিজের পায়ের শক্তিতে এগিয়ে চলুক, সমানভাবে এগিয়ে চলুক। চলতে চলতে যদি তাদের কোথাও পায়ে ব্যথা হয়ে যায়, যদি মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তাহলে তাদিকে তুলে নিতে হবে। আর নারীরাই যে কেবল মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে, তাদিকে তুলে নিতে হবে, তাই বা কেন হৰে। পুরুষরাও ওইরকম ভাবে পড়ে যেতে পারে, তখন নারীদের কাজ হবে তাদের টেনে তোলা, তাদের বোঝা তুলে নিয়ে এগিয়ে চলা। চিরকাল নারীর পজ়িশ্যানটা যে হয়ে থাকৰে কেবল sub-ordinated co-operaration তাও তো নয় co-ordinated co-operation-ও তো হতে পারে। আবার পুরুষেরও পজ়িশ্যান sub- ordinated co-operaration হয়ে যেতে পারে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই জোর করে বলা যায় না অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে।

মানসিক ক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। যে জানে, যে বোঝে, তাকে আরও কিছুটা বেশী জানতে হবে, আরও কিছুটা বেশী বুঝতে হবে। তার ফলে যাদের জানবার, বোঝবার সামর্থ্য কম, তাদিকে আমরা সাহায্য করতে পারবো।

তৃতীয় দুঃখটা হলো–আধ্যাত্মিক দুঃখ। আধ্যাত্মিক দুঃখটা হলো কী?–প্রতিটি মানুষ মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন সবাই জানে যে সে ঈশ্বরের সন্তান ও ঈশ্বরই তাকে দেখছেন। সব সময়ই সে জানে যে সে কখনই একলা নয়। যে অতি বড় নাস্তিক সেও বিপদে পড়ে লজ্জায় মুখে যাই বলুক না কেন, মনে মনে ৰলে, "ভগবান আমায় বাঁচাও”। সুতরাং কেউ যদি মুখে ৰলে, ভগবান–টগবান মানি না, তাহলে বুঝতে হৰে যে, সে কপটাচারী, সে মনের কথা মুখে বলছে না। কপটাচারণকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সব মানুষই জানে যে ঈশ্বর তার আর সে ঈশ্বরের। কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও ঈশ্বরকে সে মনে–প্রাণে সহজভাবে ধরতে পারছে না। এই না পারার দুঃখ এটাকেও বলা হয় আধ্যাত্মিক দুঃখ, আর এই আধ্যাত্মিক দুঃখ থেকে মানুষ বাঁচতে পারে আধ্যাত্মিক সাধনায়। এই সাধনার চরম তথা পরম কথা হলো ভক্তি। জ্ঞান থাক বা না থাক, বুদ্ধি থাক বা না থাক, ভক্তি থাকলেই কাজ হয়ে যায়। সুতরাং ভক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হৰে। একজন ভক্তিমান মানুষের সংস্পর্শে এসে

হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ ভক্তিমান হয় অনেকেরই জানা আছে–মহাপ্রভুর একজন বড় ভক্ত ছিলেন যবন হরিদাস। বিরাট ভক্ত ছিলেন তিনি। মহাপ্রভু যখন কীর্ত্তন করতেন, তখন হরিদাসকে ছুঁয়ে ফেলতেন। শীতকালের রাত্রি। গোঁড়া পণ্ডিতেরা বলতেন–এক্ষণি তোমাকে গঙ্গাস্নান করতে হবে। নইলে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শীতের রাত্রে গঙ্গাস্নান করতে হতো। কত কষ্ট! হরিদাস বলতেন–ঠাকুর, তুমি কেন আমাকে ছোঁও? এত রাত্তিরে তোমাকে কষ্ট পেতে হয়। মহাপ্রভু তবু তাকে ছুঁয়ে দিতেন। এরপর হরিদাস প্রতিদিন মহাপ্রভুর কাছ থেকে দূরে বসে থাকতেন। আর মহাপ্রভু যেই ছোঁবার চেষ্টা করতেন, হরিদাস দৌড়তে শুরু করতেন। মহাপ্রভুর বয়স তখন ১৯/২০ আর হরিদাসের বয়স তখন অনেক। দৌড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে পারবেন কেন! মহাপ্রভু তাকে ছুঁয়ে ফেলতেন। আবার তাঁকে স্নান করতে হতো। তারপর একদিন কাঁদতে কাঁদতে হরিদাস বললেন–প্রভু আমাকে ছোঁন কেন? এতে আপনার লাভটা কী? আপনাকে কষ্ট করতে হয়। শীতের রাতে স্নান করতে হয়।

"প্রভু ক'ন তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিৰলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।।”

সূচীপত্র

মহাপ্রভু বললেন, "তুমি এতই ভক্তিমান, তোমার মধ্যে এতই ভক্তি যে আমি তোমাকে ছুঁই নিজেকে পবিত্র করার জন্যে। তোমার মধ্যে এত ভক্তি আছে যে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে পবিত্র করে দিতে পারো। ভক্তির এতই শক্তি! এ শক্তি জ্ঞানের নেই, এ শক্তি কর্মের নেই বরং জ্ঞানীর একটা অহঙ্কার থাকে, যে অহঙ্কারটাকে সাধারণ মানুষ ভয় পায়–একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলে, বলে, "বাপরে বাপ্, বিরাট পণ্ডিত, ওঁর কাছে কী যাওয়া যাবে?" কিন্তু ভক্তকে কেউ সে রকম ভয় পায় না। ভাবে–উনি ভক্তিমান মানুষ, ওঁর কাছে গিয়ে একটু বসি। এখন সেই ভক্তিকে যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায় তাহলে তাঁর সংস্পর্শে হাজার হাজার মানুষ, লাখ লাখ মানুষ প্রকৃত পরমার্থ লাভ করবে আর আধ্যাত্মিক ৰন্ধন থেকে মুক্ত হবে। এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক আর আধ্যাত্মিক–এই তিন রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে যে পরমার্থ সেটা সকলকেই অর্জন করতে হবে, আর এমনভাবে অর্জন করতে হবে যে যারা অনগ্রসর তারাও যেন তাঁদের দ্বারা উপকৃত হয়।

(সন্ধ্যাবেলা, ৮ই নৰেম্বর, ১৯৭৮, কলিকাতা)

সূচীপত্র

প্রাউটের অর্থনীতি–ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

প্রাউটের অর্থনীতি–ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের ওপর নিম্নে আলোকপাত করা হচ্ছেঃ

ন্যূনতম প্রয়োজন ও ক্রয়ক্ষমতার গ্যারান্টী:

প্রাউট প্রতিটি মানুষকে জীবন–ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন–অন্ন, বস্ত্র, আবাস, চিকিৎসা ও শিক্ষা–প্রদানের নিশ্চিততার (গ্যারান্টী) পক্ষপাতী। ন্যূনতম প্রয়োজনের গ্যারান্টী দানের পরে যে উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকৰে তা যারা বিশেষ দক্ষতার অধিকারী বা বিশেষ গুণ–সম্পন্ন যেমন চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়র, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির মধ্যে বন্টণ করতে হবে, কারণ সমাজের সামূহিক উন্নয়নে এঁদের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

সূচীপত্র

মানুষের এই ন্যূনতম প্রয়োজনের পরিমাণ প্রগতিশীলভাবে বৃদ্ধি করে যেতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের মানের ক্রমোন্নয়ন ঘটতে পারে। সমবন্টণের তত্ব একটা অলীক কল্পনা ও এটি সরল জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করার এক চাতুর্যপূর্ণ স্লোগান মাত্র। প্রাউট এ তত্বকে বর্জন করে' অর্থনৈতিক সম্পদের যুক্তিসঙ্গত বন্টণ–নীতি দিয়েছে। এই ব্যবস্থা উৎপাদ–বৃদ্ধির জন্যে ইন্সেনটিব্ (আর্থিক বা অনুরূপ উৎসাহ) প্রদান করবে। এই নীতির বাস্তবায়নের জন্যে প্রতিটি ব্যষ্টির প্রগতিশীলভাবে ক্রয়ক্ষমতা–বৃদ্ধিতেই প্রাউটের অর্থনীতির চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। কারণ আজ বিশ্বের বহু অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে অবহেলা করায় তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে ও ঘনিয়ে আসছে দারুণ সংকট। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রথমে শৌখিন দ্রব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সর্বাধিক উৎপাদন করতে হৰে। এই ব্যবস্থা উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমতা আনৰে ও জনসাধারণের প্রয়োজনপূর্ত্তির নিশ্চিততা আনবে।

সমবায়–ব্যবস্থা:

প্রাউটের মতে পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাপারে যতগুলো ব্যবস্থা আছে সমবায় হ'ল তার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। নীতিবাদের দ্বারা পরিচালিত সমবায়ই ধনতান্ত্রিক ও অন্যান্য শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে। সমবায়-ব্যবস্থায় দালাল বা ফড়েদের কোন ভূমিকা থাকে না। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় ব্যবস্থা যে সফলতা অর্জন করতে পারছে না তার কারণ পুঁজিবাদী শোষকরা তাদের শোষণ কায়েম রাখার জন্যে ব্যাপক দুর্নীতির জাল বিস্তার করে রেখেছে।

সমবায় প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ গড়ে ওঠে সেই জনমণ্ডলীর মিলিত শ্রমে ও বুদ্ধিতে, যে জনমণ্ডলী একই অর্থনৈতিক কাঠামোয়, একই প্রয়োজনের তাগিদ নিয়ে বাস করছে ও সমবায়িক ভিত্তিতে উৎপন্ন বস্তুর বাজারও হাতের কাছে পাচ্ছে। উল্লিখিত তিনটি তত্ত্বের একত্র সমাবেশ না হলে সমবায়ের বিকাশ হতে পারে না। ঠিকভাবে পরিচালিত · হলে সমবায়-ব্যবস্থা ব্যষ্টিগত মালিকানায় সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত হৰে ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির দ্বারা এতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিও সম্ভব হবে।

সমবায়–উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করে তিনটি তত্ত্বের ওপর: **নৈতিকতা, শক্তিশালী প্রশাসন ও জনসাধারণ কর্তৃক সমবায়কে মনপ্রাণ সহকারে গ্রহণ।** এই তিনটি তত্ত্বের সমন্বয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে তার ওপর নির্ভর করবে সমবায়ের সাফল্যের মাত্রা। জনসাধারণকে সমবায় গড়তে উৎসাহ প্রদানের জন্যে–আদর্শ সমবায় উদ্যোগ গড়তে হবে ও সমবায় ব্যবস্থার উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সমবায়ের উৎপাদন ও বণ্টন উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। যথাযথ আধুনিকীকরণ উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাবে।

সমবায়–ব্যবস্থায় মানেজার নির্বাচন করতে হবে তাদের মধ্য থেকে যাদের সমবায়ে শেয়ার আছে। কোন কৃষি–সমবায়ে সদস্যরা তাদের লভ্যাংশ পাবেন দু'উপায়ে–প্রথমতঃ সেই সমবায়ে তাঁরা যে পরিমাণ জমি দান করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে; দ্বিতীয়তঃ উৎপাদনের জন্যে তাঁরা কতটা কায়িক বা মানসিক শ্রম দান করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে। লভ্যাংশ বিতরণের সময় উৎপাদিত দ্রব্যকে প্রথমে আধাআধি (৫০%–৫০%) ভাগ করতে হবে। তৎপরে প্রথম ৫০ শতাংশ শ্রমের ভিত্তিতে ও দ্বিতীয় ৫০ শতাংশ জমির ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে।

সূচীপত্র

একটা বিশেষ কোন অঞ্চলের পরিবর্তে সমস্ত অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ও স্থানীয় সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলোকে উন্নয়ন–প্রকল্পে কাজে লাগাতে হবে। এই ভাবে সমবায়–উদ্যোগের উন্নয়নে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রাউট কৃষি–সমবায় গড়ে তুলে পর্যায়ক্রমে ভূমির সামাজিকীকরণের মাধ্যমে বির্তকিত ভূমি–মালিকানা সমস্যার সমাধান দিয়েছে। স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধাপে ধাপে এই সামাজিকীকরণকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এই পদ্ধতি চলাকালীন কোন নির্দিষ্ট ব্যষ্টি বা গোষ্ঠীর হাতে ভূমির মালিকানা থাকা উচিত নয়।

শিল্পোন্নয়ন:

প্রাউট শিল্প–ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করেছে: মূল শিল্প, যা অব্যবহিত বা আঞ্চলিক সরকার (immediate or local goverment) দ্বারা পরিচালিত হবে; মাঝারী শিল্প যা সমবায়ের দ্বারা পরিচালিত হবে ও ক্ষুদ্র শিল্প–যা থাকবে ব্যষ্টির মালিকানাধীনে। এখানে কোন্ শিল্প সরকারের হাতে থাকবে বা কোন্টা ব্যষ্টি মালিকানাধীনে থাকবে এ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না বা একই শিল্প পাশাপাশি

সরকারী ও ব্যষ্টি মালিকানাধীনেও থাকবে না। বিশ্বের অনেক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কৃষির ওপর যে অত্যধিক চাপ পড়ছে তা হ্রাস করার ওপর প্রাউট বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কোন অবস্থাতেই শতকরা ৪০ ভাগের বেশী মানুষকে কৃষিতে নিয়োগ করা উচিত নয়। ছোট ছোট শহর বা গ্রামাঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় কৃষি-ভিত্তিক বা কৃষি সহায়ক শিল্প গড়ে তোলা উচিত। শুধু তাই নয় কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দিতে হবে যাতে কৃষি-শ্রমিকরাও বুঝতে পারে তাদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য কত।

প্রাউটের মজুরী-নীতি অনুসারে শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য মজুরী যে কেবল অর্থের মাধ্যমেই নিতে হবে তার কোন মানে নেই, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বা সেবার মাধ্যমেও মজুরী নেওয়া যেতে পারে। অর্থ হিসেৰে প্রাপ্য মজুরীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উক্ত উপকরণগুলিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা উচিত।

প্রাউট কৃষি ও শিল্পে সর্বাধিক আধুনিকীকরণকে সমর্থন করে। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। দেখতে হবে আধুনিকীকরণ বা যান্ত্রিকীকরণ যেন ৰেকার সমস্যার বৃদ্ধি না ঘটায়। সর্বদা

লক্ষ্য রাখতে হৰে যেন জনসাধারণের শতকরা একশ' ভাগের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়–যা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসম্ভব। প্রাউটের সামূহিক অর্থনীতি–ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে তেমনি কাজের সময় কমিয়ে সকলের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে।

বিকেন্দ্রীকরণ:

ওপরে যে অর্থনৈতিক সংরচনার কথা বলা হ'ল তা বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রাউট এক নূতন অনন্য বিকেন্দ্রিত অর্থনীতির পরিকল্পনা দিয়েছে। প্রাউট সারা বিশ্বে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী অঞ্চল গড়ে তুলবার সুপারিশ করছে। এই জাতীয় সামাজিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠবে একই অর্থনৈতিক সমস্যা, একই ধরণের সম্পদ ও সম্ভাবনা, জাতিগত সাদৃশ্য, সাধারণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, একই সাধারণ (common) সামাজিক সাংস্কৃতিক ৰন্ধন, যেমন, ভাষা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সেন্টিমেন্ট্যাল লিগ্যাসি (সাংবেদনিক উত্তরাধিকার)–এ সবের ওপর ভিত্তি করে। প্রত্যেক সামাজিক–অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকৰে। প্রত্যেক সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনাও

থাকবে–প্রাউটের ভাষায় যাকে বলা হয় ব্লকভিত্তিক পরিকল্পনা। প্রাউটের অর্থনীতি ব্যবস্থায় ব্লক স্তরীয় পরিকল্পনা পরিষদই হবে সর্বনিম্ন পরিকল্পনা–সংস্থা।

প্রাউটের সংরচনায় একটি রাজনৈতিক অঞ্চল যেমন প্রদেশ বা রাষ্ট্রে থাকবে সাধারণতঃ একাধিক সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যে ৫টি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠতে পারে। যথা–অঙ্গিকা, মগ্রহী, মৈথিলী, ভোজপুরী ও নাগপুরী। উপরিউক্ত নীতিতে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে প্রায় ৪৫টি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। এই অঞ্চলগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুরোপুরি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করার পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারান্টী থাকা উচিত।

যদি এই সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি তাদের সর্বাত্মক সামাজিক– সাংস্কৃতিক–অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্যে পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী গ্রহণ করে তাহলে সারা ভারতবর্ষে এক ব্যাপক সামাজিক–অর্থনৈতিক জাগরণ দেখা দেবে। সমস্ত জনসাধারণ–কি ধনী, কি দরিদ্র, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত–সবাই শোষণ–বিরোধী সেন্টিমেন্টের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সামাজিক–অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে এক শক্তিশালী

আন্দোলন শুরু করবে। যারা এক সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাস করে তারা যদি ব্যষ্টিগত সামাজিক–অর্থনৈতিক স্বার্থকে সমষ্টিগত সামাজিক অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, তবে যে কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পদের বহিঃস্রোত ৰন্ধ হয়ে যাৰে ও সঙ্গে শোষণেরও মূলোৎপাটন সম্ভব হবে।

প্রাউটের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্থানীয় জনসাধারণের পূর্ণ কর্মসংস্থানের অধিকারের নিশ্চিততা থাকবে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণ বহিরাগতদের থেকে অগ্রাধিকার পাবে। যেখানে যথাযথ ভাবে নৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে না সেখানেই দেখা দেয় উদ্বৃত্ত শ্রম। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি অনুন্নত অর্থনৈতিক অঞ্চলে থাকে উদ্বৃত্ত শ্রম। যদি এক অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা কর্মের সন্ধানে অন্য অঞ্চলে চলে যেতে থাকে, ওই উদ্বৃত্ত শ্রম এলাকা চিরদিনই অনুন্নত থেকে যাবে। যেখানে উদ্বৃত্ত শ্রম আছে সেখানে অবিলম্বে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান করার সময় স্থানীয় সেন্টিমেন্টের কথাও বিবেচনা করতে হবে। কোন সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে কৃষি–ভিত্তিক ও কৃষি–সহায়ক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া এই অঞ্চলের সামূহিক প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য শিল্পও গড়ে তোলা উচিত। এই নীতি নূতন কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ

এনে দেবে। কর্মসংস্থানের এই পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে।

বিকেন্দ্রিত সামাজিক–অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অতি সহজেই কৃষি ও শিল্পের আধুনিকীকরণ করা যায় ও তার উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারও সহজে পাওয়া যায়। এইভাবে যদি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি আপন আপন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায় তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের মাথা পিছু আয়–বৈষম্য হ্রাস পাৰে ও অনুন্নত অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে তাকে উন্নত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমপর্যায়ে আনা যাবে। প্রত্যেকেই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। যখন প্রত্যেকটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আসবে তখন সমস্ত দেশই অতি দ্রুত অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে।

প্রাউটের পরিকল্পনার নিয়ামক নীতি (guiding principle) হ'ল এই বিকেন্দ্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

প্রাউটের মতে **ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি হবে চারটি তত্ব– উৎপাদন–সম্ভাব্যতা, উৎপাদন ব্যয়, ক্রয়ক্ষমতা ও সামূহিক প্রয়োজনীয়তা।** অন্যান্য তত্ব হ'ল প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, নদীধারা,

পরিবহন ব্যবস্থা, শিল্প সম্ভাবনা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক অবস্থা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুস্পষ্ট নীতি ও নানান সংকীর্ণ সেন্টিমেন্টের প্রাধান্যের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি আজ পঙ্গু ও গতিহীন হয়ে পড়েছে। মথুরা ও বারাউনীর মত জায়গায় বিশাল তৈল শোধনাগার গড়ে তোলা হয়েছে বা অন্যান্য অনেক স্থানে ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ এই সব স্থানের কাছাকাছি হাজার মাইলের মধ্যে এই সব শিল্পের কাঁচা মাল নেই। ওই সমস্ত স্থানে সস্তা বিদ্যুৎও নেই। এ জাতীয় কর্ম–পন্থা শুধু দেশের সম্পদ ও কর্মক্ষমতার অপব্যবহারই নয় এতে ভারতীয় পরিকল্পনাকারীদের অজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির অভাবই সূচিত করছে। এই অবস্থা মনে করিয়ে দেয় সেই ব্রিটিশ রাজত্বের কথা; যখন বাংলার পাট পাঠানো হত গ্রেট ব্রিটেনের ডান্ডির চটশিল্পের উন্নয়নের জন্যে। বাংলা থেকে পাট সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাণ্ডির চট–শিল্পও বন্ধহয়ে গেল। যদি ডাণ্ডির চট–শিল্পজাত পণ্য বাংলায় বিক্রি না হত তাহলে ডান্ডির চট–শিল্প দাঁড়াতে পারত না। বর্তমান বাংলার মৃতপ্রায় চটকলগুলিরও ওই একই অবস্থা। আজকাল রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া হয়, "ৰন্ধ চটকল জাতীয়করণ করতে হবে", "চটকলে লক্–আউট ৰন্ধ করতে হবে"। এদিকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা দু'হাতে টাকা লুটছে আর হাজার

হাজার বেকার শ্রমিক বঞ্চনা, অনাহার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। বাংলায় যা চটকল আছে সেই চটকলগুলি চালানোর জন্যে যতটা কাঁচা পাটের প্রয়োজন ৰাংলায় ততটা উৎপন্ন হয় না। ফলে ওই চট-কলগুলি চালু রাখার জন্যে অন্য অঞ্চল থেকে কাঁচা পাট আমদানি করতে হয়। যদি ৰাংলায় মানুষ এই পাট-শিল্পগুলি বাঁচাতে চায়, তবে পরিষ্কার ভাবে কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হৰে। প্রথমেই এই অঞ্চলে কাঁচা পাট উৎপাদনের ভিত্তিতে পাট কলগুলির সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। বাকী মিলগুলিকে হয় বন্ধ করে দিতে হবে না হয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে কাজে লাগাতে হবে। যে মিলগুলি চালু থাকৰে সেগুলিতে পাট জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপাদন না করে প্রধানতঃ পাট-সূতা উৎপাদন করতে হবে। এই পাট-সূতা সমবায়ের মাধ্যমে কর্ষক ও তন্তুবায়দের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। যদি এ পন্থা অবলম্বন করা হয় তবে বাংলার সূতার বিপুল চাহিদা মিটিয়েও উদ্বৃত্ত সূতা অন্য অঞ্চলে রপ্তানি করা যেতে পারবে। যদি এই শিল্পকে বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় তবে এই সূতা-শিল্প থেকে যে সম্পদ সৃষ্টি হৰে তাতে স্থানীয় মানুষের জীবন ধারণের মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ধনী পাট-ব্যবসায়ীদের ব্যাপক শোষণের অবসান হবে।

তাই উপরিউক্ত তত্ত্বগুলির ভিত্তিতে প্রতিটি সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের উচিত অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্যে আপন আপন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচনা করে' তার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। স্থানীয় অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ বিরাট বিরাট পরিকল্পনা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর সমস্ত দেশের কেন্দ্রিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। প্রাউটের বিকেন্দ্রিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নীতি অনুসারে ব্লক ভিত্তিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রতিটি সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্যে একটি সুসংগ্রথিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (co-rdinated plan) রচনা করার প্রয়োজন। আবার বাংলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া সহ সমগ্র পশ্চিম রাঢ়ের জন্যে একটি উপ–পরিকল্পনা (sub-plan) রচনা করা উচিত। আবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের জন্যেও আর একটা উপ–পরিকল্পনা রচনা করা উচিত। এছাড়া সমগ্র সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্যেও সুষ্ঠু ব্লক ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এভাবেই অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে।

ব্যবসা–বাণিজ্য:

সূচীপত্র

ব্যবসা ৰাণিজ্য, কর–ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কিং–এর ক্ষেত্রেও প্রাউটের নিজস্ব বৈশিষ্ট রয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বণ্টন করতে হৰে উপভোক্তা–সমবায়ের মাধ্যমে; সরকার, ব্যাবসায়ী বা বিভিন্ন স্তরের দালালদের মাধ্যমে নয়। এটা করা হলে মুনাফা–ৰাজরা কোন রকম কারসাজি করার সুযোগই পাৰে না। প্রাউটের মতে বিভিন্ন স্বয়ং–সম্পূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য যতদূর সম্ভব পণ্য বিনিময়ে (barter system) মাধ্যমে করতে হবে। **নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীকে কর–মুক্ত করতে হবে। আয়কর থাকবে না। পরিবর্তে উৎপাদনের প্রারম্ভ–বিন্দুতেই কর ধার্য করতে হবে। ব্যাঙ্ক–ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত করেতে হবে।** কেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক অব্যবহিত সরকার বা স্থানীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রাউটের উৎপাদনক্ষম অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হ'ল, সর্বোপরি জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই ব্যবস্থায় সমবায় পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সহজেই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

(কলিকাত, ১৯৮১)

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের জন্যেও আর একটা উপ-পরিকল্পনা রচনা করা উচিত। এছাড়া সমগ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্যেও সুষ্ঠু ব্লক ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এভাবেই অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হৰে।

ত্রিস্তরীয় পুঁজিবাদ

কোন রকম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে সব চেয়ে প্রথমে এই শোষণের ধরণ ধারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে অবহিত থাকতে হবে। আজ সমগ্র মানবসমাজ বৈশ্য শোষণের নিষ্পেষণে ওষ্ঠাগত-প্রাণ। পুঁজিবাদী শোষণ তার ব্যাপক জাল বিস্তার করে মানুষের অস্তিত্বকে এক চরম বিপর্যয়ের প্রান্ত সীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে। প্রাউটের মতে এই পুঁজিবাদী শোষণ হ'ল ত্রিস্তরীয়। ভৌতিক স্তরের শোষণ-যার সম্পর্কে আমরা সম্যক অবহিত আছি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শোষণ। এই তিন রকমেরই শোষণ সমভাবে বিপজ্জনক। ভৌতিক স্তরের পুঁজিবাদী শোষণের এই যে সমস্যা এর সমাধান করতে

গেলে দেখতে হবে, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের যাতে হাতে করে' অর্থশক্তির চলমানতা সীমাৰদ্ধ বা একেবারে অচল হয়ে না পড়ে। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর একবারে খোলনলচে পালটে ফেলতে হবে.... গড়ে তুলতে হৰে একবারে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অর্থনৈতিক কাঠামো। সেই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে অর্থশক্তি সীমাৰদ্ধ বা অচল না থেকে তার চলমানতাকে পুরোমাত্রায় যেমন যেমন অব্যাহত রাখবে, তেমনি তার ফলে সমষ্টি দেহের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনও বলিষ্ঠ ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠবে।

মানসিক স্তরে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, আজকের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সামূহিক কল্যাণের স্বার্থে তাদের অর্জিত জ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টার অভাব। সুবিধাভোগী এলিটিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মনস্তত্ত্ব হ'ল এই যে, প্রাকৃত জনের কল্যাণের জন্যে তারা তাদের সুখ সুবিধা বিসর্জন দিতে চায় না। এই মনস্তত্ত্ব থেকে এক বিশেষ ধরণের পুঁজিবাদের জন্ম।

এই ৰৌদ্ধিক পুঁজিবাদ সমাজে কয়েকটিই উগ্র সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ জনসাধারণের একটা বৃহদংশের মধ্যে আক্ষরিক জ্ঞান জাগানো হয় না; দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃত জনগণের সামাজিক অর্থনৈতিক চেতনাকে প্রোৎসাহিত করা হয় না;

তৃতীয়তঃ তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা ও ভীতম্মন্যতা ইত্যাদি সৃষ্টি করে' তাদের মনকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, মানুষের বৌদ্ধিক তথা নৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয় ও এর ফলে বৌদ্ধিক অনগ্রসরতা আর যুক্তিহীনতা প্রকটভাবে দেখা দেয়। এর সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে ভৌম ভাবপ্রবণতা (জিও-সেন্টিমেন্ট), গোষ্ঠী ভাবপ্রবণতা (সোসিও-সেন্টিমেন্ট) ইত্যাদি সংকীর্ণ সেন্টিমেন্টগুলো সমাজের ওপর এক বিপর্যয়কারী প্রভাব বিস্তার করে, তার অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ ৰৌদ্ধিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ, ডগ্‌ম্না বা ভাবজড়তা-আশ্রয়ী মতবাদ, উপধর্মীয় কুসংস্কার ও তথাকথিত ধর্মীয় যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠান ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করে।

বর্তমানে ৰৌদ্ধিক জড়তা মারাত্মক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ধনলোলুপ বৈশ্যরা এই ৰৌদ্ধিক স্থবিরতার সুযোগ নিয়ে সূক্ষ্মতর উপায়ে শোষণের সূক্ষ্ম লূতাতন্তু বিস্তার করে সমাজ জীবনের জীবনী শক্তিটুকু শুষে নিচ্ছে ও তারা শোষণের বিজয়রথ নক্কার জনক ভাবে চালিয়ে যেতে পারছে।

দীর্ঘকাল ধরে জনগণ এই বৈশ্য শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। বহুক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই মানুষ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনেও নেবেছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের এই যে অসন্তোষ বৈশ্যের দল সে বিষয়ে সতর্ক

থেকে শোষণের ধরণ-ধারণের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পুঁজিবাদী বৈশ্যের দল তাদের ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় বুদ্ধিজীবিদের অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়ে তাদের শোষণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছে। অধিকন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে ধনতন্ত্র সর্বদাই খাপ খাইয়ে নেয়। তাই দেখতে পাই, এক এক সময়ে বৈশ্যশোষণের এক এক রূপ-যেমন সামন্ততন্ত্র, অৰাধ বাণিজ্যতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব-উপনিবেশবাদ, মিশ্র-অর্থনীতি, বহুজাতিক কর্পোরেশন প্রভৃতি। যে কম্যুনিজম্ এককালে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক ও অব্যর্থ পাশুপত অস্ত্র বলে মনে করা হ'ত তা আজ ভোঁতা ও সেকেলে অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

পুঁজিবাদের এই মারাত্মক ও সর্বগ্রাসী শোষণের আধুনিকতম রূপ হচ্ছে মানস-অর্থনৈতিক শোষণ। এই মানস-অর্থনৈতিক শোষণ হল এমন এক ধরণের শোষণ যাতে প্রথম জনগণকে বিভিন্ন উপায়ে মানসিক দিক থেকে দুর্বল করে'-পঙ্গু করে' তারপর অর্থনৈতিক শোষণ করা হয়। এর কয়েকটি পদ্ধতি হ'ল এই রকম: (১) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অবদমন; (২) অসংস্কৃতির (pscudu- culture) ব্যাপক প্রসার-যা অশ্লীল সাহিত্যের মাধ্যমে জনমনে ও বিশেষ করে' তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক

ব্যাপক অশুভ প্রভাব বিস্তার করে' তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়; (৩) নারী জাতির ওপর নানান বিধিনিষেধ আরোপ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের পরমুখাপেক্ষী করে রাখা; (৪) অমনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বার বার উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ; (৫) ধর্মনিরপেক্ষতার (secularism) নামে ধর্মহীনতার প্রসার; (৬) সমাজে নানান জাত-পাত তৈরী করে সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করে রাখা; (৭) জন্মনিয়ন্ত্রণের অপ্রাকৃতিক ক্ষতিকর উপায় অবলম্বনে সমাজের প্রভূত ক্ষতি করা; (৮) সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিবিসন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচার-যন্ত্রগুলিকে বৈশ্যদের নিয়ন্ত্রণে আনা ইত্যাদি।

বৌদ্ধিক শোষণ ও মানস-অর্থনৈতিক শোষণ উভয়ই আজ সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক। একে প্রতিহত করতে হ'লে অবিলম্বে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে, ঘটাতে হবে বুদ্ধির মুক্তি। এজন্যে সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে সমাজের যথার্থ বুদ্ধিজীবিদের নিজেদের বুদ্ধিকে সচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত করতে হবে; সর্ব প্রকার জড়তা ও সংস্কার ত্যাগ করে' জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে তাদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে ও শোষণ বিরোধী আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানাতে হবে। এতে একদিকে যেমন শোষণ সমূলে উৎপাটিত হবে, অপরদিকে সামাজিক সংরচনাও সুদৃঢ় হবে, জনগণের বৌদ্ধিক

মান উন্নত হবে, মানবসমাজ দ্রুততর পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলবে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

ভৌতিক ও মানসিকস্তর ছাড়াও তৃতীয় স্তরের পুঁজিবাদ হ'ল প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে, অনেকেই সমাজ-সংসারকে অবহেলা করে' তথাকথিত মুক্তি-মোক্ষের লালসায় ৰনে-জঙ্গলে-গুহায় কঠোর তপশ্চর্যায় রত। তাঁরা আধ্যাত্মিক কার্পণ্যের বশবর্তী হয়ে' তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা শক্তি নিজেদের মধ্যে রেখে দিতে চাইছেন। এঁদের মধ্যে প্রায় কেউই প্রতিটি মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর বা সামুহিক আধ্যাত্মিক প্রগতির কোন প্রয়োজন অনুভব করছেন না। এটাকে বলতে পারি প্রজ্ঞাভৌমিক পুঁজিবাদ। এটা আধ্যাত্মিক সাধনার যে মূলনীতি 'আত্মমোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ'-এর পরিপন্থী। প্রকৃত অধ্যাত্মবাদীদের কাছে আব্রহ্মস্তম্ব সবকিছুই সেই পরমপুরুষের অভিব্যক্তি। এই সমদর্শিত্ব আধ্যাত্মিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এই গুণ অর্জিত না হলে কেউই পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদীদের পরমাগতির দিকে অগ্রগমন পদে পদে ব্যাহত হতে বাধ্য। অতীতে অনেকের ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

যথার্থ আধ্যাত্মিক সাধনায় সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার রয়েছে, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল কথা হচ্ছে একটা বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিকতা-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। আজকে যা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তা হ'ল হৃত মৌল মানবিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন তথা পুনঃস্থাপন। এটাই যুগের দাবী। আজকের সমাজ জীবনের এই অতি গুরত্বপূর্ণ মৌল মানবিক মূল্যৰোধের অভাব ঘটায় মানৱ-সমাজে দেখা দিয়েছে নানান ধরণের অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খলা।

আজ তাই প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান নীতিবাদের ওপর কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত কিছুসংখ্যক আদর্শ ব্যষ্টির নেতৃত্বে সংঘটিত এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব তথা সর্বাত্মক বিপ্লব। এই সর্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ ব্যষ্টিদেরই বলা হৰে 'সদ্বিপ্র'। এই সদ্বিপ্রেরা সর্বযুগে সর্বদেশে সমাজের প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখবেন।

সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের আজ এই মহৎ কাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নেমে আসতে হবে। ধূলির ধরণীতে ছড়িয়ে দিতে হবে তাদের প্রজ্ঞা সম্পদ সবার মাঝে, ভাগ করে নিতে হবে সকলের দুঃখক্লেশের বোঝা। এভাবেই দুনিয়ার মানুষের চিন্তা নূতন মোড় নেবে, তাতে সঞ্চারিত হৰে আধ্যাত্মিক শক্তি, জেগে উঠৰে দুর্মর আশাদৃপ্ত নূতন প্রজন্মের নূতন মানুষেরা।

(কলিকাতা, ১৯৮১)

সূচীপত্র

সমাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীৰদ্ধতা

বর্তমানে পৃথিবী থেকে বৃহৎ প্রাণী প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। এই সৰ বিরাট জন্তু-জানোয়ারদের বেঁচে থাকার উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হতে চলেছে। অতীতে পৃথিবীতে অনেক বৃহৎ জন্তু-জানোয়ার বাস করত কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও এই গ্রহের ওপরে মানুষের আধিপত্য বিস্তারের ফলে এই সৰ অতিকায় জন্তু-জানোয়াররা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনুরূপ ভাবেই ছোট ছোট রাষ্ট্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে। মানুষ ছোট ছোট রাষ্ট্র অপেক্ষা বড় বড় সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করতে আগ্রহী। সংকীর্ণ সেন্টিমেন্ট ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। মানুষের মনে বিশ্বৈকতাবাদী ভাবধারার উদয় হচ্ছে। যে সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও ভাবজড়তা এত দিন সমাজের অনেকাংশের শ্বাস রুদ্ধ করে রেখেছিল আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশ তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। যুক্তি-বিচার ও 'সর্ব-জনহিতায়' ভাবনাকে মানবতা

এখন গুরুত্ব দিতে শুরু করছে। তাই বর্তমান যুগ বৃহৎ প্রাণী ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের যুগ নয়।

'প্রাউট' বর্তমান পৃথিবীর এই সামাজিক অর্থনৈতিক প্রবণতা অনুসারে সর্বত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ অঞ্চল (unit) গড়ে তোলার নীতিতে বিশ্বাসী। এই সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি আপন আপন এলাকায় জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণকে ত্বরান্বিত করবে ও এক সাধারণ ভাবাদর্শের ভিত্তিতে সর্বমানবকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করৰে। এই সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি যতই শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হবে ততই ধীরে ধীরে এগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে যাবে। বিশ্ব রাষ্ট্র তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবে পৃথিবীর সকল মানুষের ও সকল নেশনের স্বার্থ রক্ষিত হবে, সৰাই যথাযথ স্বীকৃতি পাৰে, এইভাবে প্রাউট সর্ব মানবের সার্বিক কল্যাণকে সুনিশ্চিত করবে।

প্রাউট ভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল, এর লক্ষ্য্য মানব-মুক্তির বহুমুখী ধারার সার্বিক নিশ্চিততা প্রদান। ইতিহাসের ঊষা-লগ্ন থেকে মানুষ প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্যে বিরামহীন সংগ্রাম করে আসছে। এ সংগ্রাম মানব প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও মানুষের এই মুক্তির

আকাঙ্ক্ষা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই। আর এই মুক্তিকে সুনিশ্চিত করতে মানুষ সমস্ত প্রকার অবদমনের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করবে। তবুও আমরা দেতে পাই যখন কোনো নিপীড়িত গোষ্ঠী বা শ্রেণী কিছুটা স্বাধীনতা পেয়েছে তখন তারাও আবার অন্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীর ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে।

আজ যতটুকু স্বাধীনতা আমরা সমাজে দেখতে পাই তা ব্যষ্টি বা গোষ্ঠীর দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতি। এই সংগ্রাম ও মানস–অনুসন্ধান এই হচ্ছে স্বাভাবিক মানব–প্রকৃতি। মানুষের সকল বাসনার মূল হ'ল সুখ–প্রাপ্তির মৌল আকাঙ্ক্ষা, পরম আনন্দ প্রবাহে নিজেকে প্রতির্ষ্ঠিত করবার ইচ্ছা, এর অর্থ হ'ল ব্যষ্টিগত জীবনে মানুষকে পরমপদে প্রতির্ষ্ঠিত হতে হৰে ও সমস্ত আপেক্ষিকতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে হবে। দেশ–কাল–পাত্রের ৰন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, আর কেবল পরম তত্ত্ব লাভই মানুষের অন্তরের এই আনন্দ প্রাপ্তির ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারে।

সামূহিক জীবনে –সামাজিক জীবনে পরম মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তবে এই পরম মুক্তি–লাভের জন্যে ব্যষ্টিকে সমাজ উৎসাহিত করবে। সামূহিক জীবনের মুক্তি তখনই সুনিশ্চিত হয়, যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষ অৰাধে সার্বিক অভিব্যক্তি

ঘটাতে পারে। এই সর্বস্তরের মুক্তিকে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে আমাদের কর্তব্য উপযুক্ত বাতাবরণ, উপযুক্ত সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা–যা আজকে নেই।

গোষ্ঠীৰদ্ধতার শর্তাবলী

সামাজিক–অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার সময় অনেক বিষয় বিবেচনা করা উচিত। এগুলি হ'ল সম–অর্থনৈতিক সমস্যা, সম–অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, জনগোষ্ঠীগত (ethnic) বৈশিষ্ট্য, সাধারণ সাংবেদনিক উত্তরাধিকার (সেন্টিমেন্ট্যাল লিগ্যাসি) ও একই ধরণের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

সম–অর্থনৈতিক সমস্যা বলতে যা বোঝাচ্ছে, তা হ'ল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে একই ধরণের অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই সমস্যার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত ৰাজারের অভাব, উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি, শ্রম–সমস্যা, যোগাযোগ ও পরিবহন–সমস্যা, সেচের জন্যে জল–সমস্যা ইত্যাদি। একটি সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলবার সময় ওই অঞ্চলে প্রথমেই উপরিউক্ত সমস্যাদি

আছে কিনা সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি ও তাঁর সমাধানের উপায়ও ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোন এক সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে একই ধরণের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকা উচিত। যদিও এটা স্বাভাবিক যে, একই সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পার্থক্য থাকৰেই, তবে পুরো এলাকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক বিকাশের একই ধরণের সুযোগ আছে কি না দেখতে হবে। যাদের সবকিছু আছে আর যাদের নেই–ধনী ও দরিদ্র–এদের মধ্যে যে বৈষম্য–তা প্রগতিশীলভাবে হ্রাস করে যেতে হবে, যাতে সমস্ত জনসাধারণের সামুহিক উন্নতি ঘটে ও যথার্থ জনকল্যাণমূলক সমাজ প্রতির্ষ্ঠিত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, একটি সামাজিক–অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীগত মিল (Ethnic similarities) থাকা উচিত। অতীতে বহু জাতি ও উপজাতি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী 'জাতির দ্বারা অবদমিত ও শোষিত হয়েছে। এই প্রভাবশালী জাতি সমাজকে খণ্ড–বিখণ্ড করে নিজেদের আধিপত্য প্রতির্ষ্ঠার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে জাতিবাদের প্রচার করেছে। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর সংকীর্ণ সেন্টিমেন্ট থেকে সমাজকে রক্ষা

করতে হবে। আর এটা সম্ভব হবে যদি প্রতিটি জনগোষ্ঠী তাদের অভিব্যক্তি ও বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। নানান বর্ণের পুষ্পে রচিত মানবতার মাল্যখানি সৌন্দর্যের পরম আকারে পরিণত হবে তখনই যখন নানান্ জনগোষ্ঠী ভয় ও বাধ্যবাধকতায় একত্রিত হতে বাধ্য না হয়ে আপন শক্তি ও স্বাধীনতার মর্যাদাপূর্ণ আসন থেকে প্রকৃত ভাই–বোনের ভালবাসা নিয়ে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হৰে।

চতুর্থতঃ, সাংবেদনিক উত্তরাধিকার–যার মধ্যে এসে যাচ্ছে ভাষা, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, সাহিত্য, সাধারণ প্রথা, সংস্কৃতি প্রভৃতি। এ হ'ল এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামূহিক মনস্তত্ত্বের সাধারণ সূত্র যা ওই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে অভিন্নতা ও আত্মীয়তা–ৰোধ সৃষ্টি করেছে।

মানুষ প্রধানতঃ স্বভাবগতভাবে ভাবপ্রবণ (সেন্টিমেন্ট্যাল)। সে তার দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে পৃথিবীর নানান বস্তুর সঙ্গে এক ধরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। কোন প্রিয় বস্তুর প্রতি সেন্টিমেন্ট যদি সামূহিক সেন্টিমেন্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে ওই সেন্টিমেন্টকে মানব–সমাজের ঐক্য–প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। কখনও কখনও অনেক কিছুর প্রতি মানুষের সেন্টিমেন্ট

সামূহিক সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যায় ও তার ফলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনৈক্য সৃষ্টি হয়।

যে সমস্ত সেন্টিমেন্ট মানব-ঐক্যের সহায়ক সেগুলিকে উৎসাহিত করা উচিত ও যে সমস্ত সেন্টিমেন্ট মানব-সমাজে ফাটল ধরায় সেগুলিকে বর্জন করা উচিত। প্রাউটের সমাজিক-অর্থনৈতিক-গোষ্ঠী এই নীতি নিয়ে চলে।

সর্বশেষ সম-ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভূমি-সংস্থান, নদী-ব্যবস্থা, বৃষ্টিপাত, সেচের জল-এগুলিও সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরীর জন্যে বিশেষভাবে বিবেচ্য।

প্রাউট-ভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠী-রচনা হ'ল এক গণ-আন্দোলন-যা সমস্ত প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে ও সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় দাবী ও জনগণের সেন্টিমেন্টের পক্ষে সংগ্রাম করবে। এই আন্দোলন "এলাকাটিকে জানো, পরিকল্পনা রচনা করো ও জনগণের সেবা করো" এই নীতি নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলবার জন্যে কাজ করবে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল

কোন সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের সদস্য তাঁরাই হবেন যাঁরা স্থানীয় ভাষায় কথা বলেন ও সেই অঞ্চলে বসবাস

করেন। যাঁরা সংশ্লিষ্ট সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে মিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁরাই হলেন ওই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষ।

প্রত্যেকটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলকে তার বিকাশের জন্যে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে ও এজন্যে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এর মধ্যে এসে যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি সংস্থান, নদী–ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা, যোগাযোগ, শিল্প–সম্ভাবনা ও উন্নয়ন কর্মসূচী। এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনায় বিশেষ সহায়ক।

কোন বিশেষ অঞ্চলের শিল্প উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে যদি ওই অঞ্চল থেকে বাইরে সরিয়ে দেওয়া হয় বা তার অপব্যবহার করা হয় তবে ওই অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যাহত হৰে। সুতরাং কোন ক্রমেই একটা সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের মূলধনের বহিঃস্রোত ঘটানো চলবে না ও এই সম্পদের সর্বাধিক উপযোগ গ্রহণ করতে হবে।

যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোন একটি বিশেষ সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল অর্থনৈতিক সুবিচার না পায় তাহলে তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেটের মধ্য থেকে তাদের জন্যে পৃথক অর্থভাণ্ডারের (fund) দাবীতে আন্দোলন করতে পারে। এই

আন্দোলন করার পরও যদি তারা সুবিচার না পায় তখন তারা পৃথক রাজ্যের দাবী করতে পারে। তবে পৃথক বাজেট ও পৃথক প্রশাসন সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক রাজ্য (বা রাষ্ট্র) গড়ার পক্ষপাতি প্রাউট নয়। বহু সংখ্যক রাজ্য (বা রাষ্ট্র) সৃষ্টি হলে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা অনেক বৃদ্ধি পাৰে। এতে প্রশাসনিক ব্যয় দ্বিগুণ হবে ও অপচয় বাড়বে। বরং ছোট ছোট রাজ্যকে (বা রাষ্ট্রকে) সংযুক্ত করে বড় সামাজিক অঞ্চল গড়া বিধেয়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির মিলনের শর্ত

দুই বা ততোধিক সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চল একসঙ্গে মিলিত হতে পারে যদি কয়েকটি শর্ত পূরণ হয়। শর্তগুলো হলো অর্থনৈতিক সাদৃশ্য, যোগাযোগের সুবিধা ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা। এই শর্তগুলি পূরণ হলে ওই অঞ্চলগুলির মধ্যে উচ্চপর্যায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমতা আসবে। তখন তাদের পক্ষে মৈত্রীপূর্ণ সহযোগিতা স্বাভাবিক ও সহজ হবে। এ অবস্থায় ওই অঞ্চলগুলি তাদের অধিকতর সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যে তথা ওই এলাকাগুলির সমস্ত মানুষের কল্যাণে একত্রিত হয়ে একটি অভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হতে পারে।

এখন ভারতের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ওড়িষ্যার পূর্বাঞ্চল প্রচুর খনিজ সম্পদ তথা কয়লা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদিতে পূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ এইসৰ খনিজ সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করছেন। যদি এই কাঁচামালগুলি স্থানীয়ভাবে শিল্প উৎপাদনে ব্যবহার করা হত, তাহলে অতি সহজেই ৪টি বৃহৎ ইস্পাত শিল্প পরিচালনা করা যেত, তাতে মাথা পিছু আয়ও বৃদ্ধি পেত! কিন্তু নেতৃবৃন্দ এইসৰ বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে খেয়ালখুশীমত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করছেন। তাই ওই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ফলে না অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হচ্ছে–না সামুহিক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সামুহিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রথমেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে দেশকে কতকগুলি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে। **যদি রাজনীতি ও ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয় তাহলে যথাযথ সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কখনই রচনা করা যাবে না** ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কখনই রচনা করা যাবে না ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি যথাযথ ভাবে মনোযোগ দান করা সম্ভব হবে না। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত

করার জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল অপরিহার্য।

এখন একই রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা–যুক্ত বিভিন্ন সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে জলসেচের বিরাট সমস্যা। কিন্তু উত্তর বিহারের সমভূমিতে জল নিষ্কাশন এক সমস্যা। একই ভাবে রায়্যালসীমা, শ্রীকাকুলাম ও তেলেঙ্গানা–একই রাজনৈতিক প্রদেশ অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের অর্থনৈতিক সমস্যা ভিন্ন। এগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে ওই অঞ্চলগুলির জনসাধারণের স্বার্থে পৃথক পৃথক সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা উচিত। প্রশাসনিক প্রয়োজনে এই ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিকে এখনই একই অর্থনৈতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করলে জটিলতা দেখা দিতে পারে। **একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে প্রয়োজনে দুটি রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যেতে পারে। আবার একই রাজনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চলও থাকতে পারে।**

এই নীতিতে বিভিন্ন সামাজিক–অর্থনৈতিক গোষ্ঠী তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারবে। **এই ভাবে দুটি অঞ্চল উন্নয়নের প্রায় সমস্তরে এসে পৌঁছলে তাদের পক্ষে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহত্তর সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা সম্ভব। এভাবেই ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিণত হৰে একটি মাত্র সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে। পরবর্তী পর্যায়ে বিরামহীন বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সমগ্র দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া একটি অভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিণত হবে। এমনি করে একসময় সারা পৃথিবী একটি সুসংহত সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে কাজ করতে পারবে। এই অবস্থাতে সম্ভব হৰে প্রকৃত বিশ্ব–ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। এই পর্যায়ে পৌঁছানোর পর প্রাউটের গণ–আন্দোলন এক সার্বিক সুসন্তুলিত সংরচনা তথা 'প্রমা'র (equilibrium & equipose) প্রতিষ্ঠা করবে।**

আঞ্চলিক শ্রীবৃদ্ধির পথ দিয়ে বিশ্বৈকতাৰাদের প্রতিষ্ঠা

সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল রচনার তত্ত্ব অত্যল্পকালের মধ্য সারা বিশ্বে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলবে। বিভিন্ন সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও

সামাজিক–অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু এই সৰ বিভিন্নতার ভিত্তিতে মানব–সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করা চলবে না। যদি মানব সমাজের সাধারণ (common) সেন্টিমেন্টকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ও ঐক্যের বিষয়গুলিকে সামূহিক বিকাশের ভিত্তি করা হয়, তাহলে এই বৈচিত্র্যগুলো মানবতাকে ছিন্ন ভিন্ন না করে সমৃদ্ধই করবে। তাছাড়া প্রত্যেক সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলকে যদি সর্বানুস্যূত ভাবাদর্শের দ্বারা ও বিশ্বৈকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হয় তাহলে মানব সমাজ সমুন্নত আদর্শের অভিমুখে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলবে।

প্রাউট ৰলে যেকোন সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলনের সফলতার জন্যে প্রথমেই চাই একটা সুসংহত পূর্ণ আদর্শ। প্রাউটের এই সামাজিক–অর্থনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি নব্য মানবতাবাদ। এই নব্যমানবতাৰাদ সমস্ত মানুষকে ঐক্যের সূত্রে বেঁধে বিশ্বৈকতাবাদ–ভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করবে। তবে এটা সত্য পৃথিবীতে রাতারাতি বিশ্বৈকতাবাদের প্রতিষ্ঠা হবে না। তা বাস্তবায়িত হবে ধাপে ধাপে। তখন মানুষ বিশ্বের সমস্ত মানুষকেই শুধু নয়, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অপ্রাণীন সত্তাকেও আপন করে নেৰে। যদি একজন মানুষও বিশ্বৈকতাবাদের পরিধির বাইরে থেকে যায় ও শোষণের

শিকার হয় তাহলে নব্যমানবতাবাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে। তাই তা মোটেই কাম্য নয়।

প্রাউটের নীতির বৈশিষ্ট্য হ'ল, **আঞ্চলিক শ্রীবৃদ্ধির পথ ধরে বিশ্বৈকতাবাদের প্রতিষ্ঠা–Universal in spirit but regional in approach.**

শোষণ থেকে রক্ষা–কবচ

এখন প্রশ্ন, সারা পৃথিবীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হবার পর কিভাবে ভবিষ্যতে শোষণের সম্ভাবনাকে দূর করা যাবে? প্রাউটের মতে, যদি নিম্নলিখিত ৪টি উপাদান সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলে যাবতীয় শোষণ থেকে মানুষকে রক্ষা করা যাবে। এই উপাদান গুলি হলঃ (১) পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, (২) বিজ্ঞান–সম্মত আধ্যাত্মিক ভিত্তি, (৩) আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত কর্মীদল ও (৪) উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান।

একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শের বিভিন্ন দিক রয়েছে। প্রথমতঃ এই পূর্ণাঙ্গ আদর্শই হবে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ ও এই সব সমস্যার সার্বিক সমাধানের ভিত্তিভূমি। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের মানসিক বিস্তার ও আধ্যাত্মিক পরাগতিকে অবহেলা করা চলবে না। তৃতীয়তঃ, আদর্শের সঙ্গে

গতিশীলতা ও প্রাণোচ্ছলতাকে সমন্বিত করতে হবে, যাতে করে তা মানবতাকে সর্বাত্মক প্রগতির অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞান-সম্মত আধ্যাত্মিক ভিত্তি সমাজ থেকে সর্বপ্রকার ভেদভাবনা ও মানসিক সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী সমস্ত প্রকার গোষ্ঠী-মতবাদ থেকে মানুষকে রক্ষা করবে। বিজ্ঞান-সম্মত আধ্যাত্মিকতা মানুষের মধ্যে কোন কৃত্রিম ভেদকে স্বীকার করে না। কুসংস্কার ও হতাশা নয়, ক্রমবিকাশ ও আত্মোন্নতিই আধ্যাত্মিকতার মূল কথা।

আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত কর্মীদল সর্বপ্রকার শোষণ থেকে সমাজকে রক্ষা করবার নৈতিক পটভূমিকা রচনা করবে ও "আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ” এই আদর্শের ভিত্তিতে সমগ্র মানবসমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রচার করে চলবে।

সর্বশেষে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা অভাব-অভিযোগ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করৰে ও মানব কল্যাণের জন্যে সততঃ কাজ করে যাবে। বিশ্বরাষ্ট্রের প্রয়োজন অনেকেই আজ উপলব্ধি করছে, অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর ক্ষমতাকে প্রগতিশীল ভাবে বৃদ্ধি করে যেতে হবে।

সূচীপত্র

এই বিশ্বরাষ্ট্রের সংরচনার মধ্যে প্রতিটি সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলই তার সার্বিক বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করবে।

প্রাউটের সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল–রচনার এই নীতি সমাজের সর্বপ্রকার সামাজিক–অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের এক ব্যাপক ও সুসংহত প্রয়াস। জনসাধারণ এই নীতি গ্রহণ করলে সমাজ সর্বপ্রকার ৰাধা–ৰন্ধনকে অতিক্রম করে ক্রমবর্ধমান গতিতে প্রগতির যথার্থ পথ ধরে এগিয়ে চলতে সক্ষম হবে। মানব–সমাজে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হবে।

(কলিকাতা, ১৯৮১)

ভাষার মূল তত্ত্ব

প্রত্যেকটি ভাষার মধ্যে পাঁচ প্রকার মৌলিক বৈশিষ্ট্য*

সূচীপত্র

* বস্তুতঃ মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল ৮টি। সম্প্রতি লেখকের 'বর্ণবিজ্ঞান' পুস্তকখানিতে পূর্ণাঙ্গ ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে এই ৫টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত আরও যে ৩টির কথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি হ'ল নিজস্ব উষ্চারণ রীতি, বাক্য সংরচনা-রীতি আর 'মানসৰোধাত্মক ধ্বনিবিজ্ঞানগত অভিব্যক্তি ও তান্মাত্রিক বোধাত্মক ধ্বনিবিজ্ঞানগত অভিব্যক্তি'।

থাকে- (১) নিজস্ব ক্রিয়া বা ধাতুরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে-যেমন ইংরাজীতে Ram is going, হিন্দীতে 'রাম জা রহা হ্যায়', সংস্কৃতে 'রামঃ গচ্ছতি'। তোমরা লক্ষ্য কর, ইংরেজীও একটা ভাষা, কেন না এর নিজস্ব ক্রিয়া রূপ রয়েছে। যেমন একটু আগেই বললুম "is going"। সংস্কৃতও একটি ভাষা কেন না এরও নিজস্ব ক্রিয়ারূপ রয়েছে- "গচ্ছতি”। আবার পাহাড়ীও একটি ভাষা কেননা এরও নিজস্ব ক্রিয়াপদ যেমন "অক্ষ দশা" বা 'অক্ষণ দশা"। এই হলো প্রথম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এর নিজস্ব ক্রিয়াপদ রয়েছে। সংস্কৃতে যেমন রয়েছে-তি, তস্, অস্তি, সি, থস্, থ ইত্যাদি।

ভাষায় দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল নিজস্ব শব্দরূপ। যেমন ইংরেজীতে Ram's sister is eating bread সংস্কৃতে 'রামস্য ভগিনী রোটিকাং খাদতি'। হিন্দীতে 'রামকী বহন রোটী খা রহী হ্যায়।' আর পাহাড়ী ভাষায় হচ্ছে 'রাম রী ভৈন রোটী খান্দী।' (পঞ্জাবীতে এটাকে একটু তির্যক ভাবে উষ্চারণ করা হয়)। এখানে লক্ষ্য কর, 'রামের জন্যে'-এই অংশটুকুর জন্যে

ইংরেজীতে Rama's ('এ্যাপষ্ট্রফী' লাগিয়ে), সংস্কৃতে হবে 'রামস্য' ('স্য' লাগিয়ে), হিন্দীতে 'রাম কী' ('কী' প্রত্যয় লাগিয়ে), পাহাড়ীতে 'রাম রী' ('রী' প্রত্যয় লাগিয়ে)। একেই বলে শব্দরূপ (Case-ending)। ভাষাগত বিচারে পাহাড়ী অবশ্যই পৃথক ভাষারূপে গণ্য হবার যোগ্য। পাহাড়ী ও হিন্দী এক নয় কারণ হিন্দী ও পাহাড়ীর পৃথক পৃথক শব্দরূপ রয়েছে।

ভাষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজস্ব সর্বনাম। যেমন ইংরেজীতে বলি He is going to Calcutta. সংস্কৃতে 'সঃ কলিকাতাং গচ্ছতি', হিন্দীতে 'বহ কলিকাতা জা রহা হ্যায়', আর পাহাড়ীতে হৰে "বৈসৈ কলকত্তা চলৌ জাসৌ"। পাহাড়ীতে "সৌ", সংস্কৃতেও "সঃ”–(এ প্রসঙ্গে) পাহাড়ীর সঙ্গে সংস্কৃতের মিল লক্ষণীয়। তাহলে প্রত্যেকটি ভাষার মধ্যে পাঁচ প্রকার মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে– (১) নিজস্ব ক্রিয়া বা ধাতুরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে–যেমন ইংরাজীতে Ram is going, হিন্দীতে 'রাম জা রহা হ্যায়', সংস্কৃতে 'রামঃ গচ্ছতি'। তোমরা লক্ষ্য কর, ইংরেজীও একটা ভাষা, কেন না এর নিজস্ব ক্রিয়া রূপ রয়েছে। যেমন একটু আগেই বললুম "is going"। সংস্কৃতও একটি ভাষা কেন না এরও নিজস্ব ক্রিয়ারূপ রয়েছে– "গচ্ছতি”। আবার পাহাড়ীও একটি ভাষা

কেননা এরও নিজস্ব ক্রিয়াপদ যেমন "অক্ষ দশা" বা 'অক্ষণ দশা"। এই হলো প্রথম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এর নিজস্ব ক্রিয়াপদ রয়েছে। সংস্কৃতে যেমন রয়েছে–তি, তস্, অস্তি, সি, থস্, থ ইত্যাদি।

ভাষায় দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল নিজস্ব শব্দরূপ। যেমন ইংরেজীতে Ram's sister is eating bread সংস্কৃতে 'রামস্য ভগিনী রোটিকাং খাদতি'। হিন্দীতে 'রামকী বহন রোটী খা রহী হ্যায়।' আর পাহাড়ী ভাষায় হচ্ছে 'রাম রী ভৈন রোটী খান্দী।' (পঞ্জাবীতে এটাকে একটু তির্যক ভাবে উষ্চারণ করা হয়)। এখানে লক্ষ্য কর, 'রামের জন্যে'–এই অংশটুকুর জন্যে ইংরেজীতে Rama's ('এ্যাপষ্ট্রফী' লাগিয়ে), সংস্কৃতে হবে 'রামস্য' ('স্য' লাগিয়ে), হিন্দীতে 'রাম কী' ('কী' প্রত্যয় লাগিয়ে), পাহাড়ীতে 'রাম রী' ('রী' প্রত্যয় লাগিয়ে)। একেই বলে শব্দরূপ (Case-ending)। ভাষাগত বিচারে পাহাড়ী অবশ্যই পৃথক ভাষারূপে গণ্য হবার যোগ্য। পাহাড়ী ও হিন্দী এক নয় কারণ হিন্দী ও পাহাড়ীর পৃথক পৃথক শব্দরূপ রয়েছে।

ভাষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজস্ব সর্বনাম। যেমন ইংরেজীতে বলি He is going to Calcutta. সংস্কৃতে 'সঃ কলিকাতাং গচ্ছতি', হিন্দীতে 'বহ কলিকাতা জা রহা হ্যায়',

আর পাহাড়ীতে হবে "বৈসৈ কলকত্তা চলৌ জাসৌ"। পাহাড়ীতে "সৌ", সংস্কৃতেও "সঃ”–(এ প্রসঙ্গে) পাহাড়ীর সঙ্গে সংস্কৃতের মিল লক্ষণীয়। তাহলে দেখছো, ইংরেজীতে সর্বনাম রয়েছে–He, সংস্কৃতে 'সঃ' হিন্দীতে 'বহ' আর পাহাড়ীতে 'সৌ' অর্থাৎ চারটি ভাষারই আপন আপন সর্বনাম রয়েছে। এইজন্যে পাহাড়ী এক স্বতন্ত্র ভাষা। এটি উপভাষা বা বোলি নয় (Dialect)। পাহাড়ী হিন্দীও নয় আবার শুধু একটা বোলীও নয়। এ প্রসঙ্গে ডোগরীও একটি স্বতন্ত্র ভাষা, একথা আমি আগেই বলেছি।

ভাষার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজস্ব শব্দ সম্ভার (it must have its own vocabulary)। কোন অতি বড় বিদ্বানও যদি এ বিষয়ে বিরোধিতা করে তোমরা দৃঢ়তার সঙ্গে তার জবাব দেবে। আমার ধারণা এ বিষয়ে ভাষা বিজ্ঞান প্রসঙ্গে যুক্তিপূর্ণ অভিমত সবাই মেনে নেবে। যার নিজস্ব শব্দ সম্ভার রয়েছে তাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতেই হবে। কোন কোন হিন্দীতে সুপণ্ডিত মানুষ হয়তো তর্ক করতে পারেন তাই উত্তরটা ভালভাবে জেনে রাখো, কেননা কিছু কিছু গোঁড়া হিন্দী সমর্থক তোমার সঙ্গে যদি হিন্দীতে তর্ক করেন তোমাকে হিন্দীতে তার জবাব তো দিতে হবে। যদি ইংরেজীতে বলো উনি তোমার সঙ্গে হয়তো ইংরেজী বিদেশী ভাষা বলে তোমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা নাও বলতে পরেন। অনেকেই তো

ইংরেজী ভাষা বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্যে এমনটিই করে থাকেন। মজার কথা হচ্ছে এই যে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের কিন্তু ইংরেজী–মাধ্যম স্কুলেই পড়তে পাঠায়। ইংরেজীতে একটি শব্দ 'Wheat' যার হিন্দী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'গেহুঁ', যার পাহাড়ীতে প্রতিশব্দ হচ্ছে 'কনক' (পঞ্জাৰীতে 'কনখ', ডোগরীতে 'কনক')। পৈশাচী প্রাকৃতে শব্দটি ছিল 'কনক' তাই থেকে কনকা, কনক, কনকাঁ শব্দ এসেছে। পৈশাচী প্রাকৃত থেকেই ডোগরী, পাহাড়ী ও পঞ্জাবী তিন ভাষারই উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ এই তিন ভাষারই জননী হচ্ছে পৈশাচী প্রাকৃত। ধর ইংরেজীতে বলা হল, Wheat is the staple food of the Punjab। কোন রাজ্যের নামের আগে the শব্দটি বসে না কিন্তু Punjab-র পূর্বে the ৰসে, এটা ইংরেজী ভাষার বিশেষত্ব। এই বাক্যটির সংস্কৃত অনুবাদ হৰে "সপ্তনদস্য মুখ্যান্নঃ গোধূমোহস্তি” অথবা “গোধূমঃ অস্তি”। সংস্কৃত 'গোধূম' শব্দের মানে 'গম' আর 'অস্তি' মানে 'আছে' বা 'হয়'। সংস্কৃতে 'হয়' মানে অস্তি আর ফারসীতে "অস্ত"। তাহলে দেখ উভয় ভাষার মধ্যে কত মিল। আবার যেমন ফারসীতে বলা হয় "হনোজ দেহলী দূর্ অস্ত্”, বা “দোস্ত্ নিস্ত্”, দুশমনে দুশমন অস্ত্” অর্থাৎ শত্রুর শত্রু হলো মিত্র। এই থেকে ফারসীতে বলা হয়ে থাকে, সে আমার বন্ধু নয়, সে আমার

শত্রু। সংস্কৃতে 'নাস্তি', ফারসীতে 'নিস্ত্' কত নিকট সম্পর্ক। ঠিক এ রকমই হচ্ছে "নেস্তনাবুদ"।

"সপ্তনদস্য মুখ্যান্নঃ গোধূম অস্তি"–এটা হলো সংস্কৃত আর এরই হিন্দী অনুবাদ হলো "গেহুঁ পঞ্জাৰ কা মুখ্য খাদ্য হ্যায়।" আর পাহাড়ীতে হবে "কনক পঞ্জাৰ নৈদী প্রধান"। কনক পঞ্জাৰ নৈদী খাস। (কেউ কেউ 'প্রধান নৈদী' না বলে 'নৈদী খাস' বলে থাকে)। তাহলে লক্ষ্য করছো ইংরেজীতে wheat, সংস্কৃতে গোধূম, হিন্দীতে গেহুঁ আর পাহাড়ীতে কনক অর্থাৎ চারটি ভাষার পৃথক পৃথক শব্দ রয়েছে। পাহাড়ীতে নিজস্ব শব্দ রয়েছে। এজন্যে পাহাড়ীকে পৃথক ভাষা বলে গণ্য করতে হবে।

ভাষার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল তার নিজস্ব সাহিত্য। সে সাহিত্য ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য হতেও পারে, লোক সাহিত্যও হতে পারে। (It must have own literature- classical or folk) এখানে ফসল কাটার সময় কর্ষকেরা যে গান গেয়ে থাকেন তা কি লক্ষ্ণৌ–এর উর্দু–ভাষায় রচিত গান? তাঁরা কোন্ ভাষায় গান গেয়ে থাকেন? হিন্দী ভাষায়?–না, তাঁরা পাহাড়ী ভাষায় রচিত গানই গেয়ে থাকেন। এটা হল লোক সাহিত্য (Folk literature) |

উপরি–উক্ত পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন স্বতন্ত্র ভাষার বৈশিষ্ট্য। এই জন্যেই বলি যে পাহাড়ী ভাষা হলো ষোল আনা ভাষা (Language)।

পাহাড়ী হিন্দী ভাষা নয়, বরং হিন্দী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভাষা। যারা 'হিন্দী' 'হিন্দী' বলে চীৎকার করে তারা আসলে জোর করে হিন্দী ভাষাটাকে চাপিয়ে দিতে চায়। যাতে তোমরা হিন্দী ভাষীদের দাসে পরিণত হও। নিজেদের দাস তৈরী করবার জন্যে নিজেদের ভাষাকে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। যেমন ইংরেজরা ভারতবাসীদের দাসত্বে পরিণত করবার জন্যে নিজেদের ভাষাকে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। একেই আমরা বলতে পারি মানসিক তথা অর্থনৈতিক শোষণ (Psychoeconomic exploitation) জিনিসটাকে ভালভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করো।

মানসিক শোষণের ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলি; ধরো কোন এক উৎকট হিন্দীপ্রেমী এসেছেন। তুমি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, তখন তো হিন্দীতেই ৰলৰে। উনিও হিন্দী বলবেন। উনি আপন মাতৃভাষাতেই বলছেন। কিন্তু তুমি তো নিজের মাতৃভাষায় কথা বলছ না। হতে পারে, তোমার মুখ দিয়ে অশুদ্ধ হিন্দী বেরিয়ে গেল, ব্যাকরণগত ভুল–ত্রুটি থেকেই যেতে পারে, শব্দ ব্যবহারও

ঠিক ঠিক হলো না। এতে তোমার মনে সর্বদাই একটা সংকোচ থেকেই যাবে! হীনম্মন্যতা (inferiority complex) থেকে যাবে। আর ওঁর মনে মহামন্যতা (superiority complex) থেকে যেতে পারে। সে ভাবতে থাকবে লোকটা কী ৰোকা! কথাগুলো ঠিক মত বলতে পারে না। কিন্তু তুমি যদি মাতৃভাষার কথা বলো তাহলে ঠিক ভাবেই বলতে পারবে। এর অর্থ হল এই যে ওঁর মনে মহামন্যতার ফলে তুমি ওঁর কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছ। এই পরিস্থিতির সুযোগ দিয়ে সে তোমাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণও করতে পারে। শোষণ করার এই সুযোগটা ওকে কিছুতেই দেওয়া উচিত নয়। এই প্রকার শোষণ দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকলে সে হয়ে যাবে রাজা আর তুমি হয়ে যাবে প্রজা। একেই বলা হয়ে থাকে মানসিক তথা অর্থনৈতিক শোষণ (psychc-economic exploitation)। অর্থাৎ প্রথম দিকটায় তোমার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তোমার মধ্যে হীনম্মন্যতা চাপিয়ে দেবে। তোমার ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে তুমি মানসিক দিক থেকে হীন হয়ে যাবে। মানসিক দুর্বলতা এসে যাৰে। সেই মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই তোমাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করতে থাকৰে। তাই যারা 'হিন্দী' 'হিন্দী' বলে চীৎকার করে তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মানসিক তথা অর্থনৈতিক শোষণের পথকে প্রশস্ত করা। আসলে এরা তোমার

বন্ধু নয়। আর এও তো সত্যি, হিন্দী ভাষারও অনেক উপভাষা রয়েছে। এক এক জেলার কথ্য ভাষা এক এক ধরনের। এরকম বহুসংখ্যক মুখের ভাষার প্রচলন রয়েছে? কিন্তু পাহাড়ী ভাষা হিন্দীর কোন উপভাষা নয়। পাহাড়ী হচ্ছে হিন্দীর থেকে স্বতন্ত্র এক ভাষা। ভাষা প্রসঙ্গে যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বললুম আশা করি তোমরা সেগুলো ভালভাবেই বুঝতে পেরেছো। তাই পাহাড়ী ভাষাভাষী লোকেরা যদি দাবী করেন যে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাহাড়ী ভাষার ব্যবহার হোক, সেটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক কিছু হবে না। কোর্ট–কাছারীতে, স্কুল–কলেজে, সরকারী–কাজে, বিমান–বন্দরে, আকাশবাণী বেতার কেন্দ্রে সর্বত্রই পাহাড়ী ভাষার ব্যবহার হওয়া উচিত।

হ্যাঁ, এখানে লেখবার জন্যে তিনটি লিপি ব্যবহার হয়ে থাকে– (১) টাংরী লিপি, যা এই অঞ্চলের প্রচলিত লিপি (২) ডোগরী লিপি, যা ডোগরী ভাষাভাষী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়; (৩) সিরমৌরী লিপি নাহান অঞ্চলে প্রচলিত। দেবনাগরী লিপি এখানকার ব্যবহার্য লিপি নয়। ওটা হল গুজরাতের লিপি। হিন্দীও গুজরাতের লিপি। এখানকার লিপির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এখানকার মাটির তলায় যেসব প্রাচীন প্রস্তর লিপি, শিলা লিপি পাৰে দেখবে সেগুলি নাগরী লিপিতে খোদিত নয়। কারণ নাগরী লিপি কোন কালেই

এখানকার ব্যবহার্য লিপি ছিল না। টাংরী লিপি কিন্নড় অঞ্চলেও চলে। তিব্বতী লিপির সঙ্গে এই লিপির কিছু কিছু মিল রয়েছে। তিব্বতের একটা পাহাড়ে লেখা রয়েছে "ওঁম্ মণিপদ্মে হুং, ওঁম্ মণিপদ্মে হুঁং।" ওই লিপিই হ'ল টাংরী লিপি। ওই লিপিকেই ব্যবহার করতে হবে। একটু আগে বলছিলুম, না–যখন স্থানীয়ভাবে ডোগরী ভাষার ব্যবহার হবে তখন ডোগরী ভাষাভাষীরা আত্মগৌরব অনুভব করবেন। তাঁরা ভাবৰে, না, আমার সৰকিছু আছে, আমি কারোর দাস নই। ভবিষ্যতে যদি কখনও কেউ উল্টো কথা বলে তোমরা তার মুখের ওপর স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিও। আজ যদিও ডোগরী লিপিতে লিখিত পুস্তক পাওয়া যাবে না, কিন্তু পুরনো প্রাচীন পুস্তকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। ডোগরী ভাষায় লিখিত তিন চারশ' বছরের প্রাচীন পুরোনো পুস্তক অবশ্যই পাওয়া যাবে। এখানেই খোঁজ করলে তা পাওয়া যাবে। এখানে কোন পুরোনো চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত জানা পণ্ডিত আছেন কী? থাকা অবশ্যই উচিত। কেননা যেখানেই রাজারা থাকতেন সেখানেই এগুলিও থাকত। যাইহোক তাঁদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখ, ভুজ্জপত্র বা তালপত্রে লিখিত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাৰে কিনা! অনুমিত হয় ভুজ্জপত্রেই পুঁথি লিখিত হত। কেননা আশে পাশে ভূর্জ বৃক্ষের সংখ্যা অধিক দেখছি। যাই হোক যে কথা বলছিলুম যে ওই সব পুরোনো পুঁথি দেবনাগরীতে লিখিত ছিল

না। এটা তো বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আসলে দেবনাগরী হচ্ছে গুজরাতী পণ্ডিতদের লিপি। অনেকেই ঠিকভাবে ইতিহাস না জানার দরুণ ভুল করে ভেবে থাকে যে দেবনাগরীই হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার আদিলিপি ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। আসলে সংস্কৃতের কোন নিজস্ব লিপি নেই। তাই নিয়ম ছিল যে, যখন সংস্কৃত লিখৰে সে তখন নিজস্ব লিপিতেই লিখতে পারে। যে দেশের যা লিপি সংস্কৃত সেই লিপিতেই লিখিত হয়। সংস্কৃত লিপি নামে কোন লিপি নেই। ৰাঙলায় বাংলা লিপিতে ও মাদ্রাজে তামিলে লিপিতে সংস্কৃত লিখিত হয়। সেখানে দেবনাগরীতে সংস্কৃত লিখিত হয় না। ইংরেজরা যখন উচ্চশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁরা ভাবলেন, যখন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতও পঠন-পাঠন হবে তখন তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে বিভিন্ন স্কুল কলেজে দেবনাগরীর মাধ্যমেই সংস্কৃত পড়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। এখানকার ভাষা পৈশাচী প্রাকৃতজাত। আর হিন্দী হচ্ছে শৌরসেনী প্রাকৃতজাত। অনেকেই এই তথ্যটা জানে না। যদি জানত তাহলে ভাষা-লিপি নিয়ে এত বিরোধ হত না। এমন কি যাঁরা শিক্ষিত ও গণ্যমান্য মানুষ তাঁরাও এসৰ জিনিস জানেন না। যদিও জানতেন তাহলে অপরকে তা শিখিয়েও দিতেন।

(কুল্লু, প্রাতঃকাল, ১।১১।৭৯)

সূচীপত্র

ভাষা–সমস্যা

অভিপ্রকাশ ও প্রতীকীকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জৈবীসত্তারই একটি স্বকীয় আন্তর প্রবণতা রয়েছে। সৃষ্টিধারার ক্রমবিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে যখন উন্নততর জীবের সৃষ্টি হল তখন থেকে সেই প্রাণীন সত্তা তাদের ভাবভঙ্গী ও শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে থাকল। সাধারণ ভাবে এই সকল আন্তর ভাবের শাব্দিক অভিপ্রকাশই হচ্ছে ভাষা। পাখীর কলকাকলিই তার ভাষা। প্রাণীতত্ত্ববিদ ও পক্ষীতত্ত্ববিদেরা এ সত্য প্রমাণ করেছেন। এমনকি ৰানরেরও নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তাদের ভাষার শব্দসংখ্যা প্রায় ৮৫০–এর মত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের ক্ষেত্রে এই শাব্দিক অভিপ্রকাশসমূহ এক সুসংহত ও নিয়মৰদ্ধ ভাষার রূপ পেল। ভাষা মানুষের অন্তরের ভাবপ্রকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম। এই ভাষা মানুষের প্রাণীন সম্পদ–যা তার প্রাণধর্ম অর্থাৎ সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

শারীর–মানসিক দিক থেকে হোক অথবা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক পৃথিবীর সব মানুষের ভাষাই এক। কেননা, ভাষার যা মূল জিনিষ অর্থাৎ অন্তর্নিহিত ভাব, তা সৰ ক্ষেত্রেই এক ও সৰ ভাষার ক্ষেত্রেই অভিন্ন। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাক্যন্ত্রের মধ্যে সংরচনাগত কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়, আর তার ফলে তাদের ভাষার মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য এসে যায়। মানুষের মনে যখন জল–পানের ইচ্ছা জাগে তখন এই ইচ্ছা টাকে সে তার বাক্যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করে। কেউ বলে 'আমি জল খাৰ' কেউ বা ৰলে 'মু জল পিৰি”। কিন্তু শাব্দিক অভিব্যক্তি যাই হোক না কেন, বিভিন্ন অভিপ্রকাশের পেছনে রয়েছে একই ভাব। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৩০০টির মত ভাষার উদ্ভব হয়েছে। সমগ্র মানুষ–জাতির সংস্কৃতি এক, যদিও দেশ–কাল–পাত্র ভেদে তার অভিপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। এই অভিব্যক্তির তারতম্যকে কখনই সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বলে না যেহেতু এই বিশ্বের সমস্ত ভাষা মূলগত ভাবে এক ও অভিন্ন। ফলে সমস্ত ভাষা সমান গুরুত্বপূর্ণ ও সমভাবে শ্রদ্ধার পাত্র। এ সৰকিছু মনে রেখেই ভাষা–সমস্যার গভীরে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। প্রাউটের মতে, **তাকেই ভাষা বলা হয়, যার মধ্যে ৮টি উপাদান বিদ্যমান:–**

সূচীপত্র

১) নিজস্ব কারক বিভক্তি;

২) নিজস্ব ক্রিয়া প্রকরণ;

৩) সর্বনাম;

৪) শব্দভাণ্ডার;

৫) নিজস্ব উচ্চারণ রীতি;

৬) লিখিত বা অলিখিত সাহিত্য ও লোকগীতি;

৭) মানসবোধাত্মক ধ্বনিবিজ্ঞানগত অভিব্যক্তি ও তান্মাত্রিক বোধাত্মক ধ্বনি বিজ্ঞানগত অভিব্যক্তি;

৮) বাক্যসংরচনা রীতি;

এগুলির মধ্যে যদি 'উচ্চারণ রীতি' বা 'লিখিত বা অলিখিত সাহিত্য' বা অন্য কোন একটি কম থাকে তাহলে তাই উপভাষা অথবা খণ্ড উপভাষা হিসেবে পরিগণিত হবে। এই পৃথিবীতে এইরূপ অজস্র উপভাষা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ভোজপুরী ভাষার রয়েছে ৩টি উপভাষা, ওড়িয়া ভাষায় ২টি, ও ছত্রিশগড়ী ভাষায় আছে ৩টি উপভাষা। ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রায় সব ভাষারই জন্ম **প্রাকৃত-সংস্কৃত** থেকে। প্রাকৃত মানে জনগণ-সম্পর্কিত। কালক্রমে প্রাকৃত সংস্কৃত বিবর্তিত হয়ে ৯টি ভাষায় ও নানান্ উপভাষায় বিভক্ত হয়ে যায়। যার থেকেই বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব। সেই ৭টি ভাষা হচ্ছে:-

(১) পূর্ব–ভারতের মাগধী প্রাকৃত–যা থেকে এসেছে বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া, অঙ্গিকা, ভোজপুরী, মগহী, নাগপুরিয়া, (সাদানী), ছত্রিশগড়ী ইত্যাদি; (২) মধ্য ও উত্তর ভারতে শৌরসেনী প্রাকৃত যা থেকে এসেছে–অবধি, বুন্দেলখণ্ডী, বাঘেলখণ্ডী, (৩) উত্তর পশ্চিম ভারতের পৈশাচী প্রাকৃত–পঞ্জাবী, ডোগরী, পাহাড়ী ইত্যাদি; (৪) প্রত্যন্ত উত্তর–পশ্চিম ভারতের পাশ্চাত্য প্রাকৃত, এর থেকে এসেছে পস্তু ও কশ্মীরী ভাষা; (৫) সিন্ধু ব–দ্বীপের সৈন্ধবী প্রাকৃত, যার থেকে এসেছে সিন্ধী ও বালুচী; (৬) মধ্য–পশ্চিম ভারতের মালৰী প্রাকৃত–যার থেকে জন্ম হয়েছে গুজরাটী, সৌরাষ্ট্রী প্রভৃতি; (৭) দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত–যেমন মারাঠী।

উল্লিখিত প্রতিটি ভাষাতেই ৮টি উপাদান রয়েছে। সুতরাং প্রতিটিই ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। শুধু তাই নয়, এই ভাষাগুলির প্রত্যেকেই হাজার বছরেরও বেশী পুরোনো। বিহার ও উত্তর প্রদেশেই অনেক ভাষাকে ভুল করে হিন্দীর উপভাষা হিসেবে বলা হয়ে থাকে। এ ধরণের ব্যাখ্যা কেবল ভুলই নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিতও বটে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার এ এক প্রচেষ্টা মাত্র। যথাযথ ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অঙ্গিকা, মগহী, ভোজপুরী, মৈথিলী, নাগপুরী, অবধি ও ব্রজভাষা

প্রভৃতির তুলনায় হিন্দী সত্যিকারের কোন ভাষাই নয়। এর কারণটা কী? না-হিন্দী মাত্র প্রায় ১০০ বছরের পুরোণো। ব্রিটিশ শাসক তাদের রাজত্বকালে দিল্লীর আশে পাশে প্রচলিত কয়েকটি ভাষা ও উপভাষাকে মিলিয়ে এই হিন্দী ভাষার সৃষ্টি করে। ভাষার উপরিউক্ত ৮টি উপাদানের মধ্যে লোক-সাহিত্য বা লোকগীতি হিন্দীতে নেই। কিন্তু অঙ্গিকা, ভোজপুরী, প্রভৃতির প্রত্যেকটিতে লোকসাহিত্য তো আছেই, অন্যান্য ৭টি উপাদান থাকায় এগুলি পুরোমাত্রায় ভাষা। সত্যি কথা বলতে কি-হিন্দী কারও মাতৃভাষাও নয়। মাতৃভাষা বলতে কী বোঝায়? মাতৃভাষা হচ্ছে সেই ভাষা যাতে খোলামেলা পরিবেশে আমরা সহজে স্বচ্ছল ভাবে ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে আমাদের ভাৰ ব্যক্ত করতে পারি, যেমন ভাবে আমরা আমাদের মায়ের মত অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভাব বিনিময় করি। উদাহরণ স্বরূপ, পূর্ণিয়া জেলার একজন মানুষ তার নিকটতম বন্ধুর সঙ্গে অঙ্গিকা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাতে কথা বলৰে না।

এখন দেখা যাক্ ভাষার সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রগতির ও সাংস্কৃতিক বিকাশের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কিনা। আমি আগেই বলেছি ভাষা যেহেতু অন্তর্নিহিত ভাব ও চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম সেহেতু তা মানুষের প্রাণধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিজস্ব মাতৃভাষায় একজন যেমন

স্বচ্ছন্দ্যে ও সাবলীল ভাবে নিজের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে তেমনটি অন্য কোন ভাষায় পারে না। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে সে অসুবিধা বোধ করে। প্রতিনিয়তই যদি অন্য ভাষায় কথা বলিয়ে এরূপ অস্বচ্ছন্দ বোধ করতে তাকে বাধ্য করানো হয় তৰে তার প্রাণশক্তি অবশ্যই ক্ষাতগ্রস্ত হবে–ক্রমশঃ প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। এই রকম পরিস্থিতিতে সেই ব্যষ্টি বা ব্যষ্টি সমূহের মধ্যে এক মনস্তাত্বিক সংকট দেখা দেবে। প্রথমেই তার মধ্যে দেখা দেৰে এক ধরণের হীনম্মন্যতা ৰোধ–যা মানুষের মানসিক দুর্বলতার কারণ। যাদের ভাষা অবদমিত হবে তাদের নৈতিক সাহস, উদ্যম ও প্রতিবাদ করার শক্তি হারিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটা পরাজিতের মনোভাব জাগৰে–যা কোন জনগোষ্ঠীর প্রাণ–স্পন্দনকে অচিরেই স্তব্ধ করে দেবে।

সুতরাং ভাষার অবদমন মানুষের মনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ধরণের ক্রমাগত অবদমনের ফলে জনগণ কখনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না ও তাদের অকালে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে। এ বিষয়ে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, ভাষার ক্ষেত্রে অবদমিত এই জনগোষ্ঠী মানস–অর্থনৈতিক শোষণের চাপে পড়ে সব সময় আর্থিক দিক থেকে পেছিয়ে থাকৰে। এটা অত্যন্ত দুঃখের

বিষয় যে ভারতবর্ষ সমেত সমস্ত পৃথিবীতে এই ট্র্যাজেডীটাই ঘটে চলেছে।

'সমাজ' কথাটির অর্থ হ'ল, সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে চলা– 'সমানম্ এজতি'।মানুষের উচিত যারা পেছনে পড়ে আছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে চলার সর্বতোভাবে প্রয়াস করা। এটাই সমাজের বৈশিষ্ট্য। তাই প্রাউট সুষ্পষ্ট ভাবে ৰলে যে, প্রত্যেক প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত ভাষাকেই সমান স্বীকৃতি, সুযোগ ও অধিকার দিতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, এই স্বীকৃতি কেবল প্রথাগতভাবে ও পঠন–পাঠনে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, এ হতে হৰে বৈবহারিক অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের সকল কর্মে এর স্বীকৃতি দিতে হবে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে–অফিস, আদালত, রেলওয়ে, বিমানবন্দর, ব্যবসা–বাণিজ্য ও সরকারী–বেসরকারী সমস্ত কাজে প্রকাশের মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা। শিক্ষা–সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাতে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়। মোটের ওপর বৈবহারিক ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষ ধরণের বা প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে–সে সরকারী হোক বা বে–সরকারী হোক সে সৰ ক্ষেত্রে শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সে রকম পরিস্থিতিতে এক সর্বজন–গ্রাহ্য ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। সমাজের

অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এটা মনে রাখা উচিত যে, সৰ ভাষাকে সমান সুযোগ প্রদান ও প্রয়োজন অনুযায়ী যোগাযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেৰে কোন জাতীয় ভাষা বা বিশ্বভাষা প্রসারের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়। অবশ্য, সমস্ত জিনিষটাই নির্ভর করছে, মানুষের সদিচ্ছা ও শুভবুদ্ধির ওপর। বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক দেশই বহুভাষিক। কিন্তু সেখানকার কাজকর্ম খুৰ ভাল ভাবেই চলছে। উদাহরণ স্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের কথা বলা যেতে পারে। এলাহাবাদের কোন মানুষ যদি কলকাতায় বাস করতে আসেন, তিনি ঘোষকের ঘোষণা, নামফলক, প্রচার, বিজ্ঞপ্তি ফলক, দোকানের সাইনবোর্ড, ক্যাশমেমো, হোটেলের মেনু, অফিসের কাগজপত্র সৰকিছুতেই যদি কেবল বাংলা ভাষাই দেখেন, তবে তার প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হৰে। কিন্তু তাকে ভাবতে হবে, তিনি যদি কার্যোপলক্ষ্যে ফরাসী দেশের কথাও পৌঁছোন তবে তাকে এই পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে তিনি যদি মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতায় অল্প সময়ে স্থানীয় ভাষা শিখে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে সেই ভাষার প্রতি–সেখানকার সবকিছুর প্রতি তাঁর একটা শ্রদ্ধা ভাব ও ভালবাসা জেগে উঠৰে। এই ভাবে চিন্তা ও অনুভূতির যথার্থ আদান–প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য

দ্রুততর বেড়ে উঠবে–তা ভাবের ক্ষেত্রে যেমন–তেমনই সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশের ক্ষেত্রেও।

তাই এই পরিস্থিতিতে ভাষার মত জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সরকারের পক্ষে তাড়াহুড়ো করতে যাওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে ভারতের মত একটা দেশে যেখানে নানান ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান, সেখানে যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই তাড়াহুড়ো করে কোন কিছু করতে গেলে তা হবে মুর্খতারই নামান্তর। প্রত্যেক ভাষাকে আবশ্যিক ভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে ও প্রত্যেক ভাষাকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। দেখতে হৰে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে যাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে তা যেন অন্য ভাষাকে অবদমন না করে। ভারতের মত ৰহুভাষিক দেশে এমন একটা সর্বজন স্বীকৃত ভাষাকে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা উচিত–যা সমস্ত ভাষারই ভিত্তি। যেমন, সংস্কৃত, অথবা, এমন একটা যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষাকে ব্যবহার করা উচিত–যা কোন একটি বিশেষ ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না বা অন্য ভাষাগুলিকে অবদমিত করবে না। কালক্রমে বিভিন্ন ভাষার বিকাশের মধ্য দিয়ে একটা জাতীয় ভাষা বেরিয়ে আসৰে–যাকে সহজে সকলেই মেনে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই অবস্থা এসে পৌঁছুচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মাতৃভাষাগুলির

যথার্থ প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির সাথে সাথে ইংরেজীকেই যোগাযোগ- রক্ষাকারী ভাষা হিসেৰ মেনে নেওয়া উচিত।

আমাদের ভুললে চলবে না যে, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিভিন্ন বাস্তব কারণের জন্যে আজকে ইংরেজী শুধু ইংলণ্ডেরই ভাষা নয়, তা আজ বিশ্ব-ভাষা হয়ে উঠছে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই আজকে এই ভাষার প্রতি সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্য কোন ভাষা যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেৰে মর্যাদা অর্জন করতে পারে। কিন্তু আজ ইংরেজীকেই যোগাযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেৰে গ্রহণ করতে হবে।

ভাষা-নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ধরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে মেনে না নিয়ে যদি কেউ জোর করে বিশেষ কোন ভাষাকে অন্য ভাষার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তবে তা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও উত্তাপকে বাড়িয়ে দেশকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দেবে। এই আত্মঘাতী নীতি উগ্রভাষান্ধতাকে আরও উস্কে দেৰে-যা সমাজের সুস্থ পরিবেশকে কলুষিত করে দেবে।

তাই ভাষা-সমস্যার সমাধানের যথার্থ নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হলে চাই দূরদৃষ্টি, সহনশীলতা, বাস্তবজ্ঞান, বিশ্বপ্রেম, যথার্থ আদর্শ, আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতা আর

এগুলিকে পাথেয় করে নিয়ে চললে শুধু ভাষা সমস্যা কেন আমাদের ঝঞ্ঝা–বিক্ষুব্ধ জীবনের যে কোন কঠিনতম সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যাবে ও আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব বিজয়গৌরবের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

(কলিকাতা, ১৯৮১)

সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলন

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধাভোগী বা স্বচ্ছল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক বিচারে অনগ্রসর অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে নির্দয়ভাবে শোষণ করছে, তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এই নিপীড়ন ও শোষণের অবসান ঘটাতে শোষিত জনগণের হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে ক'রে তারা দ্রুততর পদবিক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে পারে ও সমস্ত প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। এই ধরণের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কারণ, এই আন্দোলন প্রকৃত মানবতাভিত্তিক আন্দোলন। এই পথ গ্রহণ না করাটাই অস্বাভাবিক ও মানবতাবিরোধী। বস্তুতঃ এ ধরণের আন্দোলনের বিরোধিতা করা মানে হল শোষকশ্রেণী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থরক্ষা করা।

জাতি–বর্ণ–ধর্মমত নির্বিশেষে শোষিত জনগণের অনুকূলে প্রাউট সব সময় সমস্ত প্রকারেরই শোষণের বিরোধিতা করে ও করবে। কিন্তু আজ যেহেতু পৃথিবীতে দারিদ্র্যই প্রধানতঃ সমস্যা, তাই প্রাউট অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই অগ্রাধিকার দেয়।

দারিদ্র্য ও সেই সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক–অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্যে আজ বিশ্বজুড়ে শোষণ–বিরোধী গণ আন্দোলন শুরু করা উচিত। এইরূপ আন্দোলন সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও মানস–অর্থনৈতিক শোষণেরই বিরোধিতা করবে। এর সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সর্বাত্মক কল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে উপযুক্ত বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

শোষণের অবসান কল্পে ও ন্যায়ভিত্তিক জনকল্যাণমূলক সমাজ সংরচনার জন্যে নিম্নলিখিত ছ'টি বিষয়ের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে:

(১) স্থানীয় জনসাধারণের সার্বিক কর্মসংস্থান; (২) সার্বিক শিল্পবিকাশ; (৩) বর্হিপণ্যের আমদানি এড়িয়ে চলা; (৪) স্থানীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ; (৫) যোগাযোগের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার; (৬) স্থানীয় সামাজিক অর্থনৈতিক দাবী।

১। স্থানীয় জনসাধারণের সার্বিক কর্মসংস্থান।

প্রথমেই কোন এলাকায় স্থানীয় জনসাধারণের শতকরা একশ' ভাগের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সমস্ত মানুষের ন্যূনতম চাহিদা অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, আবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হওয়া উচিত। জনগণের ১০০ শতাংশের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমেই তাদের এই মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, দান–খয়রাতির মাধ্যমে নয়। আজকের দুনিয়ায় বেকারত্ব এক জটিল সমস্যা। আর স্থানীয় মানুষের ১০০ শতাংশের কর্মসংস্থানের নীতিই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

স্থানীয় মানুষ তাদেরই বলৰ যারা তাদের ব্যষ্টিগত সামাজিক–অর্থনৈতিক স্বার্থকে যে সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে তারা রয়েছে ওই অঞ্চলের স্বার্থের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রাথমিক বিচার্য বিষয় হ'ল, তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থকে ওই সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্বার্থের সঙ্গে

মিশিয়ে দিয়েছে কি না, তাদের জাতি–বর্ণ–ধর্মমত–মাতৃভাষা–জন্মস্থান যাই হোক না কেন সেটা এখানে বিচার্য নয়। যারা একটা বিশেষ সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে অর্থ রোজগার করে' অন্য এক সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে ব্যয় করে, তাদেরই বহিরাগত বা অ–স্থানীয় (non- local) মানুষ বলে গণ্য করা উচিত। কারণ, তাদের এই কাজকর্ম যে সামাজিক–অর্থনৈতিক এলাকায় তারা কর্মরত তার স্বার্থানুকূল হচ্ছে না। এতে ওই বিশেষ এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশোপযোগী মূলধনের বহিঃস্রোত ঘটছে ও এর ফলে ওই এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পুঁজিপতিরা ব্যষ্টিগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে আজ মারাত্মক অর্থনৈতিক শোষকে পরিণত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে তারা অবিরাম স্থানীয় অর্থনীতিকে শোষণ করেছে ও অর্থের বহিঃস্রোত ঘটাচ্ছে। প্রায় সর্বক্ষেত্রে যে মুনাফা তারা অর্জন করে তা তারা স্থানীয় এলাকার বাইরে ব্যয় করে ও বাইরের স্টকহোল্ডার বা মূল কোম্পানীতে প্রেরণ করে। এই অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করতে বিশ্বের প্রতিটি দেশে এ জাতীয় ফাটকা কারবার অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়াই হল সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

স্থানীয় জনসাধারণের শতকরা একশ' ভাগের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রাউট স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী

পরিকল্পনায় বিশ্বাসী। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় ন্যূনতম চাহিদার ভিত্তিতে অবিলম্বে শ্রম–নিবিড়–শিল্প (labour-intensive industry) গড়ে তোলা উচিত। যেখানে সে ধরণের শিল্প রয়েছে সেগুলিকে আরও উৎপাদনক্ষম করে' গড়ে তোলা উচিত। এই সৱ শিল্প অবশ্যই হওয়া উচিত ভোগভিত্তিক (consump- tion motive) এই জাতীয় শিল্পকে দেওয়া উচিত যুক্তিসঙ্গত মুনাফা অর্জনের সুযোগ। যাতে করে ওই সব শিল্পে নিয়োজিত কর্মীরা ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তথা তাদের অস্থিত্ব ও বিকাশ সুনিশ্চিত করতে পারে। যেমন উত্তর বিহারে যেখানে কোন শিল্পই নেই বলা চলে, সেখানকার বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্যে ওই এলাকায় সব রকমের কৃষি–ভিত্তিক শিল্প (agro-industry) ও কৃষি–সহায়ক শিল্পের (agrico- industry) বিকাশ ঘটানো উচিত।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় মূলধন–নিবিড়–শিল্পের (Capital intensive indus- try) বিকাশ ঘটানো উচিত।

ওই সামাজিক–অর্থনৈতিক এলাকার উৎপাদন–ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে এটা প্রয়োজন। প্রাউটের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ত্রি–স্তরীয়: (১) ক্ষুদ্র শিল্প–যা ব্যষ্টি মালিকানায় পরিচালিত হবে, (২) মাঝারি শিল্প–এগুলি পরিচালিত হৰে সমবায় পদ্ধতিতে ও (৩) বৃহৎ মূল শিল্প–যেগুলি স্থানীয় সরকার

কর্তৃক পরিচালিত হবে। এই ধরণের অর্থনৈতিক সংরচনার ভিত্তি হবে–স্বনির্ভরতা, সর্বাধিক উপযোগ, যুক্তিপূর্ণ বণ্টন, বিকেন্দ্রীকরণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ও প্রগতিশীলভাবে সর্বসাধারণের জীবনের মানবৃদ্ধি। ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি, নূতন নূতন পণ্য উৎপাদন ও সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে নূতন নূতন প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতির প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করা যায়। দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গরূপে পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে দৈনিক কাজের সময়ও প্রগতিশীলভাবে হ্রাস করা যেতে পারে।

বেকার সমস্যা সমাধানে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমের ব্যাপারটাও ভালভাৱ বুঝতে হবে। যেমন, ভারতবর্ষের উত্তর বিহারে, যেখানকার অর্থনীতি পুরোপুরি কৃষি নির্ভর, সেখানে কায়িক শ্রম উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। আবার কলকাতাতে উদ্বৃত্ত হয় বৌদ্ধিক শ্রম। উভয় স্থানেই বেকারের সংখ্যা অত্যধিক। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই যেখানে বেকারত্ব খুৱ ৰেশি সেই সব অঞ্চলে কায়িক শ্রম উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। তাই ওই সৱ স্থানে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে শ্রম–নিবিড় শিল্প (labour-intensive industry) গড়া উচিত। কোন বিকাশশীল শিল্পে যখন শ্রম ঘাটতি দেখা দেয় তখন শ্রমিকদের বিশেষ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করিয়ে ওই কর্মে নিয়োগ করা যেতে পারে।

বিশেষ করে গ্রামের মানুষদের বেকারত্ব–মোচনের আর একটি উপায় হ'ল তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্যে উদ্ভিদ জগতের উপযোগ গ্রহণ করা। সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলেই সেখানকার ভূ–প্রকৃতি, মাটি ও আবহাওয়া অনুসারে নানান্ ধরণের গাছপালা ও ফসল–বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। নোতুন নোতুন গাছপালা লাগিয়ে শুষ্ক ও অর্ধ শুষ্ক অঞ্চলকে উর্বর করা যেতে পারে। ফার্ণ বা 'পুন্নাগিকা'র মত অনেক গাছ আছে যেগুলির মেঘকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই সৰ গাছপালার সাহায্যে কোন এলাকার বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। বিভিন্ন গাছ–গাছড়ার উৎপাদন–ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্পবিকাশের মাধ্যমে নোতুন নোতুন পণ্য উৎপাদন গ্রামীণ বেকার–সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নেৰে। এইভাবে গাছপালার যথার্থ ব্যবহারের বৈপ্লবিক কর্মসূচী বহুমুখী সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেবে–যা প্রকৃতপক্ষে নব্যমানবতাবাদেরই অন্যতম বৈবহারিক প্রকাশ।

২। সর্বাধিক শিল্প-বিকাশ:

প্রাউটের দ্বিতীয় বক্তব্য হ'ল স্থানীয় এলাকায় কাঁচা মালের সহজ প্রাপ্যতা ও ওই এলাকার মানুষদের ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজন অনুসারে সর্বাধিক শিল্প-বিকাশ প্রয়োজন। এই নীতি বহিরাগতদের হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের হাতে তুলে দেৰে। এই ভাবে ওই সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের সম্ভাবনার প্রভূত বিকাশ সম্ভব হবে। প্রাউটের অর্থনীতি অনুসারে কৃষির মত অধিকাংশ শিল্পই উৎপাদক সমবায় ও উপভোক্তা সমবায়ের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এর ফলে এক নূতন ধরণের সামবায়িক চেতনা বা সামবায়িক শক্তির সৃষ্টি হবে। এতে পুঁজিপতিদের হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে চলে আসৰে যারা ওই শিল্পে কায়িক বা বৌদ্ধিক শ্রমে রত রয়েছে। এতে শিল্পের সর্বাধিক বিকাশ সুনিশ্চিত হবে।

এই নীতি থেকে অনেকগুলি অনুসিদ্ধান্ত এসে যায়। প্রথমতঃ শিল্পগুলি যে সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত তার বাইরে থেকে কাঁচামাল না এনে স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার করা উচিত। কাঁচামালই হ'ল শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের মৌলিক উপাদান বা সম্পদ। যেমন, রাবার শিল্পের জন্যে রাবার চাষের প্রয়োজন, রাবার গাছের রস হ'ল

এই শিল্পের কাঁচামাল, যদি স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি রাবার চাষের অনুকূল হয়, তাহলে এই কাঁচামালকে কেন্দ্র করে ওই স্থানে রাবার শিল্প গড়া যেতে পারে। অথবা এর বিকল্প কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেলে সিন্থেটিক টায়ার শিল্পও গড়া যেতে পারে।

কোন শিল্পগুলিতে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা উচিত-তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ সব অঞ্চলের সমান সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নেই। উদ্ভিজ্জাত কাঁচামালের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল স্বাভাবিক ভাবেই ভিন্ন ভিন্ন কাঁচামাল উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল।

যে সব শিল্প স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তা সস্তায় পণ্য উৎপাদন করতে পারে। তাছাড়া কাঁচামালের উৎসের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার জন্যে ওই শিল্প সব সময়ই কাঁচামালের যোগান পাৰে। এতে এগুলি সহজে স্ব-নির্ভর হয়ে উঠবে। যেখানে বাইরের থেকে কাঁচামাল আনতে হয় সেখানে ওই সব সুবিধা নেই। দ্বিতীয়তঃ কাঁচামালের উৎপাদকেরা, বিশেষ করে উৎপাদক সমবায়গুলি হাতের কাছে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের তৈরী ৰাজার পাওয়ায় বিশেষভাবে লাভবান হয়। তৃতীয়তঃ, শিল্পগুলি হাতের কাছে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

পাওয়ায় এগুলির নিরাপত্তারও নিশ্চিততা আসে ও ভালভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয়।

চতুর্থতঃ অনেক বড় বড় পুঁজিপতি স্থানীয় কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্পবিকাশে বাধা প্রদান করে' ওই এলাকার অর্থনীতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। তারা স্থানীয় কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্প–পণ্য ওই অঞ্চলের বাজারে বিক্রয় করে' ওখানকার জনসাধারণের ওপর শোষণ চালায়। যেমন অস্ট্রেলিয়া জাপান থেকে এমন বহু শিল্প–উৎপাদিত পণ্য আমদানি করে যে সমস্ত শিল্পজাত পণ্যের কাঁচামাল অস্ট্রেলিয়াতেই রয়েছে। স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে শিল্প বিকাশকে উৎসাহিত করলে স্থানীয় বাজারের ওপর পুঁজিপতিদের ব্যষ্টিগত বা গোষ্ঠীগত আধিপত্যের অবসান হবে। এতে ওই এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মূলধনের বহিঃস্রোতও বন্ধ হয়ে যাবে।

আলোচ্য নীতিটির দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত হ'ল, স্থানীয় কাঁচামাল রপ্তানী মোটেই উচিত নয়, রপ্তানী করা উচিত কেবল শিল্পজাত পণ্য। স্থানীয় কাঁচামালের দাম রপ্তানী বাজারে দারুণ ওঠানামা করে। কারণ স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতি বা ফাটকা কারবারীরা অবাধ মুনাফা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ওই সব কাঁচামালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই

অসাধুতা দূর করতে বিশ্বে যতদূর সম্ভব অবাধ বাণিজ্য-নীতি চালু করা উচিত। অপরপক্ষে সাধারণতঃ কাঁচামালের মূল্যমান অপেক্ষা শিল্পজাত পণ্যের মূল্যমান নিয়ন্ত্রণে সুযোগ কম থাকে। স্থানীয় ভাবে উৎপাদন পরিচালিত হওয়ায় ওই সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল তার সংরক্ষিত বিত্তকোষ রক্ষা করতে পারে। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত হ'ল, স্থানীয় এলাকায় কোন শিল্পজাত পণ্য-উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সম্ভাবনা না থাকলে তবে ওই শিল্পজাত পণ্যকে বাইরে থেকে আমদানি করতে দেওয়া যেতে পারে। বাইরে থেকে শিল্পজাত পণ্য আমদানি করা মানেই স্থানীয় মূলধন অন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া। মূলধনের বহিঃস্রোত সব সময়ই কোন সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই অপ্রয়োজনীয় আমদানিকে সর্বদা নিরুৎসাহ করা উচিত। বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ৰাণিজ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক পণ্য বিনিময় পদ্ধতিই (Barter system) উৎকৃষ্ট। কারণ এই পদ্ধতিতে কোন পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষ করে যে সব সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের খুব কম সংখ্যক বিক্রয়যোগ্য পণ্য রয়েছে, কিন্তু তাকে নানান ধরণের পণ্য আমদানি করতে হবে, আর তাদের বিক্রয়যোগ্য পণ্য সংখ্যায় কম হলেও

পরিমাণে খুব বেশী, সেই সব অঞ্চলের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য-বিণিময়-চুক্তি খুবই উপযোগী।

এইভাবে যেখানে স্থানীয় কাঁচামালের সরবরাহের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, সেই এলাকায় স্থানীয় চাহিদা-পূরণের জন্যে শিল্পগড়তে হবে, সম্ভব হলে উদ্বৃত্ত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীও করা যাবে। কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা স্থানীয় শিল্পগুলিকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে পারবে।

৩। বহির্পণ্যের আমদানি এড়িয়ে চলা

প্রাউটের তৃতীয় বক্তব্য হ'ল, যে সমস্ত পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যেতে পারে সেগুলো বাইরে থেকে আমদানি করা উচিত নয়। এর অর্থ হ'ল, স্থানীয় জনসাধারণের উচিত স্থানীয় শিল্পজাত পণ্য ক্রয় করে ওই শিল্পকে সহায়তা করা। **এমনকি প্রথম অবস্থায় অন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য অপেক্ষা স্থানীয় শিল্পজাত পণ্য অপেক্ষাকৃত কম গুণমান সম্পন্ন হলেও তা ক্রয় করা উচিত।** তাহলে ওই শিল্পের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হৰে। স্থানীয় জনসাধারণের ক্রমাগত সহায়তার ফলে এমন একদিন আসৰে যখন ওই শিল্প অপেক্ষাকৃত অধিক গুণমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু জনগণ

যদি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানস–অর্থনৈতিক শোষণের বলি হয়ে স্থানীয় পণ্য অপেক্ষা অন্য সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের পণ্য ক্রয়ে বেশী আগ্রহী হয়, তবে স্থানীয় শিল্পগুলি পরিস্থিতির চাপে পড়ে বন্ধ হয়ে যাবে। পরিণতিতে দেখা দেৰে ৰেকার সমস্যা সহ নানান ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। সুতরাং যতদূর সম্ভব জনগণ যাতে বাইরের শিল্পজাত পণ্য অপেক্ষা স্থানীয় পণ্য ক্রয়ে অধিক আগ্রহী হয় তার জন্যে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে ব্যাপক গণ–অন্দোলন এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষে লবণ তৈরীর যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এদেশে বাইরের থেকে লবণ আমদানি করা হত। তখন ভারতীয় নেতৃবর্গ অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটেনের তৈরী লবণ বর্জন ও দেশী লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। এই আন্দোলনে বিপুল জনসমর্থন অর্জন করে ও ব্রিটিশ শোষণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলে। এই আন্দোলনের ফলে একান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য–লবণের মূল্যও হ্রাস পায় ও স্থানীয় লবণ শিল্প গড়ে ওঠায় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এইভাবে এতদিন যে অর্থ এদেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ব্রিটেনের লবণ উৎপাদকদের ভাণ্ডারে জমা হত সেই অর্থের বহিঃস্রোত ৰন্ধ হ'ল। তাছাড়া

এতে ব্রিটিশ-বিরোধী আর ব্রিটিশ-সমর্থক-দু'টো শিবির সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৪। স্থানীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ

প্রাউটের চতুর্থ বক্তব্য হ'ল, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত স্থানীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা উচিত। মানুষের সামূহিক অভিব্যক্তিকে বলে সংস্কৃতি। ভাষা হ'ল সংস্কৃতির প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম। সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর উচিত প্রতিটি ভাষাকেই উৎসাহ দান করা। তাহলেও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আত্মমর্যাদা-ৰোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্যে প্রত্যেক সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থানীয় ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিটি অঞ্চলের আপন আপন ধনাত্মক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে উৎসাহদান স্থানীয় এলাকার সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এছাড়া জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি-ৰোধ জাগ্রত করে তোলবার পক্ষে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

স্থানীয় ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হ'ল স্থানীয় ভাষার প্রতি অবদমন। এর ফলে স্থানীয় সংস্কৃতিও অবদমিত হয়। পরিণতিতে ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় নৈতিক অবক্ষয়, হীনম্মন্যতা

ৰোধ ও পরাজিত সুলভ মনোভাব। যদি কোন জনগোষ্ঠীর 'সেন্টিমেন্টাল লিগাসি'র (সাংবেদনিক উত্তরাধিকার) ওপর আঘাত হানা হয়, তাতে ওই জনগোষ্ঠী সহজেই কায়েমী স্বার্থবাদীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানস-অথনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে পড়ে। এই সাংস্কৃতিক অবদমনেরই কৌশল অবলম্বন করেছিল ব্রিটিশ, ফরাসী, ডাচ্, স্পেনীয়, মার্কিন ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি, তবে স্থানীয় জনসাধারণ যদি নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি পরিপূর্ণভাবে সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সমস্ত হীনম্মন্যতা-ৰোধ থেকেও তারা মুক্ত হতে পারবে।

প্রাথমিক থেকে উষ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদান করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর স্থানীয় জনসাধারণ তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ও এইভাবে শোষকশ্রেণী কর্তৃক শিক্ষার মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া অসংস্কৃতি, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে তারা মুক্ত হতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ও ছত্রিশগড়ে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহিরাগতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যারা এসবের মধ্যে বহু ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা দিয়ে থাকে। অনেক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এই একই ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়।

৫। যোগাযোগের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেৰে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার।

প্রাউটের পঞ্চম বক্তব্য হ'ল, কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা ও অফিসগুলিতে স্থানীয় ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বে মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি ও মাদ্রাজে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মসূচী কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগসাজসে দেশীয় পুঁজিপতিরা স্থানীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে' তাতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে বাইরে থেকে শ্রমিক ও ম্যানেজার নিয়ে আসত। এদিকে স্থানীয় জনসাধারণের ওপর ইংরেজী ভাষাও জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক আধিপত্য সুনিশ্চিত করতে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় করণিককে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়।

৬। স্থানীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক দাবী:

প্রাউটের সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন সর্বশেষে গুরুত্ব দিচ্ছে, স্থানীয় আঞ্চলিক দাবীগুলির ওপর। সর্বত্র স্থানীয় পরিস্থিতি সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে ও স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানী, আয়ার্ল্যাণ্ড ও কোরিয়ার সামাজিক-

অর্থনৈতিক গোষ্ঠীসমূহের ক্ষেত্রে বিভক্ত নেশানগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার দাবীই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। অন্যান্য সামাজিক-অর্থনৈতিক এলাকায় স্থানীয় মানুষেরা নোতুন নোতুন শিল্প-বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাঁচামাল পরিবহনের সুবিধার্থে সেতু ও রাস্তাঘাট নির্মাণের দাবী করতে পারে। আবার, কৃষিনির্ভর অঞ্চলগুলিতে বছরে আরও বেশীবার ফসল ফলানের জন্যে প্রয়োজনীয় সেচের জল পেতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আশু প্রয়োজন হতে পারে। এইভাবে প্রাউটের সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের এই পঞ্চম বিষয়টিতে স্থানীয় এলাকার সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত দাবীগুলিই এসে যাচ্ছে।

কলিকাতা, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৪

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান বিশ্বে মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ একান্তভাবে অস্থির ও বিপর্যস্ত। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে

সূচীপত্র

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে মানব-সমাজের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিভীষিকা হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের প্রচার কায়েমী স্বার্থবাদী মানুষের ঘৃণ্য চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়। কোন সমস্যার সমাধানই মানুষের সাধ্যাতীত নয়। অন্যান্য সমস্যার মতই তথাকথিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যারও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান করা যেতে পারে।

বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারাপথে জন্ম-মৃত্যু নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টি-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। পরিবারে কোন শিশুর জন্ম হলে স্বাভাবিকভাবেই তার মাতাপিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আনন্দোচ্ছ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন কিছু লোক আছেন (এরা বেশীর ভাগই সরকার বা রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত) যাঁরা জন্মহার বৃদ্ধিকে সমাজের একটা অভিশাপ বলে গণ্য করেন। এই ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী মানব সমাজের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক অগৌরবের ব্যাপার-বিশেষ করে যে মানবজাতি আজ প্রভূত বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী।

জনসংখ্যা-সমস্যা কি সত্যিই প্রকৃত সমস্যা। সমস্যাটিকে দু'টি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবেঃ (১) খাদ্য-সামগ্রীর যোগান (availability of food) ও (২) ব্যবহার যোগ্য ভূমির পরিমাণ (availability of space)। আজকের

মানুষের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ করার বহুবিধ পথ খোলা রয়েছে। আজকের পৃথিবীর যে মোট জনসংখ্যা তার চেয়েও বহু গুণ বেশী মানুষকে যোগান দেওয়ার মত খাদ্য সামগ্রী এই পৃথিবীতে রয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র মৈত্রী–পূর্ণ সহযোগিতা, সামূহিক প্রয়াস, যথার্থ আদর্শ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে মানব–সমাজ নানান বিবদমান গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে ৰহুধা–বিভক্ত হয়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধনী–দরিদ্র দেশের। মনুষ্য–সৃষ্ট এই ভেদ–ভাবের জন্যে মানুষ আজ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য–উৎপাদনে অপারগ হয়ে পড়েছে। দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে যদিও এই পৃথিবীতে সমস্ত মানুষকেই সরবরাহ করার মত পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে, তবুও বর্তমান সামাজিক–অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যেই তা সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

তাছাড়া, যদি এই পৃথিবীর সমগ্র ভূমিখণ্ডকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়, তাহলে স্থানাভাব থাকতেই পারে না। যেহেতু পৃথিবীটা আজ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নানান ধরণের রাজনৈতিক বিধিনিষেধের খেয়ালখুশীমত প্রয়োগে তথা নানান্ ক্ষতিকর ভাবজড়তার ব্যাপক অশুভ প্রভাবের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত, তাই মানুষ স্বাভাবিকভাবে তার সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারছে না। কিন্তু যদি প্রকৃতিদত্ত সমস্ত ধন–সম্পদের সর্বাধিক উপযোগ

গ্রহণ ও যুক্তিসঙ্গত বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে আজকের জ্বলন্ত সামাজিক–অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান সহজেই হতে পারত।

প্রকৃতির এমনি বিধান যে, একটা শিশুর জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। ঠিক তেমনি অকৃপণা প্রকৃতি মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর ব্যবস্থা করেই রেখেছেন। মানুষের যা উচিত তা হচ্ছে এই প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা। খাদ্যের ঘাটতি বা জমির অসংকুলান কোনটার জন্যেই প্রকৃতিকে দোষ দেওয়া যায় না। এ সমস্ত সমস্যা মানুষের স্বকৃত ভুলেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে ও এই কারণে অনেকেই ভীত হয়ে পড়েছেন। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে এরূপ ভীত হওয়ার সঙ্গত কারণও আছে। এই জনসংখ্যা দ্রুত ৰাড়ার অর্থই হচ্ছে জনসাধারণের দারিদ্র্যও সমানহারে বাড়তে থাকা। সামূহিক অর্থনীতি–ব্যবস্থায় কিন্তু এরূপ ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। এই পৃথিবীর মানুষের খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাব দেখা দিলে মানুষ পতিত জমিগুলিকে কর্ষণযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত করবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলৰে ও মাটি–জল–

বায়ু থেকে রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করে নেবে। আর এই পৃথিবী যখন তার উৎপাদন–ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবে, তখন ভূমির অন্বেষণে মানুষ অন্য গ্রহে–উপগ্রহে পাড়ি দেবে ও সেখানে বসবাস শুরু করবে।

যারা পুঁজিবাদী দেশে বাস করে তারা যদি অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা পাবার জন্যে স্বেচ্ছায় জন্ম–নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়; তাহলে সেখানে তার বিরুদ্ধে হয়তো বলবার কিছু নেই, কিন্তু এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে পুরুষ বা নারীর দৈহিক বিকৃতি ঘটানো হয় ও তাদের সন্তান–উৎপাদনের ক্ষমতা চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তাকে সমর্থন করা যায় না। কেননা, সেক্ষেত্রে যে কোন মুহূর্তে তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিকূল মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

বর্তমান সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা–সমস্যা–সমাধানে প্রাউটের এক সুষ্ঠু, সুস্পষ্ট ও সর্বাত্মক পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাউটের মতে নিম্নলিখিত ৪টি ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে আসবে:

প্রথমতঃ, সমাজে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ থাকা দরকার, যাতে করে জনগণ পুষ্টিকর খাদ্য পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, স্কান্ডিনেবিয়ার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেশ উঁচু। তাদের

জীবনযাত্রার মানও বেশ উঁচু। তাই সেখানে তাদের অতিরিক্ত জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকে যেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। মানুষ যদি সুস্থ দেহমনের অধিকারী হয়, তাহলে তাদের দেহের গ্রন্থিগুলিও সাম্যাবস্থায় থাকে। স্বভাবতই তখন তারা তাদের দৈহিক শক্তিকে, মানসিক শক্তিতে ও মানসিক শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। আধ্যাত্মিক দিকে মনকে চালিত করার এই প্রয়াসের মধ্য দিয়েই মনের স্থূল প্রবৃত্তিকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণ যেন অযথা মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাকে। মানুষ ক্রমাগত মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকলে সেই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে সে পরিত্রাণ পাবার জন্যে স্বভাবতই স্থূল ভোগ সুখে মগ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই দুশ্চিন্তা সরে যায় তখন মানুষ মনের প্রশান্ত অবস্থায় সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণে সমর্থ হয়। চতুর্থতঃ, মানুষের বৌদ্ধিক মানকে উন্নত করতে হবে। ৰৌদ্ধিক অগ্রগতি ঘটতে থাকলে মানুষ তার সর্বাত্মক মানসিক সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে শুরু করবে, সঙ্গে সঙ্গে সে সহজে তার মানসাধ্যাত্মিক সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারবে। নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারবে ও নিজের ব্যষ্টি সত্তাকে ভূমা–সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবে।

সুতরাং জনসংখ্যা–সমস্যা কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয় এর পরিধির মধ্যে এসে যাচ্ছে অথনৈতিক, জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ৰৌদ্ধিক দিক।

আজকাল মানুষ অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জৈব–মানসিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলির চেয়ে রাজনৈতিক দিকটির ওপরই বেশী গুরুত্ব দেয়। জনসংখ্যা সৰ সময় 'গুণোত্তর' হারে geometric rate) বৃদ্ধি পায় ও খাদ্যোৎপাদন 'সমান্তর' হারে (arithmetic rate) বৃদ্ধি পায়–এ তত্ব একেবারে ক্রুটিপূর্ণ! এটা কেবল অসন্তুলিত অর্থনীতি–ব্যবস্থার (imbalanced economic system) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। প্রগতিশীল সুসন্তুলিত অর্থনীতি–ব্যবস্থায় (progressive and balanced economic system) এ ধরণের সমস্যা থাকবে না।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সামুহিক অর্থনৈতিক সংরচনার ওপর প্রভাব ফেলবে–এ ধরণের প্রচারও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বর্তমানে পুঁজিপতি শ্রেণী জন্ম–নিয়ন্ত্রণ–পদ্ধতির প্রচারের মধ্য দিয়ে জনসংখ্যা–বৃদ্ধি রোধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর। **সামূহিক অর্থনৈতিক সংরচনায় জন্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করার কোন**

প্রয়োজন পড়বে না, বরং বর্দ্ধিত জনসংখ্যা প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে সাহায্য করবে।

প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিজ্জগৎ-উভয় ক্ষেত্রেই উন্নত প্রজাতির উদ্ভূতির জন্যে ভাল জাতের বীজ, উর্বর ভূমি, পর্যাপ্ত খাদ্য-আলো-হাওয়া-জল অপরিহার্য। এ বিচারে অন্যান্য প্রাণীর সত্তার সঙ্গে মানুষের কোন ভেদ নেই। তাই মানবসমাজের ক্ষেত্রেও উন্নত প্রজন্ম তৈরী করতে গেলে উপযুক্ত পুরুষ ও নারী নির্বাচন কাম্য। যতদিন পর্যন্ত না বৈজ্ঞানিক বেষণাগারে মানবশিশু সৃষ্টি হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত যদি এদিকে নজর দেওয়া না হয় তবে তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। সমাজের পক্ষে এটা কল্যাণকর হবে যদি উন্নত বুদ্ধি ও মেধা-সম্পন্ন মানুষেরা অধিক সন্তানের জন্ম দেন। এই সৰ শিশুদের লালন-পালনের দায়িত্ব সমাজ বা সরকারকে নিতে হবে। অপরপক্ষে যদি উনমানস, স্বভাবগতভাবে অকর্মা ও উন্মাদ লোকেরা অধিক সন্তানের জন্ম দেয় তবে তা সমাজের পক্ষে হৰে ক্ষতিকারক। তাই কোনরকম প্রতিক্রিয়া ছাড়াই যদি তাদের প্রজনন-ক্ষমতা স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়, তবে সমাজ তাতে লাভবানই হৰে!

বিজ্ঞান আজ এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যে তা এক নূতন যুগের সূচনা করতে পারে। বিশ্বের খাদ্য-সমস্যার সমাধানের

জন্যে বিজ্ঞান বটিকার (tablet) আকারে কৃত্রিম খাদ্য তৈরী করতে পারে। এখন একটিমাত্র খাদ্য–বটিকা সারাদিনের কর্মক্ষমতা যোগাতে সক্ষম হতে পারে। সুতরাং জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের অধিক সময় ও শক্তি সূক্ষ্ম মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্মে ব্যয়িত করবে। সুতরাং তাদের দৈহিক খাদ্যের চাহিদা হ্রাস পাৰে।

গবেষণার দ্বারা মানুষ আজ সমুদ্রের তলদেশে প্রচুর খাদ্যসম্ভার আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা ওই সব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য–সমস্যার সমাধান করতে পারি। আজ সমাজে যে ধরণের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ এই বিশ্বের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদসমূহের সর্বাধিক উপযোগ ও যুক্তিসঙ্গত বণ্টনে উৎসাহী নয়। আজকের বিজ্ঞান জনকল্যাণমূলক ও রচনাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়ে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সর্বাধিক উৎপাদন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যে সমাজে এমন এক সামুহিক অর্থনৈতিক সংরচনার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা সর্বপ্রকার আধিভৌতিক (mundane), আধিদৈবিক

(supra-mundane) ও আধ্যাত্মিক সম্পদের সর্বাধিক উপযোগকে সুনিশ্চিত করবে, সঞ্চয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে ও সামুহিক সম্পদের যুক্তিসঙ্গত বন্টন করবে। এর জন্যে প্রয়োজন দৃঢ়নিৰদ্ধ সামবায়িক ব্যবস্থা ও বিকেন্দ্রিত সামাজিক- অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

এখন পর্যন্ত মানুষ সেই ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেনি বলেই খাদ্যসমস্যার সমাধানে সক্ষম হতে পারেনি। পরিবর্তে তারা জনগণের মধ্যে অমানবিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে চাপিয়ে দিয়েছে যা মানুষের শরীর ও মন উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতি মানুষের শারীরিক বিকৃতি ঘটায়, পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে, মানসিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ও মানসিক দুর্বলতা এনে দেয়। এ ধরণের মানুষেরা সামাজিক ন্যায়-বিচারের জন্যে সংগ্রাম করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলে প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝবার সাহস।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির আতঙ্ক আর কিছুই নয়-এ কেবলমাত্র কায়েমী স্বার্থবাদীদের পক্ষ থেকে জনগণকে বিভ্রান্ত ও শোষণ করবার এক ধূর্ত ষড়যন্ত্র। বিশ্ববাসীদের আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে ও ন্যায়-বিচার

ভিত্তিক জনকল্যাণমূলক সমাজ গড়বার জন্যে সমৰেতভাবে কাজ করতে হবে।

কলিকাতা, ১৯৮১

নারী-অধিকার

নারী ও পুরুষ-উভয়েই একই পরম পিতার সন্তান। উভয়েই যেহেতু পরম পিতার সন্তান; জীবনের অভিব্যক্তি ও স্বাধিকারের ক্ষেত্রে উভয়েরই সমান অধিকার। অস্তিত্ব মানে কেবল বেঁচে থাকাই নয়। পশুরাও তো বেঁচে থাকে! কিন্তু আমাদের কাছে জীবনের তাৎপর্য অনেক-অনেক বেশী।

আমাদের কাছে জীবন হ'ল একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জীবনধারণ। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সমস্ত সম্ভাবনা বিকাশের যে স্বাধীনতা তা অর্জনের প্রয়াসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের তাৎপর্য। কেবল ভালমন্দ কোন কিছু করার ছাড়পত্রকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলে না।

মানব–ইতিহাসে আমরা দেখেছি, নারীরা কেবল নারীত্বকে গৌরবান্বিত করেনি, সমস্ত মানবজাতিকে গৌরবান্বিত করেছে। দর্শনে, আধ্যাত্মিকতায়, সমাজ–সংস্কারে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে–কোথাও নারীরা পুরুষের চেয়ে পেছিয়ে নেই। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সমাধানই হোক বা সামাজিক–শিক্ষানৈতিক সংস্কারই হোক সৰক্ষেত্রেই মেয়েরা পুরুষের মতই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। বিপদে আপদে পুরুষকে প্রেরণা জোগাতেও নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পুরুষের মতই নারীর মধ্যেও প্রভূত সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও দেহ সংরচনাগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য সম–মৈত্রী–ভিত্তিক সহযোগিতাকেই (co-ordinated co-operation) প্রশস্ত করে, উভয়ের মধ্যে প্রভু–ভৃত্য–সম্পর্ক–সুলভ সহযোগিতা (sub-ordinated co-operation) মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

কিন্তু ইতিহাসের ধারা প্রবাহে আমরা দেখেছি, সারা পৃথিবী জুড়ে নারীদের ওপর শোষণের মর্মান্তিক চিত্র। শোষণের এই দুরভিসন্ধি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যুগে যুগে নানান ভাবজড়তা (dogma) আর এগুলোর সাহায্যেই চালিয়ে যাওয়া হয়েছে মানস–অর্থনৈতিক শোষণ (psycho-economic exploitation)। এই সৰ ভাবজড়তাকে সুকৌশলে জনপ্রিয় করে'

তুলে ও নারীদের মনেও অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাদের দাসত্বের নিগড়ে আৰদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের অনেক কিছু প্রতীক প্রকৃতপক্ষে দাসত্বের প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু নয়। পৃথিবীর বহু ধর্মমতেই নারী–পুরোহিতও স্বীকৃত নয়।

নারীদের ওপর শোষণ সর্বত্রই কমবেশী একই প্রকার। এটা কি সত্য নয় যে অনেক দেশে এমনকি বোটাধিকারের ক্ষেত্রেও নারী–পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত ছিল না?

আজও পুরুষ–শাসিত সমাজ–ব্যবস্থায় নারীর স্থান প্রায় দাসীর মতই, এটা কেবল মন্দই নয়, এটা নিন্দনীয়ও। নারীদের ওপর এ ধরণের অবদমন ও ভাব–জড়তার সাহায্যে তাদের ওপর এ ধরণের মানস–অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো উচিত। এই ভাবজড়তার বিলোপের জন্যে ও মানসিক শোষণের কৰল থেকে নারী ও নারীত্বকে মুক্ত করতে যা চাই তা হ'ল: (১) বিশ্বের সমস্ত দেশে সমস্ত নারীর জন্যে অবৈতনিক শিক্ষা; (২) সামাজিক, শিক্ষাগত ও ধর্মমতের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান; (৩) সমস্ত নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

আমরা, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চাই এক বলিষ্ঠ, গতিশীল ও বৈপ্লবিক সমাজ–চেতনা। নারীরা

নবপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সর্বপ্রকার দাসত্বের প্রতীক ও ভাবজড়তাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠে পড়ে লেগে যাক্। আমরা চাই, নারীরা সম–মৈত্রীভিত্তিক সহযোগিতার নূতন যুগের সূচনা করুক। আজকের নারী–জাতি হোক নূতন বিপ্লবের অগ্রদূত। গৌবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে মানবতার এই অভ্যুত্থান অত্যাবশ্যক।

কলিকাতা এপ্রিল, ১৯৮১

অর্থনীতিতে গতিতত্ত্ব

এই মহাবিশ্বে চলমানতা মাত্রই সঙ্কোচ–বিকাশী। জগতের কোন কিছুই সরলরেখা ধ'রে চলে না। সঙ্কোচ–বিকাশী গতিধারার জন্যেই প্রতিটি সত্তায় আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও সমিতি সংঘটিত হয়ে চলেছে। এই সঙ্কোচ–বিকাশী নীতির ফলেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্বে (অধ্যায়ে/যুগে) ঘটে চলেছে উত্থান ও পতন। গতিধারার সঙ্কোচন বা বিরতির স্তরটা যদি বেশী দীর্ঘায়িত হয় তবে

সমাজকেও প্রলম্বিত এক গতিহীনতার স্তর অতিক্রম করে এগোতে হয়। এ ক্ষেত্রে এমনও ঘটতে পারে যে সমাজ তার গতিশীলতা একেবারেই খুইয়ে ফেলেছে বা তার মৃত্যু ঘটেছে। বিরতির স্তরে যদি সমাজের আভ্যন্তরে গতিশক্তির অভাব ঘটে তবে পরবর্তী স্তরে তার স্বাভাবিক গতিধারা ক্রিয়াশীল নাও হয়ে উঠতে পারে। আর যদি তার বিরতির স্তরটি হয় দীর্ঘতর ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর তবে পরবর্তী গতির স্তরে সমাজের বাহ্যিক অভিব্যক্তিগুলিও হবে দীর্ঘকালব্যাপী ও শক্তিপূর্ণ।

তাদের অন্তর্নিহিত জড়তা–নিৰন্ধন (গতিহীনতা–নিৰন্ধন) ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর বুক থেকে আজ ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদ মুছে যেতে বসেছে। ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিমণ্ডলে সাধারণ দ্রুতি থাকলেও তার এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষও ক্রিয়াশীল রয়েছে। ধনতন্ত্রের এই সংঘর্ষটা উৎপন্ন হচ্ছে আয়কেন্দ্রিক এক মুনাফা লোভী মনস্তত্ত্ব থেকে ও ধনের সঞ্চয় থেকে যা সকলের স্বার্থে না হয়ে অল্প কিছু জনের স্বার্থে করা হয়। তাই মানব প্রগতির সার্বভৌমিক বিকাশের জন্যে ধনতন্ত্র এক অনুকূল দর্শন নয়। এমন একদিন অবশ্যই আসছে যখন পুঁজিবাদ আতসবাজির মতই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

মাক্সবাদও হল এক পরিবর্ত্তনশীল অপসৃয়মান/বিলীয়মান) তত্ত্ব। এই তত্ত্বের বাহ্যিক পরিমণ্ডলে সাধারণ দ্রুতি থাকলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রয়ে গেছে জড়তা। তার পরিণামস্বরূপ মার্ক্সবাদে ঘটছে ঋণাত্মক গতিশীলতা (negative dynamicity)। তাই মার্ক্সবাদও কখনও সফল হতে পারবে না। মার্ক্সবাদ যেন এক ধূমকেতুর মত যা ছুটে চলেছে প্যারাবলিক পথের ধারা অনুসরণ করে; মার্ক্সবাদের পথ কখনই হাইপ্যারাবলিক পথের ধারাশ্রয়ী হতে পারবে না। মার্ক্সবাদ সমাজকে এক সর্বগ্রাসী গতিহীনতার স্তরে নিয়ে যেতে পারে মাত্র। সে গতিহীন স্তরে নিহিলিজম বা সিনিসিজমের জন্ম হয়–নেতিবাচক এক জীবন ৰোধ সৃষ্ট হয়।

অর্থনৈতিক মন্দা গতিহীনতারই ফলশ্রুতি

সমাজতান্ত্রিক দেশ বা পুঁজিবাদী দেশ–উভয় রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক পরিভূতে মন্দা আসতে বাধ্য কারণ উভয় দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে এক গভীর জড়তা। এই যে মন্দা এটা আসলে সমাজের বুকে শোষণ বা দমন–প্রদমন– অবদমনেরই ফলশ্রুতি। শোষণ যখন চরম বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায়, সমাজের গতিশীলতা ও গতিবেগও

তখন প্রায় শূন্যাঙ্কে পৌঁছে যায়। এমন পরিস্থিতিতে, শোষণের সেই চরমাবস্থায় সমাজের বুকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। ভৌতিক জগতের ক্ষেত্রে এই বিস্ফোরণটা হয় জড়াত্মক, আর মানসিক অধিক্ষেত্রে বিস্ফোরণটা হয় মানসিক বা ভাবাত্মক। এ ভাবেই অবস্থাভেদে বিস্ফোরণগুলি ঘটে চলে। এই অর্থনৈতিক মন্দা যে কোন যুগেই (শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বিপ্র বা বৈশ্য) সংঘটিত হতে পারে।

এমন কি সমাজের সংস্কৃতি জীবনেও কিন্তু দমন–প্রদমন–অবদমনের ফলে একই ধরণের মন্দা দেখা দিতে পারে। ফলস্বরূপ, মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন বিকৃত হয়ে উঠতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, এমন একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা–উপধারাগুলিতেও বিকৃতি এসে পড়ে। সে কারণে আমরা দেখতে পাই বাজারে বিকৃত সাহিত্যের ভীড়, বিকৃত গান–নাচের রমরমা। এমন কি চিত্রাঙ্কণ ও বাস্তুবিদ্যাতেও এসে যায় এই বিকারের কালছায়া।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক–উভয় ক্ষেত্রেই মন্দা হয়ে ওঠে অসহনীয়। এমনই ধরণের ভয়াবহ মন্দা একবার সংঘটিত হয়েছিল ১৯২৯ ও ১৯৩১ সালে। মন্দার সেই দুর্দিনে বর্দ্ধমানের বাজারে ১ পয়সাতে ৫ সের বেগুন অথবা ৪ পয়সায় ১ মণ বেগুন পাওয়া যেত। কিন্তু তা হলে হবে কী,

তাতেও কিনবার লোক পাওয়া যেত না। সেই দুর্দিনে চাকুরি জীবিদের বেতনের পরিমাণ ১০% কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ও সেই অনুযায়ী কম বেতনই সকলকে গ্রহণ করতে হত। অতীতের এই সব মন্দা ও ভবিষ্যতের অনাগত মন্দার মধ্যে কিন্তু থাকবে এক মূলগত তফাৎ। পূর্বে সংঘটিত মন্দাগুলির সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি যুক্ত ছিল সামান্য হারে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে সব মন্দা ঘটতে যাচ্ছে তাতে মুদ্রাস্ফীতি হবে তীব্রতর। তাই এ মন্দা মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে হবে আরও অনেক বেশী ক্ষতিকারক।

আজ এমনই মন্দার এক ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ঘটবার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তার বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে আগামী ২, ৩ বা ৫ বছরের মধ্যে। তবে আগামী ১০ বছরের মধ্যে তো তা' অবশ্যই ঘটবে।

এ মন্দা ঘটবে বাণিজ্যিক অর্থনীতির শিল্পগত-উপ-কাঠামোয়। আর তার ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে গোটা মানব সমাজে। তাই, এই মন্দার সময়কালটা যাতে কমিয়ে আনা যায় তার প্রয়াস চালান আজ অত্যাবশ্যক। মন্দার চরম সেই বিপর্যয় দেখা দেবার পূর্বেই, তাকে চেষ্টা করলে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, সেই সঙ্গে সমাজের গতিতেও দ্রুতি আনা সম্ভব। প্রাউটের মাধ্যমে গোটা সমাজের

বুকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এক স্পন্দন উত্থিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। সমাজের সংকোচ-বিকাশী ধারায় তরঙ্গের অবোহ স্তরে অথবা বিকাশাত্মক বিরতির পরেই এই স্পন্দনটা তৈরী করতে হবে। আজ যেহেতু পৃথিবী এক ঘোর সঙ্কটাবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে তাই আমাদের আজ আরও বেশী পরিমাণে চেষ্টাশীল হয়ে এ ধরণের স্পন্দন সমাজের বুকে গড়ে তুলতে হবে। যদি আমাদের এই স্পন্দনের সৃষ্টি আর সমাজের আসন্ন বিস্ফোরণ-দুটোই একই সময়ে হয় তবে তার ফল হবে আরও ভাল।

এ কথাটা সকলের মনে রাখা দরকার যে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা দুটোই হল সমাজের গতিহীন অসুস্থ এক অবস্থার প্রতিফল। ধরা যাক, কোন এক দেশে উৎপাদন হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে ও সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তার সঞ্চিত স্বর্ণ মুদ্রার এক আনুপাতিক ভারসাম্যও বজায় রয়েছে। সে অবস্থায় দেশটিতে মুদ্রা-স্ফীতি ঘটবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু দেশের অর্থনীতিতে যদি গতিশীলতার অভাব ঘটে তবে টাকা বা মূলধনের চক্রগতিও হ্রাস পায়। ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণও সে দেশে কমে যায়। সেই পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে বাধ্য। যদি কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি চলতেই থাকে, তবে সে দেশেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এছাড়া, দেশের

বৈদেশিক বাণিজ্য যদি দেওয়া–নেওয়ার (barter system) ভিত্তিতে না করা হয়, আর সে দেশকে যদি প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য আমদানী করতে হয়, একই সঙ্গে তাকে বহির্দেশে কাঁচামালও রপ্তানি করে যেতে হয়, তবে সে দেশে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দেবে। অন্য দিকে, যে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ হয় পর্যাপ্ত, যথেষ্ট সরবরাহের ব্যবস্থাও থাকে, কিন্তু হঠাৎ করে সে দেশে যদি চাহিদার পরিমাণ অতি মাত্রায় হ্রাস পায়, তা হলে সে দেশের ক্রেতাদের মুদ্রা মূল্যের হার বৃদ্ধি পায়। এ ধরণের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ৰলে ঋণাত্মক মুদ্রাস্ফীতি (negative inflation) বা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস (deflation)।

মন্দার মূল কারণগুলি

অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেবার কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমটি হল, সম্পদের অতি সঞ্চয় বা অতিকেন্দ্রীকরণ, আর দ্বিতীয় কারণ হল টাকার চক্রগতিতে ৰাধা সৃষ্টি করা। মূলধন যদি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যষ্টি বা রাষ্ট্রের হাতে সঞ্চিত হয়, তবে জনগণের বৃহদাংশ অল্প কিছু ব্যষ্টির দ্বারা শোষিত হতে থাকে। এ ধরণের তীব্র শোষণের ধারায়, দেখা দেয় এক বিস্ফোরণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিস্ফোরণকে বলা হয় মন্দা

(depression)। ধনের কেন্দ্রিকরণ, আরও ভাল ভাবে বলতে গেলে মূল্যগত বিচারে ধনের কেন্দ্রীকরণই হল মন্দার মূল ও প্রধান কারণ।

মন্দার দ্বিতীয় কারণটি হল, ব্যষ্টি বা রাষ্ট্রের হাতে ধনের অতি সঞ্চয়। তারা মূলধন আটকে রেখে দেয় এই কারণে যে তাঁরা ভাবে তাঁদের টাকা যদি স্বাধীন ভাবে বাজারে খাটতে দেওয়া হয় তবে হয়তো সাধারণ মানুষের জন্যে কিছু স্বস্তি আসৰে ঠিকই কিন্তু তাদের নিজেদের মুনাফার পরিমাণটা যাবে কমে। পুঁজিপতিদের মনস্তত্বটা হল, টাকা খাটিয়ে যত বেশী সম্ভব মুনাফা তুলে নেওয়া। যখন তারা বুঝতে পারে, টাকা খাটিয়ে এখন আর মুনাফা করা সম্ভব হবে না, তখন তারা নিজেদের সঞ্চিত টাকা বাজারে ছাড়া বন্ধ করে দেয়। ফলে, নানাভাবে মূলধনকে তারা অচল স্থিতিতে রুদ্ধ করে ফেলে, ফলে বিনিয়োগও সে পরিস্থিতিতে ৰন্ধ হয়ে পড়ে। উৎপাদন আর বাড়তে পারে না, আয়ও বাড়ে না। তার ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় অস্বাভাবিক হারে। এ ভাবে পরিস্থিতি এত বেশী ঘোরাল হয়ে ওঠে যে তখন ৰাজারে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে খুব কম ক্রেতাকেই পাওয়া যায়। যদি কোথাও উৎপাদনে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত শ্রম থাকে সেখানে মন্দার প্রভাব তীব্র হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে বিহার,

অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও উড়িষ্যা উদ্বৃত্ত শ্রম এলাকা। ফলে এইসব জায়গায়, মন্দার সময়ে বেশীর ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। যখন উদ্বৃত্ত শ্রম এলাকায় মজুরীর হার কমতে থাকে তখন শ্রমিকরা কর্মের সন্ধানে ঘাটতি শ্রম এলাকায় ধাওয়া করে, যা সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এইভাবেই উদ্বৃত্ত শ্রম এলাকায় বেকার সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এমত অবস্থায় একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্য দ্রব্য স্থানান্তরিত করার ওপর ৰাধা দিলে ওই অঞ্চলে দারুণ অভাব দেখা দেয়, তার ফলে ঘাটতি এলাকায় কোন নির্দিষ্ট বিধি নিষেধ আরোপ করা উচিত নয়। ফলে দেশে মন্দার সময় যেখানে উদ্বৃত্ত ফসল হয় এমন অঞ্চল ও ঘাটতি শ্রম এলাকা অপেক্ষাকৃত কম অসুবিধা ভোগ করবে।

অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব

অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে ধনতান্ত্রিক দেশ, কম্যুনিষ্ট দেশ ও তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্য কেউহ রেহাই পাৰে না। ভারতবর্ষ শিল্পে উন্নত কয়েকটি দেশে বা তাদের অনুসারী কয়েকটি দেশে কাঁচামাল রপ্তানি করে। যদিও অতীতে একসময় ভারতবর্ষ তুলো রপ্তানি

করতো কিন্তু বর্তমানে বাইরে কিছু দেশ থেকে তুলো বা তুলোর মত কিছু কাঁচামাল আমদানি করে, ফলে ভারতবর্ষ আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সমস্ত দেশের ওপর নির্ভর করে সেখানে মন্দার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া বাইরের দেশের কাছে ভারতবর্ষের এমন কিছু ঋণ আছে যা মন্দার সময় ভারতীয় অর্থনীতিকে কোণঠাসা করে তুলবে। তাই মন্দার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে ভারতও রেহাই পাবে না। যদি অর্থনৈতিক বাণিজ্যের পরিবর্তে পণ্য বিনিময় ৰাণিজ্যের অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দার প্রভাব অনেকটা কম হবে। সুতরাং ভারতের উচিত পণ্যবিনিময় বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করা।

বাঙলাদেশ শিল্পজাত দ্রব্য কাঁচাপাট, পশুচামড়া রপ্তানি করে ও খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানি করে। যদি বাঙলাদেশ এই মন্দার হাত থেকে বাঁচতে চায় তবে পণ্য বিনিময় ৰাণিজ্য বৃদ্ধি করা ছাড়া তাদের কোন বিকল্প পথ নেই।

কালক্রমে আরবের মত দেশ, যারা কেবল তেল বিক্রি করে, মন্দার প্রভাব তাদের ওপর সব থেকে বেশী পড়বে। এমনকি কম্যুনিষ্ট দেশগুলিও মন্দার তীব্র আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না। এই দেশগুলি নিজেদের খাদ্যসমস্যা সমাধান

করতে পারে না, তাদের পুঞ্জীভূত ধনের পাহাড় থাকা সত্ত্বেও তাদের গমের জন্য নির্ভর করতে হয় কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ওপর। যদি ডলার ভিত্তিক দেশগুলির ওপর মন্দা নেমে আসে তবে তার প্রভাব তীব্র না হলেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও মন্দার প্রভাব পড়বে।

মন্দা জিনিসটা কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। সাময়িক বিরতি হল প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রাউট–অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাময়িক বিরতি আসতে পারে কিন্তু মন্দা কখনও আসবে না। মন্দার হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে প্রাউট উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়ে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে বাড়িয়ে, ধনবৈষম্যকে কমিয়ে, অর্থের চলমানতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর জোর দেয়। অন্তঃসারশূন্য শ্লোগানে কিছুই হয় না। উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করতে হবে।

ধনতান্ত্রিক ও কম্যুনিষ্ট দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। ধনতান্ত্রিক দেশে পরিচালক মণ্ডলীর স্বার্থে শ্রমিকরা ভালো কাজ করে না। পরিচালকমণ্ডলীও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার জন্যে অর্থকে সচল রাখতে চায় না। কম্যুনিষ্ট দেশে শ্রমিকরা কোন কাজই নিজের বলে ভাবে না। তার ফলে সেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা মন্থর হয়ে ওঠে। প্রাউটের সমবায়িক উৎপাদন ব্যবস্থা উভয়বিধ ত্রুটি থেকে মুক্ত।

সূচীপত্র

প্রাউট মানুষের আদর্শ ও সেন্টিমেন্টের সুস্থ সমন্বয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক–অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের সার্বিক বিকাশ ও অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ পরিপন্থী।

বিত্তকোষস্ফীতি (Bullion Inflation)

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের জন্যে মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন পরিচালিত হয়, বিশেষ কোন ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারে মুনাফা নিয়ে গিয়ে জমা হয়। সমাজতান্ত্রিক বা কম্যুনিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুনাফার ছিটেফোঁটা অংশ ছাড়া সবটাই গিয়ে জমা পড়ে রাষ্ট্র–ভাণ্ডারে। প্রকৃত উৎপাদকরা পায় মুনাফার অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ। উভয়ক্ষেত্রে **ধনবাদের** অস্তিত্ব বিরাজমান। ফলে যখনই নোতুন বিনিয়োগ করা হয় তখনই দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি।

প্রাউটের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভোগের জন্যেই উৎপাদন পরিচালিত হবে। সেখানে মুনাফার কোন উদ্দেশ্য না থাকায় নোতুন মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। উপস্থিত মুদ্রাস্ফীতি–ও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। প্রাউটের ভোগ বা উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থের মূল্য প্রথম পর্যায়ে অপরিবর্তিত থাকায় জনগণের হাতে পূর্ণ ক্রয়–ক্ষমতার নিশ্চিততা থাকবে। দ্বিতীয়

পর্যায়ে সংশোধিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তখন অর্থ তা প্রকৃত বাজার মূল্য ফিরে পাবে। পরিশেষে ভোগের পর অর্থ তার প্রকৃত মূল্য ফিরে পাৰে। ফলে **মুদ্রাস্ফীতিকে** নিয়ন্ত্রণ করে জনগণকে জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ পূর্ণক্রয়ক্ষমতার নিশ্চিততা দান করা সম্ভব হবে। **দ্বিতীয় পর্যায় মূলতঃ দশ থেকে পনের বছর চলবে। এ**ই সময় কালের পর আসবে তৃতীয় পর্যায় যেখানে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বৃদ্ধি পাৰে ও মানুষ ফিরে পাবে অধিক ক্রময় ক্ষমতা। এই জাতীয় ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকবে।

কাগজের নোট ক্রমাগত ছাপিয়ে বাজারে ছাড়লে বিত্তকোষ, মূল্য বৃদ্ধি পায় না। কারণ এর তেমন কোন বিত্তকোষ মূল্যই নেই। সুতরাং এখনই এসব বন্ধ করা উচিত ও নোতুন করে নোট ছাপিয়ে তার মূল্যমান নির্দ্ধারণ করে বাজারে ছাড়া উচিত। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা রাষ্ট্রভাণ্ডারে না রেখে কোন সরকারেরই কাগজের নোট ছাপিয়ে ৰাজারে ছাড়া উচিত নয়। এটা একমাত্র প্রাউট প্রবর্তিত সরকারের দ্বারাই বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

উৎপাদন-স্ফীতি:

উৎপাদন-স্ফীতি সমস্যাকেও উপেক্ষা করা যায় না। প্রধানতঃ দুটি ব্যবস্থাতে উৎপাদন স্ফীতি ঘটতে পারে। প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবাধ প্রয়োগের ফলে অঞ্চল বিশেষে কোন কোন দ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদিত হয়। তখন ওই অধিক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিপণন ব্যবস্থায় একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কিছু পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটলে তার জন্যে উপযুক্ত ৰাজার পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে।

এখন একটা প্রশ্ন উঠছে, এ ধরণের উৎপাদন-স্ফীতির দ্বারা কি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে অথবা তাদের জীবন-ধারণের মান কি উন্নত হতে পারে? সাধারণ পরিস্থিতিতে এ ধরণের উৎপাদন-স্ফীতি কোন বড় ধরণের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না; কিন্তু সেই ৰাড়তি উৎপাদনকে বিক্রী করার বাজার যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে কিন্তু এই অতি-উৎপাদন একটা জটিল সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। তিন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা অবশ্য এ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি। প্রথমতঃ আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করা, ফলে এক দেশের উদ্বৃত্ত উৎপাদন অন্য দেশগুলিতে ব্যবহৃত হতে পারবে। একই ব্যবস্থা চালু হতে পারে বিভিন্ন অর্থনৈতিক

অঞ্চলগুলির মধ্যেও। ভারতে পঞ্জাব ও হরিয়ানা ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদনের ঘাটতি রয়ে গেছে। অন্যসব রাজ্যের সাধারণ জনগণ এই ঘাটতির ফলে যথেষ্ট পরিমাণ দুধ গ্রহণ করতে পারে না। ইওরোপেরও এমন অনেক দেশ রয়েছে সেখানে দুধের উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়ে থাকে। তেমন পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড, জার্মানী ও সুইডেনের সরকার জনগণকে গাভী হত্যা করার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়ে থাকে অবশ্য যা যুক্তিসঙ্গত নয়। এমন অবস্থায় যদি অবাধ ৰাণিজ্য ব্যবস্থা চালু থাকে তবে দুধ উৎপাদনে ঘাটতি দেশগুলি ও উদ্বৃত্ত দুধ উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে দুধের ব্যাপারে এক পারস্পরিক দেওয়া–নেওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। তার ফলে ঘাটতি উৎপাদনের দেশগুলি উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী দেশগুলির বাড়তি দুধ ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এমনটি করা হলে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রই উপকৃত হবে। এখানে অবাধ ৰাণিজ্য ব্যবস্থা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি এমন একটা পদ্ধতি যেখানে কোন প্রকারের আমদানী বা রপ্তানী–শুল্ক চাপানো হবে না। ফলে এই ধরণের পণ্যের দাম হ্রাস পাৰে। সাধারণ ক্রেতা ৰাজারে জিনিস কিনতে গিয়ে দ্রব্যের কম মূল্যের দ্বারা উৎকৃত হবে।

দ্বিতীয়তঃ সর্ব দেশেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সামগ্রীগুলি যথাযথ ভাবে গুদামজাত করে সংরক্ষণ করার সুবন্দোবস্ত থাকা

দরকার। বাঙলার মালদহ জেলায় আম যা' একটি দ্রুত পচনশীল ফলন, উদ্বৃত্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেহেতু সে জেলায় আম সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই সেহেতু সে জেলার সাধারণ আম উৎপাদকরা জলের দরে আম বিক্রী করে দেয়। কিন্তু সেই আমই উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে যদি তারা চার মাস পরে বিক্রী করতে সক্ষম হত তবে আমের উপযুক্ত বাজার দর পেতে পারত। আর যদি উৎপাদন কারখানা স্থাপনের দ্বারা আম থেকে তার জেলি, জ্যাম্, তরল পানীয়, আমসত্ত ইত্যাদি তৈরী করার ব্যবস্থা করে তবে তারা এই দ্রব্য সামগ্রীকে আরও দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। ইওরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের এমন অনেক দেশ আছে যেখানে আম উৎপন্ন হয় না। যদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তবে ওই সব ইওরোপীয় দেশে অনায়াসে আম বিক্রী হতে পারে ও এ ভাবে আম উৎপাদকরা যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

ভারতে নদীয়া জেলাটাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতে এমন অনেক স্থান রয়েছে যেখানে শীতকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সব্জি উৎপন্ন হয়ে থাকে। অন্য দিকে শীতের মরশুমে অত্যন্ত শৈত্যের জন্যে ইওরোপের দেশগুলিতে শাক-সব্জি উৎপাদন একেবারেই সম্ভব হয় না। নদীয়া জেলার রানাঘাট, নাগি, বাগো প্রভৃতি স্থানে শীতের দিনে কয়েক

ধরণের সব্জী যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যদি ওই সব এলাকায় 'প্রসেসিং' করার কারখানা স্থাপন করা যায় তবে টিনে ভ'রে দ্রুত বিনাশশীল শাক–সব্জিগুলিকে অনায়াসে সংরক্ষণ করা যেতে পারে ও তখন সেগুলি বহির্দেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। কলিকাতা থেকে জাহাজে ইওরোপে মাল পাঠাতে খুব বেশী হলে দিন কুড়ি সময় লাগতে পারে। তাই অন্যত্র যোগান দেবার সময়টুকুতে ওই ধরণের ফসলের জন্যে উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। পানপাতার ব্যবসাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে তমলুক, মেচেদা, বাগনান প্রভৃতি স্থানের গরীব পান–উৎপাদকরা অদূর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

তৃতীয়তঃ, উৎপন্ন দ্রব্যের আরও নানা ধরণের ব্যবহার কি করে চালু্ করা সম্ভব তারও রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। অর্থাৎ দ্রব্যের ব্যবহারও হওয়া উচিত প্রগতিশীল উপযোগতত্ত্ব অনুসারে ও নানা পদ্ধতিতে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে বর্তমানে তিসির ব্যবহার খুব সীমিতভাবেই হয়ে থাকে। যদি তিসি থেকে নিসৃত তেলকে দুর্গন্ধমুক্ত করা যায় তবে তা ভোজ্য তেল হিসেৰে ৰাজারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ ছাড়া তিসির গাছ থেকেও লিনেন সূতো উৎপন্ন হতে পারে, অথচ গাছগুলিকে এখন নষ্ট করে ফেলা

হয়। ভারতে প্রচুর পরিমাণে ঢ্যারস উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলির ব্যবহারও হয় কেবল সব্জি হিসেবেই। অথচ ঢ্যারসের বীজ থেকে তেল উৎপন্ন হতে পারে ও ভোজ্য তেল হিসেবে তা ৰাজারে বিক্রীও হতে পারে। এমনকি এই ঢ্যারসের গাছ থেকে মিহি সূতোও তৈরী করা সম্ভব। আর এই সূতো দিয়ে উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদন হতে পারে।

ৰাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে পাটের উদ্বৃত্ত উৎপাদন হতে থাকে। পাটের এই অতিরিক্ত উৎপাদন আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পাট দ্রব্যের নানামুখী ব্যবহারের দ্বারা উদ্বৃত্ত পাটের এই সমস্যাকে অনায়াসে দূর করে ফেলা যেতে পারে। পাট থেকে আমরা সূক্ষ্ম ধরণের সূতো তৈরী করে উন্নত মানের বস্ত্র উৎপাদন করতে পারি।

অবাধ ৰাণিজ্য নীতি বিশ্বে চালু করার ক্ষেত্রে ভৌম-ভাবপ্রবণতা আজ নানা ধরণের বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। এ ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট দেশগুলি ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি উভয়েই অবাধ ৰাণিজ্য নীতির বিরোধিতা করছে। তাদের এই বিরোধিতার কারণ হল যে তাতে তাদের নিজ নিজ দেশের উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্বার্থে ঘা' লাগবে। কিন্তু বিশ্বে আজ অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্রের উজ্জ্বল ও সফল দৃষ্টান্তস্বরূপ বেশ গতগুলি স্থান আমরা দেখতে পাই। যেমন রয়েছে সিঙ্গাপুর। কলিকাতা

অঞ্চলকেও অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার কথা উঠেছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট নেতাদের ব্যর্থতা ও অন্যান্য কারণে সে পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত করা আজও হয়নি। যদি তা করা হত বাঙলা তাতে বিপুলভাবে লাভবান হতে পারত। প্রাউটের সংশোধিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় কোন প্রকারের ভোগ্য পণ্যের আমদানী–রপ্তানির ওপরে শুল্ক ধার্য্য করা নিষিদ্ধ করা হবে। যদি উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয় তবে এই ধূলির ধরিত্রীই সোণার পৃথিবীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

কমিউন পরিচালিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি থাকে। এ কারণেই কম্যুনিষ্ট দেশগুলি তাদের 'ইজম' নিয়ে ৰড় বড় কথা বললেও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে আজও খাদ্য আমদানী করে চলেছে। তারা এই অবাধ ৰাণিজ্য নীতিরও বিরোধিতা করে চলেছে।

দ্রুত বিনাশশীল নয় এমন দ্রব্য অথবা কাঁচামালের যদি উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়ও তবে সে ক্ষেত্রে দেখতে হৰে সেগুলি যাতে অন্য রাষ্ট্রে রপ্তানি না হয়ে যায়। তার পরিবর্তে ওই কাঁচামালকে স্থানীয়ভাবে বিক্রয়যোগ্য তৈরী মালে পরিণত করে তুলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ রাঢ়ের পশ্চিমাংশ, ওড়িষ্যা রাজ্য, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চল, বিহারের দক্ষিণাংশ ও

তেলেঙ্গানা কাঁচামালের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ স্থান। এ সব অনুন্নত অঞ্চলকে উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা জার্মানীর রাইনের মতই উন্নত অঞ্চলে পরিণত করা যেতে পারে। এ সব অনগ্রসর স্থানে কারখানা স্থাপনের দ্বারা কাঁচামালকে বিক্রয়যোগ্য তৈরী মালে পরিণত করে দারিদ্র্য পীড়িত সাধারণ মানুষের জীবনধারণের মান উন্নত করে তোলা যায়। কোন দেশ যদি তার কাঁচামাল বাইরে রপ্তানি করে তবে বুঝতে হবে সে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। যদি উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রয়োগের দ্বারা কোন দেশে কৃষি বা শিল্প ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করা সম্ভব হয় তবে পূর্বে উল্লিখিত উপায় অনুসারে উদ্বৃত্ত দ্রব্যগুলির ভোগের পদ্ধতিতে বা ব্যবহারে বৈচিত্র্য এনে অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এ ভাবে জনগণের হাতে ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাৰে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির অঢেল অকৃপণ প্রাচুর্য সাধারণ মানুষের জীবনে আনৰে সমৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ। অতএব, প্রাউটের অর্থনৈতিক কাঠামোয় উৎপাদন স্ফীতি/(উদ্বৃত্ত উৎপাদন) কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না।

প্রাউট হল সর্ব রোগের মকরধ্বজ

মানব সমাজের সুসম সর্বাত্মক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাউট হল একমাত্র সর্ব রোগের মকরধ্বজ। অর্থনীতিতে পুরোপুরি পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে প্রাউট সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনে নিয়ে আসবে ওজনগত ভারসাম্য ও শক্তিগত ভারসাম্য। প্রাউট ব্যতীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবার আশা স্বপ্নই থেকে যাবে। এছাড়া প্রাউট বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকেও জড়তা বা গতিহীনতার (Staticity) ত্রুটী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক গতিশীল তত্ত্ব। কেবলমাত্র প্রাউটই বিশ্বকে মন্দার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

ধনতন্ত্রে রয়েছে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গতিহীনতা। কম্যুনিজমেও রয়েছে ব্যাপক ও গভীর পরিমাণে তার অন্তর্নিহিত স্থাণুত্ব। প্রাউট এই সব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ত্রুটীগুলিই অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সব ধরণের 'ইজমের' পরিসমাপ্তি ঘটাৰে। তাই বুদ্ধিমান মানুষদের উচিত বর্তমান সময়ের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা। আজ আমরা বৈশ্য যুগের শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছি। যদি এখন বড় ধরণের একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়, তবে তা নিপীড়িত আর্ত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করবে। এটাই হল সুবর্ণ সুযোগ লাভের উপযুক্ত মুহূর্ত। এক সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করবার জন্যে একে কাজে লাগাও। প্রাউট আদর্শের এটি হ'ল এক

উপ–তত্ত্ব যাকে আমরা গতি–বিজ্ঞান বা Science of dynamics নামে অভিহিত করতে পারি।

(১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ সাল কলিকাতা)

প্রাউটের পঞ্চম মৌলিক সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব

প্রাউটের পঞ্চম মৌলিক সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:–

"দেশকাল পাত্রৈঃ উপযোগাঃ পরিবর্তন্তে
তে উপযোগাঃ প্রগতিশীলাঃ ভবেয়ঃ।"

–দেশ–কাল–পাত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী সমগ্র উপযোগ নীতির পরিবর্তন হতে পারে আর এই উপযোগ হবে প্রগতিশীল স্বভাবের।

সূচীপত্র

এই সিদ্ধান্তের একটা নির্দিষ্ট বিশেষত্ব আছে। এখন দেখা যাক, কোথায় এর বিশেষত্ব। এই বিশ্বের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। স্থান–কাল–পাত্র এই আপেক্ষিক তত্ত্বও পরিবর্তনশীল। মানুষ ও সমাজ সহ সব কিছুই স্থান ও কালের পরিধির মধ্যে অবস্থান করছে। যদি দেশ ও কালের পরিধি হ্রাস করা হয় তাহলে স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করে নিতে হবে। যদি এই সামঞ্জস্য বিধান না করা হয় তবে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

পরিবর্তনই হলো প্রকৃতির নিয়ম। যদি কোন তত্ত্ব এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে চলে তবে তা অবধারিত ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতীতের বহু তত্ত্ব, আদর্শ ও তথাকথিত ধর্ম পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে অসমর্থ হওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তান্ত্রিক, বামমার্গী বা দক্ষিণ মার্গী, যাই হোক না কেন, সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হতেন। বাংলায় যখন বৌদ্ধদের প্রভাব চলছিল এই তান্ত্রিকগণ সাধনার সময় 'তন্ত্রচক্র' নামে বিশেষ এক প্রতীকের ওপর বসতেন–যেহেতু এই সাধকগণ ওই চক্রে বসতেন তাই এদের চক্রবর্তী পদবী দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। স্থান ও কালের পরিবর্তনে চক্রবর্তী পদবী আর

তেমন সম্মানের পরিচয় বহন করে না। মানুষ এখন চক্রবর্তী পদবীর তেমন বিশেষ কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা দেয় না।

স্থান ও কালের পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাউট সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে। প্রাউটের মূল নীতির কোন পরিবর্তন হবে না বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাউটের প্রয়োগ-বিধি সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে। স্থান ও কালের পরিবর্তনের স্বীকৃতি-দান ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মানুষকে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলতে হবে। সামঞ্জস্য বিধান ও নমনীয়তা মানব প্রগতির জন্য অপরিহার্য।

আরও কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। অতীতে মানুষ দল বেঁধে পুণ্যস্নানে গঙ্গায় যেত। কিন্তু বর্তমানে তেমনটি আর বিশেষ দেখা যায় না। অতীতে যখন পরিবারে কোন সংকট দেখা দিত তখন বাবা-মা তাদের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দিত। তারা বিশ্বাস করত, সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলে বিপদের হাত থেকে তারা রক্ষা পাৰে। এখন কোন মা-ৰাৰা এইভাবে সন্তান বিসর্জন করে না। এমন কি এ ধরণের কথা শুনলেও শিহরিত হয়ে উঠে। মানুষ অতীতের এইসৰ প্রথা আর মানছে না, মানতে রাজী নয়। এই হল সমাজের নমনীয়তার লক্ষণ। যদি পুরোনো কোন প্রথাকে নির্বিচারে কোন সমাজ অনুসরণ করতে থাকে

তবে সে সমাজ তার গতি হারিয়ে ফেলৰে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কোনো এক 'ধর্ম–শাস্ত্রে' লেখা আছে সুদে টাকা খাটানো পাপ। যদি জনগণ এই নীতি কঠোরভাবে মেনে চলে তাহলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে ৰাতিল করতে হয়। আর তাতে গোটা সমাজকেই তার জন্যে ভুগতে হবে। ঠিকভাবে সরকার পরিচালনা করতে গেলে নেতাদের হয় এই নীতি লঙ্ঘন করতে হবে; আর তা না করে' যদি তাঁরা তাঁদের ধর্মমতের ওই নির্দেশ অনুসরণ করেন তাহলে জেনে–বুঝে তাঁরা সমাজের ক্ষতি করবেন। আর সেক্ষেত্রে আমরা ৰলৰ তাঁরা ভাবজড়তার (dogma) দ্বারা প্রেষিত হচ্ছেন। এই সৰ ভাবজড়তাকে যাঁরা আঁকড়ে ধরে রাখবেন আধুনিক যুগে তারা পরিত্যক্ত হবেন। বর্ত্তমান বিশ্বে প্রায় সমস্ত তথাকথিত ধর্মমতকেই এ জাতীয় উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

যদি হিন্দুরা তাদের বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে মেনে চলেন তবে তাঁরাও সমাজের ক্ষতি করবেন। অতীতে হিন্দু বিধবাগণ মোটা শাদা থান–কাপড় পরতেন ও চুল ছোট ছোট করে কাটতেন। কিন্তু বর্তমানে বিধবাগণ আর তা মানেন না। আজকাল যদি তোমরা কেউ কোন বিধবা মহিলাকে এই

ধরণের প্রথা মানৰার জন্যে বোঝাৰার চেষ্টা কর তাহলে তোমরা অপমানিত হবে।

সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রেই স্থান, কাল, পাত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে। যদি কোন মানুষ স্থান–কাল–পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে না চলেন তাহলে নিঃসন্দেহে তার ঠাঁই হৰে সেকেলের দলে।

প্রায় ১৫০ বছর আগে কার্ল মার্ক্স সমাজের শোষণ ও বৈষম্য লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আয়–বৈষম্যই হ'ল সামাজিক অবিচারের মূল কারণ। তাই তিনি ভাবলেন, সমাজে যদি ব্যষ্টিগত আয় না থাকে ও জনগণ যদি 'কমিউনে' এক সঙ্গে বাস করে আর সরকার যদি খাদ্য, বস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে তাহলে সমাজে কোন অবিচার থাকবে না। কিন্তু সত্যিই কি 'কমিউনিষ্ট দেশগুলোর সামাজিক–অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান হয়েছে?

এই কমিউন ব্যবস্থায় দক্ষ বা বিশেষ গুণসম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষও অতি সাধারণ মানুষের সমান আয় করে। সেখানে কঠোর পরিশ্রমের জন্য উৎসাহ দান বা কোন বিশেষ সুবিধা দানের (ইনসেন্টিব্) ব্যবস্থা নেই। সৰাইকে একই মজুরী বা ৰেতন দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই কাজের মূল্য সম্পর্কে সেখানে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে। এমতাবস্থায় কোন মানুষই

তার পূর্ণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাবে না ও প্রতিভাবানের প্রতিভাও প্রকাশের সুযোগ পাৰে না। রাজা ভোজ যিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি তার রাজসভায় যদি একজন মূর্খের সমান মর্যাদা পেতেন তাহলে তার রাজ্যই চৌপট হয়ে যেত। কম্যুনিষ্ট দেশে এটাই হয়েছে ও হচ্ছে। তাই কমিউনের উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যষ্টিগত উৎসাহ ও উদ্যোগকে কাজে না লাগানোর ফলে ও প্রতিভাবানদেরও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা না থাকার ফলে এই নীতি আজ এক অবাস্তব নীতি ৰলে প্রমাণিত হয়েছে। এটাই কমিউন ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। রাশিয়া তার জনগণের ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। তাই 'আজ জগণের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত যথেষ্ট কৃষি-জমি থাকা সত্ত্বেও কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার মত ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে রাশিয়াকে গম ক্রয় করতে হচ্ছে। কমিউন-ব্যবস্থার প্রয়োগ বিধি আজ অচলাবস্থায় এসে পৌঁছেছে ও একরকম হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কমিউনিষ্টরা সমস্ত যুক্তি বিচার ভুলে আজ হিষ্টিরিয়া রোগীর মতই চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। তাদের আশা, মানুষ ভয় পেয়ে তাদের অনুসরণ করবে। যুক্তির পথ ধরে চলতে গেলে ৰৌদ্ধিক নমনীয়তা অত্যাবশ্যক। যখন এই নমনীয়তার অভাব দেখা দেয় তৰে শূন্যগর্ভ চিৎকারে ঢাকা পড়ে যায় যুক্তিপূর্ণ ভাবনা।

সূচীপত্র

আজকের দিনে কি ধর্মমত, কি বিজ্ঞান, কি সমাজ সর্বত্রই এই নমনীয়তার অভাব দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানে ডাল্টনের পরমাণুবাদ ইতোমধ্যেই অচল হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নূতন নূতন মতবাদ এসে পুরোনোকে সরিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। উদাহরণ স্বরূপ রসায়ন বিজ্ঞানের কথাই ধরা যাক। যদি দুটো কোম্পানীর একই লবন নিয়ে এসে পরীক্ষা চালনো হয়, দেখা যাবে কোথাও না কোথাও পার্থক্য বা স্ব-বিরোধিতা দেখা দিচ্ছে, এর মূলকারণ হ'ল দুই কোম্পানীর লবণে মাইক্রোবাইটামের সংখ্যার পার্থক্য রয়েছে। মাইক্রোবাইটাম তত্ত্ব দেশ ও কালের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য এনে দেবে।

পরিবর্তন যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, আকর্ষণ হ'ল তেমনি প্রাকৃতিক নিয়ম। বস্তুতে বস্তুতে যেমন আকর্ষণ আছে তেমনি আবার ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতেও পারস্পরিক আকর্ষণ রয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। যদি অন্ধকার রাতে কোন মানুষ জঙ্গলে হারিয়ে যায় ও হঠাৎ টর্চের আলো দেখতে পায়, তবে ওই টর্চধারী চোর বা খুনী কিনা-এসব না ভেবেই তার সমীপবর্তী হৰে। অপরদিকে টর্চধারী লোকটিও জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া লোকটির চরিত্র বিচার শুরু করবে না। বরং ভাববে ঐ লোকটিকে

নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই তার কর্তব্য। এটা হ'ল মানুষের পারস্পরিক আকর্ষণের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

অন্য উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে, কেউ কেউ ভাবেন মানুষের মত পশুরা তাদের সন্তানদের ততটা ভালবাসে না। কিন্তু এটা ঠিক নয়, পশুরাও তাদের সাধ্যানুযায়ী তাদের সন্তানকে ভালবাসে। দেশ–কাল–পাত্র ভেদে মানুষের ভালবাসাতেও পার্থক্য দেখা দেয়। মা তার ছেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। কিন্তু যখন ছেলে বিয়ে করে ও মা দেখেন তার ভালোবাসার অনেকটাই পুত্রবধূ ছিনিয়ে নিচ্ছে তখন মায়ের ভালবাসায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে। এই ক্ষতি পূরণ করতে মা তখন অবিবাহিত অন্য ছেলে মেয়েদের অধিক ভালবাসতে শুরু করে। এর পেছনে মনস্তত্ব হল, স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকে।

আমাদের অবশ্যই এই ভালবাসা বা আকর্ষণের ক্ষেত্রকে বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের এই ভালবাসা পশু–পাখী–উদ্ভিদ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। এদের প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে–প্রত্যেকেরই আছে অনুভূতি। আমাদের ভাবতে হবে, আমার যেমন অনুভূতি আছে সৰার তেমন অনুভূতি আছে। কেউ পর নয়, সবাই আপন। এই বোধ নিয়ে সমস্ত প্রাণীন এমন কি অপ্রাণীন সত্তাকেও আপন করে নিতে হয়। এটাই

হল নর্যমানবতাবাদ। আর এই নৰর্যমানবতাবাদ মানব মনের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য।

সুতরাং মানুষ সহ সমস্ত সৃষ্টির প্রতি কল্যাণ ভাবনার ধারা–প্রবাহকে অব্যাহত রাখতে আমাদের এমন এক তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে যাতে রয়েছে নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা। ইলাষ্টিকের বন্ধনী দেওয়া কোন পোষাকের বন্ধনের নমনীয়তা যখন আর থাকে না তখন সে পোষাক পরিত্যক্ত হয়। তেমনি কোন মতবাদ যদি তার নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে ও দেশ–কাল–পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে না পারে তাও পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কোন নীতির প্রয়োগ বিধি (policy) দেশ–কাল–পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু মূল নীতি (Principle)-গুলি অপরিবর্তনীয় থাকৰে। কারণ, তা সর্বানুস্যুত ও এগুলির সাক্ষী সত্তা, সর্বজ্ঞানের আধার।

বর্তমানে এই পরিবর্তনের যুগে তোমরা তোমাদের চোখের সামনে দেখছো বহু তত্ত্ব পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হয়েছে। যদি কেউ অতীতের কঙ্কালকে জড়িয়ে ধরে থাকে, তাহলে সেও সমাজে পরিত্যক্ত হয়ে যাৰে। বুদ্ধিমান মানুষ পুরাতন সেকেলে চিন্তাভাবনাকে জড়িয়ে ধরে থাকবে না বরং যে তত্ত্ব দেশ–

কাল-পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে' শ্বাশ্বত কালের জন্যে টিকে থাকবে সেই তত্ত্বকেই তারা আলিঙ্গন করবে।

(কলিকাতা, ১৬ই মার্চ, ১৯৮৮)

কণিকায় প্রাউট

চতুর্দশ খণ্ড

জিনিয়াস্ ও টেক্নিসিয়ান

যারা বোঝে যে তাদের অনেক কাজ করতে হবে তাদের মধ্যে অনেকেই ভাবে—এই যে অনেক কাজ করব, কিন্তু আমার জ্ঞানই বা কতটুকু, বিদ্যেই বা কতটুকু, বুদ্ধিই বা কতটুকু। অন্যে আমার কথা শুণবে কেন, মানবে কেন? এই সব কথাও তারা ভাবে—অবশ্যই ভেবে থাকে।

হ্যাঁ, এ কথাটা সত্যি যে কাজ অনেক। মানুষ জাতির এই যাত্রা–পথের যে আদি বিন্দু তার থেকে মানুষ খুব অল্প একটুখানিই এগিয়ে এসেছে, অনেকখানি এগিয়ে আসেনি। অনুমানিক দশ লাখ বছর হ'ল, এই ধরিত্রীর বুকে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এই দশ লাখ বছরে মানুষ এমন কিছু এগিয়ে আসেনি, আর এই এগিয়ে আসার পথে মানুষকে জ্ঞানের চর্চা করতে হয়েছে সেই গোড়ার থেকেই, গোরুর গাড়ীর যুগ থেকেই।

তোমরা জান, পৃথিবীর অনেকগুলো সভ্যতাই পুরোণো সভ্যতা, যেমন ইজিপ্সিয়ান সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, চৈনিক

সভ্যতা, ও উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ–আমেরিকার উত্তরাংশের মায়া সভ্যতা (মায়ান সিবিলাইজেশন অব সাদার্ণ পোরসান অব্ নর্থ আমেরিকা এণ্ড নদার্ণ পোরসান্ অব্ সাউথ আমেরিকা)। মানুষের যাত্রার আদি বিন্দু থেকে দেখতে গেলে এই সভ্যতাগুলো যে খুব বেশী এগিয়ে ছিল তা নয়। তবু তুলনামূলক বিচারে এরা এগিয়ে ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা অনেকেই করতে পারেনি। না পারার কারণ ছিল, তাদের জীবনে সর্বাত্মক সমন্বয়ের অভাব। তারা সব দিকটা সামলে চলে নি। কেউ পরামর্শ দিয়েছে যে গোটা সমাজটাই সব কিছু ছেড়ে হিমালয়ে নিয়ে বসে থাকুক। তাহলে তো জীবনের বাকি দিকগুলো উপেক্ষিত রয়ে গেল। আবার কেউ বলেছে–না, সন্ন্যাসের দরকার নেই, সবাই ঘরে থাকুক। এখন ঘরে থাকা মানুষকে নানান সমাস্যা নিয়ে থাকতে হয়। ধরো, কাউকে যদি বলি আজই এক্ষুণি, উত্তরমেরুর দিকে রবাণা হও সেকি তা পারবে? সে বলৰে, "দাড়াও ৰাৰা, আর তিন মাস আছে, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে নিই। ছেলেটার পরীক্ষা বাকি রয়েছে। "সাত শ' দিক্ তাকে সামলাতে হচ্ছে। আবার কেউ বলছে যে নীতিবাক্যই সবচেয়ে বড় কথা–'সৎপথে থাক'। প্রশ্ন হ'ল, সৎপথে থাকলেই কাজ হয়ে যাবে? রাস্তাটি মনে করো খুবই ভাল। সেই রাস্তা দিয়েই চলছ; এখন কোথায় যাবে, কেমন ভাবে যাবে তুমি জান না, সৎপথে থাকলেই হ'ল! সৎপথে

থাকার সঙ্গে সৎ লক্ষ্যটাও তো থাকতে হবে। আবার সৎপথে চলতে গেলে তার কায়দাটাও শিখতে হৰে, অর্থাৎ চলতে চলতে খেতে হৰে, জল তেষ্টা পাৰে, তার রসদের ব্যবস্থাও তো করতে হৰে। সব দিক সামলে চলতে হবে। এই সব দিক সামলে চলার গুণটুকুর অভাব ঘটার জন্যে পুরোণো সভ্যতার কোনটা শেষ হয়ে গেছে, কোনটা ধুঁকছে। কোনটা বা অন্যের সংস্পর্শে এসে এমনভাবে বিবর্তিত হয়ে গেছে যে তার পুরোণো রঙটা আর চেনা যায় না। যেমন সেই একজন দুগ্ধ-ব্যবসায়ীকে একজন ৰাৰু ৰলেছিলেন না যে তুই আমাকে টাকায় এক সের দুধ দিস্ আর অমুক-ৰাবুর গয়লা টাকায় দু'সের দুধ দেয়। সে বললে, "আমিও দোৰ"। তা-ই দিতে শুরু করলে। তারপর এরকম করতে করতে বাবুটি বললেন, "অমুক ৰাবুর গোয়ালা টাকায় ষোল সের দুধ দেয়"। গোয়ালা বললে, "আমিও দিতে পারি বাবু, তবে দুধের আর রঙ রাখতে পারব না"-মানে এত জল ঢালতে হচ্ছে যে দুধের শাদা রঙটা আর থাকছে না। অনেক সভ্যতা অন্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে তার আসল রঙটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই যেমন আমাদের বাঙ্গারই যে পুরোণো সভ্যতা-প্রাক্-আর্য, প্রাক্-ঐতিহাসিক সভ্যতা-তার আসল রঙটা আর খুঁজে পাওয়াই যায় না। হ্যাঁ, এটা বোঝা যায় যে সে যুগের বাঙলার

মেয়েরা, সেই সুপ্রাচীন কালের বাঙলার মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দিত না, কারণ সব মেয়েরই খোঁপাতে কাজললতা গোঁজা থাকত। তোমরা জান যে খোঁপায় কাজললতা গোঁজা থাকলে আর ঘোমটা দেওয়া যাবে না, ঘোমটায় আটকে যাবে। আজকালকার মেয়েরা মাথায় কাজললতা গোঁজে না। সে যুগে সব ছেলেদেরই কোমরে বটুয়া থাকত, কিন্তু এখন আর তা গুঁজে রাখে না। ওই বটুয়া থেকে তারা পাণ খেত; এখন আর তা থাকে না। এখন কেবল বিয়ে করতে যাবার সময় ছেলেরা যাঁতি নেয়, মেয়েরা মাথায় কাজললতা গোঁজে। তা দেখে সেই পুরোণো অভ্যেসটা চেনা যায় যে সেকালে এরকমটি ছিল। তা আজ আর তেমনটি নেই। বিশ্বের সব কিছুই পরিবর্তনশীল–সব কিছুই এইরকম ভাবে এগিয়ে যায়, বিবর্তিত হয়। পৃথিবীতে কোন কিছুই থেমে থাকে না।

এখন সবচেয়ে পুরোণো সভ্যতা যাদের আর লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এমনকি বিবর্তনের ভেতরও পাওয়া যাচ্ছে না–তা হচ্ছে মিশরীয় সভ্যতা ও দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতা। এদের দুইয়েরই পতনের প্রধান কারণ কী?–না মায়া

সভ্যতা পেছিয়ে পড়ল এই জন্যে যে সে চাকা আবিষ্কার করতে পারে নি। যেমন শ্লেজ গাড়ী হরিণ দিয়ে টানানো হয়, উত্তর মেরু অঞ্চলে গাড়ী আছে কিন্তু গাড়ীর চাকা থাকে না

বরফের ওপর দিয়ে চলে। সেই মায়া সভ্যতা চাকার আবিষ্কার করতে পারনি। চাকা হ'ল গতির দ্যোতক, স্পীডের দ্যোতক। চাকা আবিষ্কার করতে না পারায় গাড়ী আবিষ্কার করা সম্ভব হ'ল না, যানবাহনের সুবিধা হ'ল না, যান্ত্রিক শক্তিকে কাজে লাগানো গেল না। সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল। যে ইজিপ্সিয়ান সভ্যতা এককালে বড় বড় পিরামিড তৈরী করেছে, মমি তৈরী করেছে, মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে ও আরও কত কী করেছে, সেই মিশরীয় সভ্যতা পেছিয়ে পড়ল। কারণ তার মূল ত্রুটি ছিল এই যে সভ্যতাকে সংরক্ষণ করতে গেলে যে ক্ষাত্র শক্তির দরকার সে দিকে সে নজর দেয়নি। চৈনিক সভ্যতা ধ্বংস হয়নি, সে বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে, ভারতীয় সভ্যতাও ধ্বংস হয়নি, সেও বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ভারতের সভ্যতাও এত বেশী বিবর্তিত হয়েছে যে পুরোণো রঙটা খুঁজে পাওয়া রীতিমত মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই বৈদিক যুগের জীবন বা প্রাবৈদিক দ্রাবিড় যুগের জীবনের সঙ্গে বর্তমান ভারতের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অনেক কষ্ট করে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে হয়। সভ্যতাকে বাঁচাতে গেলে তার কতকগুলো বিশেষ দিকে নজর রাখতে হয়, ও সে ভালভাবে ৰাঁচাতে পারে যদি সে সব দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে।

সূচীপত্র

এখন আসল কথায় আসা যাক। আমাদের ধর্মীয় জীবনে –আমি আগেই বলেছি, ধর্ম মানে জীবনের সকল অভিব্যক্তির সমন্বিত রূপ–কোন দিকটাকে উপেক্ষা করৰ না, কোন দিকটাকে বর্জন করৰ না। আমাদের সন্ন্যাসী রয়েছেন, আমাদের গৃহীও রয়েছেন। সবাইকে নিয়েই আমাদের জীবন। আমরা কোন কিছুকে অস্বীকার করিনি। সবাইয়ের প্রকৃত মূল্যটা গ্রহণ করেছি, ভবিষ্যতেও করব, আর করব বলেই আমরা পৃথিবীর সব মানুষকে এক প্লাটফর্মে জড় করতে পারব। পারৰ কেন বলব, আমরা পেরেছি, আরও ভাল ভাবে ভবিষ্যতে পারৰ।

তোমরা সকলেই সব সময় এই কথাটা মনে রেখে কাজ করে চলো। মনে রাখবে মানুষের জীবন একটা ফুল নয়, একটা ফুলের তোড়া, অথবা মনে করতে পার মানুষের জীবন একটা ফুলের বাগান। তাতে অজস্র রকমের ফুল ফুটে রয়েছে ও এই নানান রকমের ফুল একসঙ্গে ফুটেছে বলেই ৰাগানের সামগ্রিক শোভা। গোটা ৰাগানটায় যদি কেবল ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা থাকত তাহলে এককভাবে একটা ফুল দেখতে ভাল লাগত ঠিকই, সামগ্রিকভাবে ৰাগানটাকে দেখতে ভাল লাগত না অথবা যদি একই রকমের গোলাপ থাকত তা' ভাল হত না। নানান রঙের গোলাপ থাকার ফলেই এর শোভা বেড়েছে,

সৌন্দর্য বেড়েছে। মানুষের এই জীবনটাকে, মানুষের এই জগৎটাকেও আমরা সেই রকম ভাবে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলৰ। সবের সমন্বয়ে এককে দেখব। আমরা দেখব কেন বলৰ দেখছিও আর সেই জন্যেই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকেও সংহত করতে পেরেছি। সংহত ক্ষুদ্র শক্তি অনেক বৃহৎ শক্তির চেয়েও বড় জিনিস হয়। সব সময় নজর রাখবে যে আমাদের মধ্যে যেন কোন একটি ব্যষ্টিও কিছুমাত্র অবহেলিত না হয়–উপেক্ষিত না হয়। কোন একটা ছেলেও যেন মনে মনে না ভাবে–আমার কথা কেউ ভাবল না। কোন একটা ছেলেও যেন মনে মনে না ভাবে আমি খেলুম কি না কেউ জিজ্ঞেস করল না। এদিকে বিশেষভাবে নজর রাখবে। বিশেষ করে তোমরা যারা অনেকখানি দায়িত্ব নিয়েছ তারা মনে রাখবে, "আমি খেলুম কি না কেউ জিজ্ঞেস করল না"–এ ধরণের কথাটা নিজের ওপর প্রয়োগ করব না। ভাববে, কেউ তো ভাবছে না আমি খেলুম কি না.... কেউ জিজ্ঞেস করলে না....সুতরাং নিজের থেকে দায়িত্ব নাও। অর্থাৎ নিজের অধিকার সম্বন্ধে বেশী না ভেবে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশী করে ভাববে। আর মেয়েদের তো স্বভাব আছেই যে অন্যের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বেশী নজর রাখা ও আমাদের মেয়েরা আরও বেশী করে নজর দেবে এইটাই আশা করছি। আর এটা আমি মেয়েদের মন জোগাবার জন্যে বলছি

না। এটা হ'ল fact, এইটাই হয়ে থাকে। বাড়ীর লোককে কম খাইয়ে বা অতিথিকে কম খাইয়ে নিজে বেশী খাওয়া–এটা মেয়েদের স্বভাব নয়। তোমরা সামগ্রিক জীবনে, সামুহিক জীবনে কড়া নজর রাখবে–কেউ যেন উপেক্ষিত না হয়, কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। একথাটা মনে রাখার মধ্যেই সমাজের পরিস্ফুরণের বীজ নিহিত রয়েছে। অন্যের স্বার্থের কথা ভাববে সব সময়ে।

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

হ্যাঁ বলছিলুম, সুপ্রাচীন মায়া সভ্যতা চাকা আবিষ্কার করতে পারল না। চাকা আবিষ্কার হ'ল না, মানে গাড়ীও হ'ল না। এই সামান্য কোথাও কোন ত্রুটির ফলে এইটা হয়েছে। এটা বড় ব্যাপার কিন্তু ত্রুটিটা সামান্য, খুবই ছোট। ব্যষ্টিগতভাবে এমন অনেক মানুষ আছে যারা মনে করে, কিছু করা উচিত। এটা অনুভব করা সত্ত্বেও তারা আসল কাজ করতে পারে না। এমন অনেক মানুষ আছে যারা ভাবে–করা উচিত, আমি করব। এমন ইচ্ছাটাও আছে, তবু করতে পারে না কারণ সে দেখে যে নিজের মধ্যে অনেক

অসম্পূর্ণতা রয়েছে। যে কাজটা করতে গেলে অনেক জ্ঞানের দরকার সেই জ্ঞানটা তার নেই। অনেক খাটা-খাটনি করতে হবে-সে অতটা খাটা-খাটনি করতে পারে না। এই সব নানান কারণ রয়েছে। আবার অনেক সময় এমন হয়, আমি কি পারৱ, আমি কি পারৱ-মনে সংশয় জাগে। করতে চাইছে, ইচ্ছা আছে, সব ঠিক কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আত্ম বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। আমি কি পারব, আমার চেয়েও কত বুদ্ধিমান মানুষ রয়েছে, আমার চেয়েও কত সাহসী মানুষ রয়েছে, তারা তো পারছে না, আমি কি পারব? মনে এই প্রশ্ন।

আমি আগে একবার বলেছিলুম, জীবনে সাফল্য লাভের কতকগুলো কারণ যা শিব বলেছিলেন, তার প্রথম পদটা হ'ল- 'ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেপ্রথমলক্ষণম্'। আমি পারবই পারৱ- এই দৃঢ় বিশ্বাস চাই। এই আত্মবিশ্বাসটাই হচ্ছে প্রথম যোগ্যতা। আর এই যে আত্মবিশ্বাস এটা তৈরী করবে কী করে? এটা তৈরী করা সম্ভব কি? যেমন 'জিনিয়াস্' তৈরী হয় না, 'টেকনিসিয়ান' তৈরী হয়। জিনিয়াস্ হ'ল একটা সহজাত জিনিস। আর টেকনিসিয়ান হ'ল মেজে ঘষে তৈরী করা; অনেকে চেষ্টা করে পারে, অনেকে পারে না। আর যা সহজাত সে সুযোগ না পেলেও হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবগত ভাবেই কবি। আবার কারো সখ জাগল দু'চারটে কবিতা

লিখি, কেউ পারলো, কেউ পারল না। যে পারল তারও মান খুব উচ্চস্তরের নয়, মোটামুটি হয়েছে। অনেক খেটেখুটে লাইন মেলাতে হয়। 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির', তারপর দু'ঘন্টা বাদে মনে পড়ল, 'তাতে কিবা যায় আসে আমার পিসির'। এই রকমটা হ'ল 'টেকনিসিয়ান,' এরা 'জিনিয়াস, নয়। এমন অনেক মানুষ আছে যাদের অরিজিন্যাল থিংকিং কিছু নেই। তারা কী করে সাহিত্য ক্ষেত্রে? যাদের অরিজিন্যাল থিংকিং নেই কিন্তু লেখবার সখ আছে তারা দুটো পথ বাছে। একটা হ'ল সমালোচনার পথ। সমালোচক শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করছে–শরৎচন্দ্র এই জায়গায় এটা না লিখে যদি ওটা লিখতেন তাহলে ভাল হত–এই জায়গায় এ রকম লেখাটা অন্যায় হয়ে গেছে। এই রকম বলে চলেছে কিন্তু নিজে এক ছত্রও লিখতে পারবে না......'ক–অক্ষর গো মাংস', কিন্তু বসে বসে সমালোচনা। এই সমালোচকরা হচ্ছে কী–না, তাদের কর্মতৎপরতা একটা নেগেটিব স্টেজে চলে গেছে। সাহিত্যিকের কাছ থেকে যখন আর কিছু পাই না বা পাবার আশা করি না তখন তিনি সমালোচক হন। এটা অত্যন্ত জঘন্য জিনিস। অথবা তাঁরা 'প্যারোডি' লেখেন। অন্যের জিনিসটার ওপর কলম চালিয়ে এদিক ওদিক করা বা উল্টো ভাব নেওয়া।

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"

প্যারোডি করতে গিয়ে হ'ল, 'পাখী সব করে রব ফজর হইল।' আবার "ওঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ/আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।।" প্যারোডি করে বলা হয়, "ওঠ শিশু ওজু কর পর লুঙ্গি ফেজ/আপন কিতাবে মন করহ আমেজ।"

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বা ওই ধরণের যাঁরা জিনিয়াস তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ওই ধরণের প্যারডি করে থাকনে। রবীন্দ্রনাথের একজন বিশেষ অনুরাগী খুব বড় গাইয়ে ছিলেন। নামটা ইচ্ছে করে বলছি না। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে গেছেন থিয়েটার দেখতে। রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর মধ্যে সাক্ষাৎটা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ খানিক বাদে বললেন, "নীচে কী যেন একটা চক্‌চক্ করছে"। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমাকে আমি খুঁজছিলুম। তারপর একটা কী চক্‌চক্ করছিল দেখে বুঝলুম তুমি এসেছ"। তখন সে বললে, "কী চক্‌চক্ করছিল"। তিনি বললেন, "লাইটটা তোমার টাকে পড়ে চক্‌চক্ করছিল"। তারপর রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া"

গানটা প্যারডি করে গেয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে–

"তেলালো চেটালো টাকে লেগেছে ঝাঁঝালো রোদের হাওয়া"।

কিন্তু এটা সেই প্রতিভা ফুরিয়ে গেলো বলে প্যারডি হচ্ছে–তা তো নয়। এটা 'টেকনিসিয়ানের' কাজ, জিনিয়াসের কাজ নয়। জিনিয়াস অরিজিন্যাল কিছু লেখে, অরিজিন্যাল কিছু করে।

এখন টেকনিসিয়ানের কথা বাদই দিলুম। কথাটা হচ্ছে, জিনিয়াসটা একটা 'ইনবর্ণ ফ্যাকালটি'। সব মানুষ তা পায় না। কিন্তু যে মানুষের যেটুকু পোটেনসিয়্যালিটি আছে সেটুকু যাতে কাজে লাগাতে পারে সেটুকু তো চেষ্টা করতে হবে, আর এ চেষ্টা করবার শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে এইটা মনে রাখা যে পরমপুরুষ আমার সঙ্গে রয়েছেন। আমি তাঁর বলে বলীয়ান। নিজের সামর্থ্য নেই তো কী হয়েছে। তখন ভাবতে হবে– পরমপুরুষের সঙ্গে আমি মিলেমিশে রয়েছি। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে সামর্থ্যের স্রোত আমার মাধ্যম দিয়ে চারিদিকে পরিস্ফুট থাকবে। আমি কেন করতে পারব না যা মানুষ পারে। এমনি করে পারেও।

কোন মানুষের সামর্থ্য বা যোগ্যতা যতই কম থাকুক না কেন যে যদি সব সময়ে মনে রাখে যে পরমপুরুষ তার সঙ্গে রয়েছেন, সে পরমপুরুষকে ছুঁয়ে রয়েছে তাহলে তার দ্বারা

অনেক কিছুই হতে পারে। সে নিজেকে যতই ছোট ভেবে থাকুক না কেন সে ততটা ছোট আর থাকে না। আর যতক্ষণ পরমপুরুষের সঙ্গে এই সংযুক্তির ভাবটা মনে থাকে, ততক্ষণ সে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করে, অনেক বেশী কাজ করতে পারে ও এই ভাবনাটা যখন স্থায়ী হয়ে যায় তখন সেও মহান হয়ে যায়। তাই কোন মানুষেরই কোন অবস্থায় হতাশ হবার কোন কারণই নেই।

মানুষ ভাল কাজ করুক ও মনে রাখুক, "আমার সামর্থ্যের স্রোত পরমপুরুষের কাজ থেকে আসছে, আমি নিশ্চয়ই পারব।" আমরা যাকে 'জিনিয়াস' বলি, সেটাওতো ওই একই ধরণের ব্যাপার। পরমপুরুষ একটা বিশেষ সামর্থ্য কোন একটি বিশেষ মানুষের ভেতরে একটু বেশী মাত্রায় দিয়েছেন। খুব বেশী মাত্রায় নয়, একটু বেশী মাত্রাতে। কারণ একথা আমি একটু আগেই বলেছিলুম যে মানুষের ভেতরে যে সামর্থ্য আছে মানুষ তার অল্প ভগ্নাংশই ব্যবহার করে। একটা মানুষের যতটা সামর্থ্য রয়েছে সে হয়তো তার শতকরা এক ভাগ বা দু' ভাগের মত ব্যবহার করে আর শতকরা আটানব্বুই ভাগ অব্যবহৃত থেকে যায়। এই রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথ কত বড় কবি। কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথের যতটুকু সামর্থ্য ছিল, উনি

হয়তো তার শতকরা দশভাগ বা পনের ভাগ ব্যবহার করেছেন, তার বেশী করেননি। আমরা তাঁকে সে সুযোগ দিইনি। নানান ঝামেলার মধ্যে দিয়ে তাঁকেও দিন কাটাতে হয়েছে। আমরা যদি তাঁকে ওই ঝামেলাগুলো থেকে বাঁচিয়ে দিতুম তাহলে তিনি হয়ত আরও বেশী লিখে যেতেন। ব্যষ্টিগতভাবে আমার মত হচ্ছে এই যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে–যে মানুষের মধ্যে জিনিয়াস আছে, যে পোটেনসিয়্যালিটি আছে, সে যাতে সেটা পুরো সদ্ব্যবহার করতে পারে সেজন্যে ঝামেলা থেকে তাকে সব সময় বাঁচিয়ে রাখার। কারণ জাগতিক ঝামেলার মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষকে এত বেশী 'এনার্জি' খরচ করতে হয় যে তার উচ্চতর পোটেনসিয়্যালিটিগুলোকে আর কাজে লাগানোর সুযোগ পায় না। শরৎচন্দ্রকে যদি ওইভাবে জীবনযুদ্ধে নামতে না হত তাহলে হয়তো আর একটু বেশী লিখতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। বস্তুতঃ অধিকাংশ জিনিয়াসের সম্বন্ধেই একই কথা বলা যেতে পারে। জিনিয়াসকে আমরা চিনি না। অনেক সময় তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করি। অনেক সময় তাঁর কাজের ক্ষতি করে দিই যার ফলে শেষ পর্যন্ত মানব সমাজটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রবীন্দ্রনাথেরও নোবেল প্রাইজ় পাবার আগে তাঁকে ছোটো করবার কী অপচেষ্টা হয়েছিল। মাইকেলকে নিয়েও হয়েছিল।

মাইকেলের মত জিনিয়াস ভারতীয় ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করলেন। ভারতীয় ভাষায় বলা ভুল হবে, সংস্কৃত ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ আগে থেকেই ছিল। তবে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় প্রথম করলেন। কিন্তু তাঁকে সমালোচনায় অস্থির করা হয়েছিল যাতে কাজ না করতে পারেন। মাইকেলই প্রথম নামধাতুর ব্যবহার বেশী করেছিলেন।

"চলেছ কি নরনাথ যুঝিতে সমরে,
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে?”

'প্রতিবিধান করতে' ইত্যর্থে 'প্রতিবিধিৎসিতে'–এই ধরণের নামধাতুর ব্যবহার এর আগে বড় একটা কেউ করত না। বড় একটা কেন, করাই হত না। ওঁকে ঠাট্টা করে বলা হত, 'হড় হড় করি হুড়ুকিলা, মশারিলা মশা।' অর্থাৎ সবেতেই নাম ধাতু করে দেওয়া হচ্ছে। তা আমরা যেন নিজেদের স্বভাবটাকে এমনভাবে তৈরী করি যে যার যে জিনিয়াস আছে, সেই জিনিসটার যাতে সম্যক্ অভিব্যক্তি হয়, আমরা যেন ৰাধা দিয়ে তাকে বসাবার চেষ্টা না করি। কারণ মানুষের একটা দোষ–অনেক দোষের মন্যে একটা প্রধান দোষ হচ্ছে ঈর্ষা অথবা অসূয়া। সেটা থেকে সবাই যেন মুক্ত

থাকি। কেউ বড় হতে চাইছে, তার কাছা ধরে টেনে বসিয়ে দেওয়া এই বলে যে তুই বোস, তুই উঠছিস কেন, আমার সহ্য হচ্ছে না–এই যে মানসিকতা, মেনট্যালিটি এর থেকে দূরে থাকতে হবে। এতে হবে কি–না, গোটা মানব সমাজ উপকৃত হবে। একটা বিশেষ জিনিয়াসকে আমরা যদি অভিব্যক্তির পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিই তাহলে গোটা মানব সমাজ উপকৃত হবে। তা যার জিনিয়াস কম, যার জিনিয়াস নেই, সেও যদি মনে রাখে যে পরমপুরুষ আমার সঙ্গে রয়েছেন, আমাকে তিনি সামর্থ্য যুগিয়ে যাবেন–এই ভেবে সে যদি কাজে নাৰে সেও অনেক কিছু পেরে যাবে। সাধারণ মানুষের চেয়ে দু'চার গুণ নয়, দু'শ' পাঁচশ' গুণ বেশী সে কাজ করবে। টেকনিসিয়ান আর জিনিয়াসের তফাৎটা হ'ল কী? জিনিয়াস ইজ এ্যান ইনবর্ণ ফ্যাকালটি। ইট ক্যান নট বি ক্রিয়েটেড। টেকনিসিয়ান ইজ এ্যান অরডিনারী কোয়ালিফিকেশন্ ডেবলড় টু এন এক্সট্রাঅরডিনারী ডিগ্রি অব্ এফিসিয়েনসি। এই হ'ল জিনিয়াস আর টেকনিসিয়ানের মধ্যেকার মূল পার্থক্য।

(১০ই জুন, ১৯৭৯, কলিকাতা)

(অভিমত, তৃতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত)

অণুমানসের শাশ্বত বর্ধমান আয়তক্ষেত্র

আজকের আলোচ্য বিষয়– "অণুমানসের শাশ্বত বর্ধমান আয়তক্ষেত্র"। সমস্ত অণুমানসের (Microcosm) আয়তক্ষেত্র সমান নয় ও তা' সর্বক্ষেত্রেই যে বেড়ে চলেছে এমন কথাও বলা চলে না। কারণ তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী কোন কোন অণুমানস তার আয়তক্ষেত্রকে ক্রমশঃ খুইয়ে বসছে, ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার মানসিক পরিধির আয়তন যেমন ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে তার সত্তাও তেমনি জড়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে মানসিক সংবেদনার সুযোগ সে ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তেমনি জড়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা' সত্ত্বে একথা বলতে হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের যে অণুমানস সত্তা ছিল তা' খুবই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে কাজ করে যেত।

সুপ্রাচীনকালে সৃষ্টির একেবারে আদি বিন্দুতে মানুষ ঠিক পশুর মতই সারাদিন খাওয়ার চিন্তায় ঘুরে বেড়াত। আর শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে উপায় খুঁজে বেড়াত। এছাড়া তার আর কোন কাজ ছিল না। সংঘর্ষ ও সমিতির মাধ্যমে ক্রমশঃ অণুমানসের আয়তন পুষ্ট হতে থাকল।

সূচীপত্র

অণুমানসের আধার হিসেবে মানুষের শরীরটা ক্রমশঃ জটিল হয়ে যেতে থাকল। এখন মজার কথা হচ্ছে এই যে উন্নত অণুমানসের আধার হিসেবে মানুষের শরীরটা পাঞ্চভৌতিক সংরচনার জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে ঠিকই, কিন্তু এর মানে এই নয় যে শারীরিক শক্তিও তার বেড়ে চলেছে, বরং উল্টোটাই হচ্ছে; শারীরিক শক্তি ক্রমশঃ কমে চলেছে। কিন্তু আধারটা হয়ে চলেছে জটিল...... ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর। এই জটিলতর স্নায়ুকোষ, স্নায়ুতন্তুর আধার হিসেৰে শরীরটাও অন্য রকমের হয়ে যাচ্ছে। হাত–পায়ের শক্তি যাচ্ছে কমে, দাঁতের নখের শক্তি যাচ্ছে কমে, দৃষ্টিশক্তি যাচ্ছে কমে– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণতঃ অণুমানসের যে অগ্রগতি হচ্ছে, যা' মূলতঃ সংঘর্ষ ও সমিতির মাধ্যমে হয়ে চলেছে, তার আয়তক্ষেত্র বেড়েই চলেছে ও তার শক্তিও বেড়ে চলেছে।

সেই প্রাচীনকালের মানুষেরা গোষ্ঠীৰদ্ধভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল। দিনের বেলা সমতলে নেৰে আসত, সন্ধ্যে হলেই গাছের ওপর অথবা পাহাড়ে উঠত। গাছের ওপরে তারা যা' পেত তারই সাহায্যে ছোট ছোট ঘর তৈরী করত, যেমন পাখীরা বাসা বাঁধে। তাই আজও সাধারণ মানুষ কথ্য ভাষায়, বিশেষ করে বাংলায় 'ঘর তৈরী করা' বলে না, ৰলে 'ঘর বাঁধা'। সেই এক কালে ঘর বাঁধত, আজও সেই ভাষা ব্যবহার করছে।

সংঘর্ষ যেমন ৰাড়ল তেমনি নানান বিষয় নিয়ে তাকে ভাবতে হ'ল আর এই ভাবনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাভূমির প্রয়োজন মেটানোর জন্যে স্নায়ুতন্তুও বাড়তে শুরু করল, ও তাদের মধ্যে পরিবর্তনও এল। পরিবর্তন এল শরীরের চামড়ায় ও বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে। সেই প্রাচীনকালের মানুষ তাদের শত্রু হিসেৰে দেখত অন্য বর্গের মানুষদের যারা অন্য পাহাড়ে বা অন্য জঙ্গলে গাছের ওপর ঘর বেঁধে বাস করত। এইভাবে তারা তাদের শত্রুদের চিনে রাখত, এর বেশী নয়।

এই ভাবে কালক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের পরিচয় কি হয়ে দাঁড়াল–না, বিভিন্ন এলাকায় যে বাস করে সেই একটা বিশেষ পরিচিতি বহন করতে শুরু করল ও কারণে অকারণে একটা গোষ্ঠী আরেকটা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হ'ল। এই গোষ্ঠীতন্ত্র যত বেড়ে চলেছে ততই মানুষের অশান্তি বাড়ছে, অথচ চিন্তাভূমিতে তার ব্যস্ততাও বেড়ে যাচ্ছে।

আমি বলেছিলুম যে মানসিক বা পাঞ্চভৌতিক জগতে মানুষের কোন উন্নতি হয় না, উন্নতি একমাত্র আধ্যাত্মিক ভূমিতেই হয়। কিন্তু মানসিক ভূমিতে পরিধি বৃদ্ধির দরুণ তাকে বেশী ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে ও এই ব্যস্ততার অনেকগুলো কারণের একটা কারণ হ'ল যে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক

অবিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে। আগেকার অবিশ্বাস মারামারি হানাহানির ভেতর দিয়েই নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আজকে তা নয়। আজকে মনে এক, মুখে এক, আচরণে আরেক। যাকে সভ্য ভাষায় বলে কূটনীতি (diplomacy) তা' বেড়ে গেছে। তার ফলে মানুষের ব্যস্ততা বাড়লেও শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আর ব্যস্ততাও বাড়ছে, শান্তিও নষ্ট হচ্ছে। এতদুভয়ের মিলিত পরিণাম কী হচ্ছে? মানসিক ব্যাধি বাড়ছে–বেশী লোক পাগল হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আজকের মানুষের জগতে মতবাদের, মতাদর্শের ভীড় লেগে গেছে।

তারপরে মানুষের মনে মানুষের প্রতি ভালবাসারও অভাব রয়েছে। অভাব থাকার কারণ ওই একই। যে দৃষ্টিভঙ্গী সংশ্লেষণাত্মক নয়–বিশ্লেষণাত্মক হওয়ার ফলেই মানুষ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। একই মানুষ জাতির মধ্যে আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান তো' রয়েছেই, আবার একই আর্যজাতির মধ্যে মেডিটেরিয়ান রয়েছে, রয়েছে নর্ডিক, রয়েছে এ্যালপাইন, আবার তাদের মধ্যেও লাতিন, নন–লাতিন বিভাজন রয়েছে। বিশ্লেষণের ফলেই বিভাজনের দিকে যাচ্ছে ও বিভাজনের দিকে যাওয়ার ফলে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এখন এই যে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এর হাত থেকে মানুষকে বাঁচবার অন্য কোন পথ নেই–সেই সংশ্লেষণের রাস্তাটা না নেওয়া পর্যন্ত 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

কেউ কেউ ৰলে থাকেন যে মানুষের উন্নত মনীষা তথা তার কল্যাণের জন্যেই আজকের রেলিজনের আবিষ্কার করেছিল। যাঁরা এই কথাটা বলেন তাঁরা সভ্য, ভদ্র–তাঁদের পক্ষে এ রকমই বলা উচিত। কিন্তু আমি অতটা মার্জিত ভাষা ব্যবহার করিনা। আমি স্পষ্ট কথা ৰলি। তাই আমি বলছি যে মানুষের কল্যাণের ভাবনা 'রেলিজন' জিনিসটার পেছনে যতটা ছিল তার চেয়ে অধিক ছিল দলবাজী করা। তাঁদের যদি মানুষের কল্যাণের ব্রত থাকত তা হলে তাঁরা মিথ্যাচারিতার অপবাদে গ্রস্ত হতেন না। আমি কারও মনে আঘাত দিই না বা দেৰ না, কিন্তু স্পষ্ট ভাষাতেই ৰলৰ, অনেক ধর্মশাস্ত্রেই এমন সব কথা রয়েছে যেগুলো যুক্তি গ্রাহ্য নয়, যেগুলো মানবিকতার কষ্টিপাথরে ঘসলে বাতিল হয়ে যাবে, খারিজ হয়ে যাবে। সুতরাং মানুষের কল্যাণের জন্যে যদি কিছু করতে হয় তাহলে তাকে সংশ্লেষণের পথে নিয়ে যেতে হবে, বিশ্লেষণের পথে নয়। 'তোমার ঈশ্বরই ঈশ্বর..... তুমি ঈশ্বরের বরপুত্র আর বাকীরা নরকের আগুনে জ্বলে–মরবে'–এ ধরণের কথা প্রচার করে মানুষের মধ্যে একতা আনা যায় না। মানুষের সত্তাটা অবশ্যই দেশ–কাল–পাত্রের মধ্যে, ও এই দেশ–কাল–পাত্রের মধ্যে থেকেই তাকে দেশাতীত কালাতীত, পাত্রাতীত হৰার প্রয়াসে রত হতে হবে, আর তা' হতে গেলে সীমার গণ্ডী ছেড়ে আসীমের দিকে যেতেই হবে।

এক অসীম কোন সত্তা, এক সংশ্লেষণাত্মক সত্তার পথে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাই সাহিত্যিক বিচারে বলতে হয় মানুষকে মিষ্টিব্বাদের পথ নিতে হৰে অর্থাৎ সীমার বন্ধন থেকে অসীমের পথে ছুটে যেতে হবে, তা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

এখন কিন্তু তা' করা হচ্ছে না। সীমাৰদ্ধ মানুষ নিজেকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমায় বেঁধে ফেলছে যার ফলে বিভিন্ন ধরণের 'ইজম্' প্রশ্রয় পাচ্ছে। এক একটা বিশেষ এলাকার বিশেষ দেশে বসবাসকারী মানুষ এক একটা বিশেষ পরিচিতি বহন করে চলেছে। শুধু যে বহন করে চলেছে তাই নয়, অন্য পরিচিতি বহনকারী মানুষকে ঠিক আপন বলে ভাবতে পারছে না আর ভাবতে না পারার জন্যে যতদিন না সে সংশ্লেষণাত্মক পথ নিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মানুষের 'শান্তি', 'শান্তি' বলে চীৎকার করা একটা বিলাসিতা মাত্র। আসলে গোড়ার দিকটা কেটে আগার দিকে যদি জল ঢালা হয় তাতে কোন লাভ হয় না। মানুষের যেটা মৌল একতা তার ওপর জোর দিতে হবে, ও সেটাই সম্পূর্ণভাবে সংশ্লেষণের পথ, বিশ্লেষণের পথ নয়। মানুষের উচিত হচ্ছে যে উন্নততর ভাব গ্রহণ করে এগিয়ে চলা। যখন সে অনেককে এক করতে চেষ্টা করবে তখন এই অনেকের প্রাণীন সম্পদের সঙ্গে তাকে পরিচিত হতে হবে, সম্যভাবে। সেই প্রাণীন সম্পদের সম্যক্ স্ফুরণের জন্যে

ও এই স্ফুরণের ভেতর দিয়েই এই স্ফূর্ত প্রাণীনতাই তাকে সংশ্লেষণের দিকে নিয়ে যাবে। তাই তাকে অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক কিছুর চর্চাও করতে হবে ও সব সময় লক্ষ্য থাকবে–সবাইকে নিয়ে একে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এক প্লাটফর্মে এনে ফেলবে সবাইকে ও এটা করতে গেলে তাকে চিন্তাজগতে এগিয়ে যেতে হবে। তাই তো চিন্তাজগতের অভিব্যক্তি হিসেবে ভাষাকেও উন্নত করতে হবে।

আজ পৃথিবীর মানুষের ভাষাগত দৈন্য রয়েছে, শব্দসম্ভার (vocabulary) অত্যন্ত সীমিত। জার্মান, ইংরেজ ও সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গ–প্রত্যয় যুক্ত করে পাঁচ লাখের বেশী শব্দ পাই বটে কিন্তু অধিকাংশ ভাষা এখনও দরিদ্র। তাদের শব্দ সম্ভার অত্যন্ত নগণ্য। আমরা সেদিকে নজর দিচ্ছি না। যদি নজর দিই তাহলে ভাবের স্ফুরণ বেশী হবে ও স্ফুরণ বেশী হলে আমরা সবাইকে একের দিকে নিয়েও যেতে পারব। আমাদের ভারতের ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বাদিক শব্দসম্ভার রয়েছে বাংলা ভাষায়। সেই বাংলা ভাষাতেও রয়েছে এক লাখ পঁচিশ হাজারের মত শব্দ। ভারতের শব্দসম্ভারে দ্বিতীয় সমৃদ্ধ ভাষা হচ্ছে গুজরাতী। তাতে শব্দসংখ্যা বিরানব্বই হাজার অথচ সবচেয়ে উন্নত স্বভাবের উন্নত প্রজাতির বানরের (ape) শব্দ আটশ'র মত আর সবচেয়ে অনুন্নত প্রজাতির মানুষের শব্দসংখ্যা নয় শ'র মত। অর্থাৎ শব্দসম্ভারের দিক দিয়ে

বানরে মানুষে তফাৎকতটুকু। কিছুই নেই বললেই চলে। অথচ যে সমস্ত মানুষের নয় শ'র মত শব্দসম্ভার আমরা তাদেরকে টেনে আনতে পারিনি। পারিনি তার কারণ আমরা এদের দিকে চাইনি। যা চাইনি তার ফল আজ আমরা ভোগ করছি। আজ মানুষে মানুষে অবিশ্বাস।

তাই উচিত হচ্ছে যাদের শব্দসম্ভার বেশী তাদের আরও এগিয়ে আসতে হবে যাদের শব্দসম্ভার কম তাদের সাহায্যার্থে ও তার ফলে তারা আরও মুখর হয়ে উঠবে। মুখ ফুটে তাদের ভাষা বেরুবে, সেটা আমাদেরই করতে হবে। আমরা তা' করিনি অর্থাৎ অণুমানসের শাশ্বত ক্রমবর্ধমান পরিধিকে আমরা এতদিন ধরে শ্রেয়ের কাজে লাগাইনি, প্রেয়ের কাজে লাগিয়ে এসেছি। যেহেতু বিশ্লেষণের পথ নেওয়া হয়েছিল, সেইহেতু মানুষের মানবিক শাস্ত্রগুলো যেভাবে এগোনো উচিত ছিল সেভাবে এগোতে পারেনি। যেমন আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় কম এগিয়েছি। এখনো মানুষ বহু পুরাতন লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। এখনো বহুশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এখনো বিভিন্ন ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ইত্যাদি পড়বার বা পড়াবার উপযুক্ত পদ্ধতি মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি। অথচ মনীষা এগিয়ে চলেছে ঠিকই। এটা গৌরবের কথা নয়, বরং একান্তই অগৌরবের কথা।

লৌকিক বিজ্ঞান বা সায়েন্স-এর ক্ষেত্রে আমরা কতটুকুই বা এগিয়েছি! আমরা যতটুকু এগিয়েছি সেটা যতটা কল্যাণের কাজে লাগিয়েছি তার চেয়ে বেশী অকল্যাণের কাজে লাগিয়েছি। যার ফলে আজকের জড় বিজ্ঞানী সাধারণ মানুষের কাছে ভয়ের পাত্র, না-জানি কৰে কী ধরণের ৰোমা আবিষ্কার করে ফেলে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেটা খুৰই উন্নত জিনিস-বৈবহারিক মনস্তত্ত্ব, সেটার চর্চা বড় একটা করিই না, যার ফলে মানসিক ভারসাম্যের অভাবে আজকের পৃথিবীতে অধিকাংশ দেশে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীতে যে উন্মাদের সংখ্যা বেড়েছে তারও আমরা ঠিকমত চিকিৎসা করতে পারছি না।

মনস্তত্ত্বের বৈবহারিক দিকে আমরা নজর দিতে পারিনি। তারও কারণ মানুষের প্রতি ভালবাসার অভাব। আমরা বিশ্লেষণের পথ নিয়েছি, সংশ্লেষণের পথ নিইনি। এই মানব সভ্যতার দীর্ঘ পনের হাজার বছর ধরে আমরা মধ্যে মধ্যে খুবই কম সময়ে সংশ্লেষণের পথ বেছে নিয়েছি। অধিকাংশ সময়েই বিশ্লেষণের পথে চলে একটা সুন্দর সমাজ গড়ৰার বিরাট সম্ভাবনাকে হেলায় হারিয়েছি। সহজাত বৃত্তি হিসেৰে মানুষ ব্যষ্টি জগতে, বহির্জগতে, ভাব জগতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সূক্ষ্ম তা' ভালবাসে, তার চর্চা ভালবাসে, ভালৰাসাটাই নন্দন বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। অথচ আমরা বিভিন মতাদর্শের ছাপ মেরে এই নন্দন বিজ্ঞানে◌েকও ছিন্ন ভিন্ন

করে দিয়েছি। অথচ এই নন্দন বিজ্ঞানকেই আজকের মানুষের এই উন্নত মনীষার দ্বারা কত ভাল কাজে লাগাতে পারতুম। আর মূলতঃ এই নন্দন বিজ্ঞানকেই কেন্দ্র করে মানুষকে সংশ্লেষণের পথে নিয়ে যেতে পারতুম, যা আমরা করিনি।

আমি ৰলৰ আজকের মানুষ যে মনীষায় উন্নত, যার আয়তক্ষেত্র ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, সে নিজেই তা উপলব্ধি করছে, তার উচিত হৰে প্রথম ধাপেই নন্দন বিজ্ঞানকে উন্নত করে তোলা। একদিকে নন্দন বিজ্ঞানকে উন্নত করে তোলা, আর অন্যদিকে নিরলস তথা নিষ্পক্ষ জ্ঞানচর্চার দ্বারা সেই নন্দন বিজ্ঞানকেই সাহায্য করে দেওয়া। নন্দন বিজ্ঞান মানুষকে, স্থূল পৃথিবীকে ধূলির ধরণী থেকে ওপরে তুলে সূক্ষ্মতর লোকের আস্বাদ পাইয়ে দেয়। তাই নন্দন বিজ্ঞানকে অবশ্যই সর্বতোভাবে সর্ব প্রচেষ্টায় আরও এগিয়ে যেতে হৰে যা আজকের মানুষের পক্ষে মোটেই শক্ত কাজ নয়। কারণ আগেই বলেছি মানুষের বৈদুষ্যের, মনীষার পরিধি বেড়ে চলেছে, মানুষের মনীষার আয়তক্ষেত্র ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এ সময়ে মানুষ অতি সহজে বড় বড় কাজ করে ফেলতে পারবে। স্থূল জগতে ও মানসিক জগতেও এই নন্দন বিজ্ঞানের চর্চাকে ঠিক পাশে থেকে সাহায্য করবে তার বৌদ্ধিক চর্চা।

বিভিন্ন ধরণের মানবিক শাস্ত্রের চর্চা নিষ্পক্ষ ভাবে করা হোক ও সেই চর্চার ফলশ্রুতিকে নন্দন বিজ্ঞানের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হোক। মানুষ দ্রুত এগিয়ে যাবে। আজ রাষ্ট্রে–রাষ্ট্রে, সমাজে–সমাজে, গোষ্ঠীতে–গোষ্ঠীতে যে হানাহানি, তা অত্যল্প কালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মানুষের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। মানুষকে কেবল দৃঢ় পদবিক্ষেপে লক্ষ্যকে সামনে রেখে–সংশ্লেষণাত্মক লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলতে হবে। 'চরৈবেতি চরৈবেতি'–এটাই হোক্ আজকের মানুষের মূলমন্ত্র।

(সন্ধ্যাবেলা, কলিকাতা, ১৬ই জুন ৭৯)

('অভিমত' ৪র্থ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত)

বাস্তবিকতা ও ৰৌদ্ধিকতা

আজকের আলোচ্য বিষয়: 'বাস্তবিকতা ও ৰৌদ্ধিকতা'। আমরা কখনো কখনো কথায় কথায় বলে থাকি যে এটা হল বাস্তবিকতা বা রীয়্যালিটি, এটা ম্যাটার, এটা এ্যাবসট্র্যাক্ট। এ

সূচীপত্র

ধরণের আরো কত কী বলে থাকি। এখন দেখা যাক্, প্রকৃতপক্ষে বাস্তবিকতা (reality) জিনিসটাই বা কী, আর বৌদ্ধিকতা (intellectuality) জিনিসটাই বা কী?

মানুষে ৰলে, 'He is highly intellectual'-মানুষটা দারুণ ৰৌদ্ধিকতাসম্পন্ন। বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে এ ধরণের একটা কথা উচ্চারিত হয়ে থাকে। প্রথমে আমরা আলোচনা করৰ 'ৰাস্তবিকতা' নিয়ে। মানুষ নিজের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেটা আহরণ করে তাই হল ৰৌদ্ধিকতা। যে জিনিসটা আমি নিজের চোখে দেখেছি সেটা হল ৰাস্তবিকতা। মানুষ জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফৎ বস্তুকে কীভাবে পেয়ে থাকে! শব্দ–স্পর্শ–রূপ–রস–গন্ধ যে কোন তন্মাত্রই হোক না কেন, ভিন্ন ভিন্ন তারঙ্গিক স্পন্দনের মাধ্যমে এই জাগতিক তন্মাত্রগুলো ইন্দ্রিয়–দ্বারে পৌঁছে যায়। এই যে তরঙ্গ, এই যে স্পান্দনিক অভিব্যক্তি এরা কেউই সরলরৈখিক নয়। These movements are not straight; but they are of systaltic order. In every phase there is pulsation, there is systaltion. প্রতিটি স্পান্দনিক অভিব্যক্তি হল সংকোচ–বিকাশী। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু গ্রহণ বা বর্জন করি তা সমস্তই সংকোচ–বিকাশী ভাবের দ্বারা হয়ে থাকে। প্রতিটি তারঙ্গিক অভিব্যক্তি নাস্তি–অস্তি ভাবের দ্বারা বিধৃত। যখন সে 'অস্তি' ভাৰ থেকে কাজ করে চলেছে তখন আমরা তাকে অভিব্যক্তির মধ্যে পাই। When

the action is there, when the object is there, we observe it, we absorb it and in the pausephase we neither observe it nor absorb it. যখন তাকে পেয়ে যাই তখন তাকে আত্মসাৎ করে নিই। যেমন ধরো, একটা হাতী বা উটকে দেখছি। যখন কোন জিনিসকে পেয়ে যাচ্ছি, মানে বস্তুটাকে পুরোপুরি পাচ্ছি না অর্থাৎ সেটা একবার আসছে আবার চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ এ পর্যন্ত যা কিছু এসে গেল তা সবের সমষ্টি নিয়ে বলতে পারি আমি কী দেখেছি।

মানুষের যে মনটা রয়েছে তার মূলগত স্বভাবই হল কোন কিছু পাওয়া অর্থাৎ এর স্বভাবটা হল সাধারণতঃ ধনাত্মক অর্থাৎ কিছু দেখৰ, কিছু স্পর্শ করৰ, কিছু আস্বাদন করৰ–এই ধরণের একটা Positive tendency ৰা ধনাত্মক প্রবণতা রয়ে গেছে। তাই অভিব্যক্তির পর্যায়ে আমরা খণ্ড খণ্ড বিকাশ দেখতে পাই। সেই খণ্ড খণ্ড বিকাশগুলোকে সমষ্টীকৃত করে আমরা বলি যে অমুকটা দেখেছি, অমুকটা আঘ্রাণ নিয়েছি ইত্যাদি। তেমনি মনের ভাবনা যদি ঋণাত্মক হত তাহলে সংকোচধর্মী সমস্ত স্তরগুলোকে সমষ্টীকৃত করে আমরা বলি আমরা হাতী বা উট দেখিনি। এইভাবে মনের মধ্যে রয়েছে একটা ধনাত্মক ভাবনা, আরেকটা ঋণাত্মক ভাবনা। এই ধনাত্মক ভাবনা থেকে আমরা কোন কিছু দেখি বা স্পর্শ

করি বা আস্বাদন করি। আবার ঋণাত্মক ভাবনার জন্যেই আমরা কোন কিছু দেখি না বা স্পর্শ করি না।

আমরা যাকে বাস্তবিকতা ৰলি আসলে তার দু'টো বিভাজন রয়েছে–একটা ধনাত্মক, অপরটা ঋণাত্মক অর্থাৎ দ্বৈতভাব; আর এই দ্বৈতভাবাত্মক হওয়ায় তা চরম নয়। তার অস্তিত্বও সিদ্ধ হয় না। তাহলে আমরা যাকে বাস্তবিকতা বলি আসলে তা বাস্তবিকতা নয়। মনের মধ্যে একটা ধনাত্মক ভাবনা থাকায় মন শুধু ভেৰে নেয় যে আমি ৰাস্তৰ জগৎটা দেখছি।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা এসে যায়। সেটা হ'ল–এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা এটাও তো ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। ধরো, তুমি রাতের বেলায় বালুচর দেখছ। দূর থেকে দেখে কেউ সেটাকে জল বলে ধরে নিতে পারে, কেউ নদী ৰলে, কেউ বা করোগেটেড টিন শীঢ় বলে মনে করতে পারে। এক্ষেত্রে এটা হল দৃষ্টি–বিভ্রম বা দৃষ্টি–ভুল। ব্যাপারটার এখানেই শেষ নয়। এক একজন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার প্রকারভেদ রয়েছে। বাস্তবিকতার সর্বজনগ্রাহ্য কোন মান (Recognised standard) নেই। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের একটা বিশেষ সীমা রয়েছে। প্রতিটি ইন্দ্রিয় একটি নির্দিষ্ট সীমা বা এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করে যায়। কোথাও কোথাও কোন

বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা, সূক্ষ্ম যন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই সমস্ত বস্তুকে ধরে ফেলি। যা সহজভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা সীমার মধ্যে আসে না। বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের দ্বারা (Radio magnetic wave) আমরা সেটা ধরে ফেলি। একে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা কী করে বলতে পারি? বলতে পারি না। এজন্যে যাকে আমরা স্থূল বাস্তবিকতা বলি, স্থূল তথ্য বলি যার ওপর ভিত্তি করে বস্তুতান্ত্রিকতা (Materialism) দাঁড়িয়ে আছে তার প্রকৃত ভিত্তি নেই। এজন্যে তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিকতা যেটা তথাকথিত বাস্তবিকতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই বাস্তবিকতাটাই স্বয়ং ত্রুটিপূর্ণ তথা সন্দেহ ও সংশয়াচ্ছন্ন, যার অর্থ পরিচ্ছন্ন নয়। যাতে দ্বৈতভাব রয়েছে তাকে সত্য বলি কী করে?

এখন যাকে আমরা বৌদ্ধিকতা বলি তার ব্যাপারটি কী? চৈত্তিক তরঙ্গ ধারাপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে। সেখানেও উহ ও অবোহ রয়েছে, সেখানেও গতি–অগতি রয়েছে, সংকোচ–বিকাশিত্ব রয়েছে। এই জন্যে সেও কখনও কখনও মনের মধ্যে আসে,আবার কখনও বা আসে না। কিন্তু মনেও এক ধনাত্মক ভাবনা থাকার ফলে যেটা মনের মাঝখানে এসে যায় সেটাকে আমরা একত্রিত করে ফেলি আর বলি যে আমি মনে মনে একটি হাতী দেখেছি। যদি ধনাত্মক ভাবনা না থাকে, ঋণাত্মক ভাবনা থাকে তখন কী হবে? তখন মনে মনে হাতী

তৈরী করে নিলেও আমরা হাতী দেখব না। কোন কিছুই দেখৱ না। হয়তো বা মনে মনে হাতীর চিন্তা করছি, তবুও মনের মধ্যে হাতী দেখছি না। কেবল এতটুকুই নয়। মনে এই ধরণের ত্রুটি থাকার ফলে কখনও কখনও ধনাত্মক দৃষ্টিভ্রম (Positive halucination) বা ঋণাত্মক দৃষ্টিভ্রম (Negative halucination) দেখে থাকি। ৰাস্তৱে আমরা মনে মনে যেটা চিন্তা করি সেখানেও কখনও ধনাত্মক দৃষ্টিভ্রম, কখনও বা ঋণাত্মক দৃষ্টিভ্রম হয়ে থাকে। এই ধরণের ঋণাত্মক দৃষ্টিভ্রম অথবা ধনাত্মক দৃষ্টিভ্রম হতে থাকে ৰলে ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা যে ধরণের চিন্তা-ভাবনা করে সেগুলো ষোল আনা ত্রুটিপূর্ণ। আর সেক্ষেত্রে যে দ্বিধা বা সংশয়-সন্দেহ, তা তো থাকৱেই। এই জন্যে বৌদ্ধিকতাও একটা নিরাধার জিনিস (Intellectuality is also baseless because the very movement of the ectoplasm is baseless). চৈত্তিক গতি যেখানে নিরাধার তাই ৰৌদ্ধিক অসম্পন্ন মানুষেরা ভাবে, "আমি সাধারণ মানুষ নই। আমি এটা করতে পারি, আমি ওটা করেছি, আমি অনেক কিছুই জানি", তার একথা মনে রাখা উচিত যে তার এ ধরণের ভাবনা একান্তই ত্রুটিপূর্ণ। কেন না তাঁর ভাবনা তরঙ্গেও তো উহ-অবোহ রয়েছে। চিন্তার মধ্যে কোথাও গতি (speed), কোথাও অগতি রয়েছে। যদি সে বিশ্রামের সমষ্টিকে নেয় তাহলে তার বৌদ্ধিকতাও

নিরাধার হয়ে পড়ে। এটা কেবল ভাবনাত্মক তরঙ্গের ওপরেই আধারিত অর্থাৎ ভাবনাত্মক তরঙ্গের ওপরে নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ ভাবনাত্মক তরঙ্গেই ত্রুটি রয়েছে। এটাই যে সব চেয়ে বড় কথা তা নয়। কখনও কখনও এদের মনের যে objectivated psychic chamber অর্থাৎ বিষয়ীভূত মানসিক প্রকোষ্ঠ তার ওপর Subjectivated Compartment-বা বিষয়ী মানসিক প্রকোষ্ঠের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এদের ভাবনা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন বস্তু রয়েছে, তার সম্বন্ধে এরা ভেবে বসে যে বস্তুটা আসলে নেই। আর যে বস্তুটা নেই তার সম্বন্ধে ভাবে যে বস্তুটা রয়েছে। এধরণের বৌদ্ধিকতায়ও দ্বিত্বভাবে বা ambiguity থাকে। তাহলে দেখছি বাস্তবিকতাতেও দ্বিত্বভাব রয়েছে, ৰৌদ্ধিকতাতেও দ্বিত্বভাব রয়েছে। মনের মধ্যে এক ধনাত্মক ভাবনা থাকায় ভাবে সে এ সব কিছুই ভাবছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাস্তবিকতা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবিকতা নয়। আর বৌদ্ধিকতাও আসলে বাস্তবিকতা নয়। তাহলে কী বলা উচিত? হ্যাঁ, এটাও বলা যেতে পারে যে এই পৃথিবীতে বাস্তবিকতাও নেই, ৰৌদ্ধিকতাও নেই। তাহলে জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান মানুষেরা কী করবে? এই যে সংকোচ–বিকাশী ক্রম, এই যে গতি–অগতি ধর্মী (pulsative order) ব্যবস্থা এর বাইরেও যদি কোন কিছু থেকে থাকে মানুষকে তার খোঁজ করতে হবে। সেই জিনিসটা কী? সেই জিনিসটা হ'ল

আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিক প্রবাহে সংকোচ-বিকাশিত্ব নেই। আধ্যাত্মিকতার গতি হ'ল সরলরৈখিক। সেটা হ'ল সহজ ও সরল। আর তার ফলে তার মধ্যে ধনাত্মিকতা বা ঋণাত্মিকতার বক্রতা নেই। তাহলে বোঝবার সুবিধার জন্যে আমরা তাকে বলতে পারি-চরম ধনাত্মিকা। আর এর যেটা শেষ প্রান্ত, যেখানে মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, বুদ্ধিজীবীর বা অবুদ্ধিজীবীর সকলের অস্তিত্বের যেখানে সূত্রপাত সেই বিন্দুটাকে বলতে পারি চরম ঋণাত্মিকা। অর্থাৎ চরম ঋণাত্মিকা থেকে একটা সরলরেখা টানলে জীব সোজা এগিয়ে চলৰে চরম ধনাত্মিকার দিকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার দিকে। এটাই হল খাঁটি পথ। বাস্তবিকতাও নেই, বৌদ্ধিকতাও নেই। সব শেষে থেকে যায় কেবল একটাই জিনিস- আধ্যাত্মিকতা। ব্যক্ত জগতের অস্তিত্ব চরম বা পরম নয়! মানসিক জগতের সত্তাও চরম বা পরম নয়। কেবল আধ্যাত্মিকতার রয়েছে চরম তথা পরম স্তর। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত এই আধ্যাত্মিকতার খোঁজ করা। আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসেরই খোঁজ করা মানুষের পক্ষে চরম মূঢ়তা তথা মূর্খতা।

(বারাণসী, ১৭ই মে, ১৯৮০)

('অভিমত' ৫ম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত)

সূচীপত্র

মানুষের আদর্শে

সংস্কৃত 'কুলাল'-এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে শিল্পগত বা ভাবগত বা আদর্শগত ব্যাপারে যাঁর বৈদন্ধ্যিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে ও যিনি তদনুযায়ী পরিকল্পনা করে এগিয়ে চলেছেন। এই ধরণের স্বাতন্ত্র্য বা পরিকল্পনা মুখরতায় ভীত হয়ে অনেকেই, বিশেষ করে বিরুদ্ধবাদী মতবাদের বাহকেরা অনেক সময় অথবা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন ও কুলালের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। এ ব্যাপারে বিচারকের বা সমালোচকের তটস্থ বুদ্ধি নিয়েই গবেষণা চালাতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে উদগ্র কুলাল-চেতনা এখানকার জনমতকে আলোড়িত, আন্দোলিত ও প্রমথিত করেছিল সেটা ছিল রাজনৈতিক জগতে সুভাষ বোসের কৌলালিক ভূমিকা। যাঁরা বিচার বিমর্ষে নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে ভালবাসেন তাঁদের আজ জিনিসটা অনুধাবন করবার দিন এসেছে। সেকালের ভারতের নেতৃবর্গের প্রতি তিলমাত্র অশ্রদ্ধা না জানিয়েই বলতে পারি, তাঁদের মধ্যে সমাজ-চেতনা ও বৈপ্লবিক চেতনার অভাব তো ছিলই, কোন দৃঢ়নিবদ্ধ অর্থনৈতিক চেতনা বা সংরচনাগত কুলালত্ব ছিল না। তাঁরা

চেয়েছিলেন, বিভিন্নভাবে জনমত গড়ে তুলে ব্রিটিশকে তিক্ত–বিরক্ত করে তাদের হাত থেকে স্বাধীনতা রূপী ফসলটি আলতোভাবে কাস্তে চালিয়েই তুলে নিয়ে মরাইজাত করে নেওয়া। এতে সাপও মরবে না.......লাঠিও ভাঙ্গবে না। যাঁরা ভাবেন, অহিংসানীতি কোন নীতিই নয়, ... অনন্যোপায় মানুষের একটি রাজনৈতিক চাল, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে সেদিনের নেতাদের এই মানসিকতা ঠিক অনন্যোপায় অবস্থা–প্রসূত ছিল না। জনগণের ওপর তাঁদের যে প্রভাব ছিল সেই প্রভাবের সাহায্যে তারা গণচেতনাকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে স্বাধীনতা হাসিল করার চেষ্টা করতে পারতেন। একথা অনস্বীকার্য মহাত্মা গান্ধী গণজাগরণ আনিয়েছিলেন কিন্তু উদ্বুদ্ধ গণচেতনাকে সংগ্রামের পথে পরিচালনা করেন নি। বলতে পারা যায় যে তাঁদের সকল নীতির মৌলিকত্ব এক ধরণের নেতিবাদে ও সংগ্রামহীনতাতেই আবর্তিত ছিল। সুভাষ বোসের কুলালত্ব ভিন্নধর্মী। তিনি চেয়েছিলেন অবস্থার সুযোগ নিয়ে, আরও স্পষ্ট বাংলায় ঝোপ বুঝে কোপ মেরে প্রতিপক্ষকে বিনাশ করে স্বাধীনতা হাসিল করা। এখানেই ছিল তাঁর তৎকালীন নেতৃত্বের সঙ্গে কুলালত্বগত বিরোধ বা বৈষম্য।

গান্ধীবাদের তথাকথিত অহিংসা মন্ত্রে সরলতার ষোল আনা অভাব না থাকলেও কিছুটা অভাব ছিল। বৈয়স্টিক জীবনে গান্ধীজী যতটা সরল ছিলেন হয়তো বা তাঁর

অনুগামীরা ততটা ছিলেন না। ফলে এই কুলালতত্বগত ভেদটা লোকলোচনে আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস সভাপতি পদে (কংগ্রেস সভাপতিকে সেকালে 'রাষ্ট্রপতি' বলা হত। বলাটা একটু হাস্যকর নয় কি! রাষ্ট্রই নেই, তার আবার রাষ্ট্রপতি।....মাথা নেই, তার মাথার মুকুট!) পট্টভি সীতারামাইয়ার সঙ্গে সুভাষ ৰোসের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল তা ছিল এই কুলালীত্বের প্রতিদ্বন্দ্দিতা। গান্ধিজী সরল মানুষ ছিলেন। তাই সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষ বোসের জয়ে তথা সীতারামাইয়ার পরাজয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই ৰলেছিলেন সীতারামাইয়ার পরাজয় আমার পরাজয় (Sitaramaiya's defeat is my defeat)। সুভাষ ৰোস গান্ধীজীর সঙ্গে এই কুলালত্বগত বিষমতাকে কখনও বৈয়ষ্টিক স্তরে নেৰে আসতে দেননি। গান্ধীজীও তা' দেননি। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু উষ্চাশাবাদী (ambitious) নেতা তা' দিয়েছিলেন, আর তাঁদের এই বৈয়স্টিক গরলের অভিপ্রকাশ তথা অহিংসার অজগর সাপ সুভাষ বোসের দেশত্যাগের অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ। রাজনীতির মর্মমূলে প্রবেশ না করেও ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়ে অথবা ভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যারা সুভাষ বোসকে কুলঘ্ন বা ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক (misguided Patriot) বলত তারা হয়তো এটুকু খতিয়েও দেখেনি যে দৈশিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে অর্থনৈতিক মতবাদে ভিন্নমেরু

হওয়া সত্ত্বেও রুশের সঙ্গে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যদি এক পঙক্তিতে বসে ফলার করতে পারে তাহলে একটি সামরিক শক্তিবিহীন স্বাধীনতাকামী দেশের পক্ষে অক্ষশক্তি (জার্মানী, জাপান ও ইতালী) সহায়তা নিয়ে সুভাষৰোস এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ করেছিলেন! আসল যুদ্ধটা তো ছিল দু'টি সাম্রাজ্যবাদী তথা সম্প্রসারণবাদী শক্তির মধ্যে। কোন পক্ষই গঙ্গাজলে ধোয়া তাঁৰা তুলসীপাতা ছিল না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সুভাষ ৰোস যে পক্ষেই যোগদান করতেন প্রতিপক্ষ তাঁকে নিন্দা করতই।

যাঁরা সুভাষ বোসের কর্মপন্থা বা ভাব-সরণীকে সুভাষবাদ বলেন তাঁরা ভুল করেন। 'সুভাষবাদ' বলে কোন মতবাদ নেই। সুভাষ বোস দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন আর তা চেয়েছিলেন উদগ্রভাবেই। তাই তিনি এ ব্যাপারে প্রকৃত সুযোগসন্ধানীর ভূমিকাতেই নেৰেছিলেন। এতে কেউ যদি তাঁর নিন্দা করে তাহলে বুঝতে হৰে সে রাজনৈতিক জীবনে গায়ে আঁচড়টি না লাগিয়েই সস্তায় কিস্তীমাৎ করতে চেয়েছিল।

মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া) যদি তাদের রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে সুভাষ বোসকে নিন্দা করে থেকে থাকে বা তোজোকে যুদ্ধাপরাধী ৰলে ঘোষণা করে শাস্তি দিয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কুলালত্বের অভিধারক হওয়া

ত্বেও অন্য কোন ভারতবাসীর পক্ষে কি তাদের আবাজে আবাজ মিলিয়ে সুভাষ বোসের বিরোধিতা করা সেই সময় সঙ্গত কাজ হয়েছিল? আসল ব্যাপারটা এই যে কুলালত্বগত প্রচণ্ড রকমের ভেদ থাকলে মানুষের স্বচ্ছবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঘোলা বুদ্ধি নিয়ে সে সমাজ জীবনের প্রতিটি ধারোর্মিকে ঘোলাটে করে দেয়, যা উন্নত ভাবনার দ্যোতক নয়। সেটা স্বচ্ছ মানসিকতার মেরুগত পরিপন্থী ও ভৌমভাবুকতার (geo-senti- ment) জঘন্যতম ফলশ্রুতি।

(গল্প সঞ্চয়ন, ৯ম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত)

মাইক্রোবাইটাম ও মানব সমাজের ওপর তার প্রভাব

মাইক্রোবাইটাম হ'ল জৈব–জীবনের গূঢ় রহস্য। ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক তিনটে স্তরেই ব্যাপক প্রগতির চাবিকাঠি এই মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বেই নিহিত। বুদ্ধিমান মানুষ এই মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বকে কোন মতেই উপেক্ষা বা অবহেলা

করবেন না। যত বেশী ও যথাযথ ভাবে এই মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটানো যায় ততই মানব সমাজের কল্যাণ। এর আবিষ্কারের ফলে এযাবৎ প্রচলিত বহু রাসায়নিক রচনাতত্ত্বের (ফর্মূলা) যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য ও এর ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ্বের বহু জৈব ও অজৈব সংরচনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। বিশ্বের মানুষ এই তত্ত্বকে জানবার জন্যে ও এই তত্ত্বের বৈবহারিক প্রয়োগের দ্বারা বিশ্বে সর্বাত্মক পরিবর্তন আনবার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

এই যে বললুম, মাইক্রোবাইটামকে বৈবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে বহু রাসায়নিক ফর্মুলার পরিবর্তন ঘটবে–সেটা কী রকম? উত্তরে বলৰ যে এযাবৎ জড়বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণা হ'ল এই যে, প্রাণের উন্মেষের জন্যে অঙ্গারাণু (কার্বন এ্যাটম) অপরিহার্য কিন্তু মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার পর মানুষ তা আর মেনে নেবে না। তখন অভ্যন্তরীণ সংরচনার মৌল উপাদানের ব্যাখ্যার জন্যে মানুষ আজকের প্রচলিত ফর্মুলার চেয়েও সূক্ষ্মতর ফর্মুলা পেয়ে যাবে। জিনিসটা আর একটু খোলসা করে বলি। যেমন ধরো 'হীরাকষ' জিনিসটা (Green vitriol)। 'হীরাকষের', যার কথ্য ইংরেজী নাম 'গ্রীণ বিট্রিয়ল", আর রাসায়নিক নাম ফেরাস্

সালফেট্, তার আজকের সর্বজনস্বীকৃত ফর্মুলা হ'ল $FeSO4.7H_2O$; কিন্তু মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার পর কোন রসায়ন–বিজ্ঞানী তখন তাঁর এই ফর্মুলা ব্যবহার না করে বলৰেন হয়তো FeSO4.7H2O (group A MV 20 millions)। আবার যেমন ধরো তুঁতে, কপার সালফেট (blue vitriol), যার বর্তম রাসায়নিক ফর্মুলা $CuSO4.5H_2O$; কিন্তু মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত কোন রসায়ন বিজ্ঞানী ফর্মুলা দেবেন $CuSO4.5H_2O$ (Group B MV 20 millions)। অর্থাৎ জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এই বস্তুর আভ্যন্তরীণ সংরচনার ফর্মুলা দারুণভাবে পাল্টে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে তখনকার ফর্মুলার আকার আজকের তুলনায় দীর্ঘতর হবে। তবে এ কথাও ঠিক যে তাতে জিনিসটার নাম ও তার আভ্যন্তরীণ সংরচনার কোন তারতম্য ঘটবে না। পরিবর্তন ঘটৰে কেবল ফর্মুলার ক্ষেত্রে। মাইক্রোবাইটাম যুগের বিজ্ঞানী তখন কার্বন–অণুকে প্রাণোৎর্জনের মৌল উপাদান বলে স্বীকার করবেন না। তাঁর কাছে অঙ্গারাণু হ'ল কোটি কোটি মাইক্রোবাইটামের এক সমাহৃত ঘনীভূত রূপ।

সব মাইক্রোবাইটামই এক ধরণের নয়। এদের মধ্যে যেমন বর্গগত বিভাজন থাকৰে তেমনি বর্গ অনুযায়ী গুণগত পার্থক্যও থাকৰে। আজকের প্রাণীবিজ্ঞানীর মতে জীবপঙ্কীয়

কোষ তৈরী হচ্ছে অঙ্গারাণুর সমবায়ে। কিন্তু মাইক্রোবাইটামের যুগে প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলৱেন জীবপঙ্কীয় কোষ অঙ্গারাণুর সমবায়ে উদ্ভুত নয়, –মাইক্রোবাইটামেরই সমষ্টীকৃত রূপ। আর এই জীবপঙ্কীয় কোষের মাইক্রোবাইটামের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানবদেহে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটানো যাবে। সাধারণ মানুষকেও অসাধারণত্বে উন্নীত করা যাবে। মানুষের মানস–সামর্থ্য ও গুণের উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ ঘটানো যাবে। এক কথায় বলা যেতে পারে, এই মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের মানব সমাজের বহুমুখী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। মাইক্রেবাইটাম তত্ত্বের প্রয়োগের দ্বারা মানুষের চিত্তাণবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চিত্তকৌষিক পরিবর্তন সংসাধন করা যাবে আর এইভাবে উন্নত মানব মন অনুন্নত জৈবী–সত্তাকে ও মানবশরীরকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এর ফলস্বরূপ মানুষের সামগ্রিক ব্যষ্টিত্বেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তন যেমন অন্তর্জগতে ঘটৱে তেমনি বাহ্যিক কাঠামোতেও ঘটৱে। দেহের effulgence বা জ্যোতিঃ বেড়ে যাবে। মানুষ আগের তুলনায় অধিকতর মানস–প্রধান হয়ে উঠৱে ও পরবর্তী ধাপে অধিকতর আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হবে।

কলিকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

সূচীপত্র

***   ***   ***   ***

মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের গবেষণার ফলে রাসায়নিক ফর্মুলায় কী ধরণের পরিবর্তন ঘটবে?

মাইক্রোবাইটম তত্ত্বের ব্যাপক গবেষণার ফলে রসায়ন বিদ্যার বিভিন্ন বস্তুর ফর্মুলায় বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে। রাসায়নিক গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের সময় তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছ যে একই তাপ-মাত্রা, একই বায়বীয় চাপ ও একই অবস্থা বজায় থাকলেও ফলাফল সব ক্ষেত্রে এক হয় না। এর কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন বিষয়ের স্যাম্পল্ বা নমুনায় মাইক্রোবাইটামের সংখ্যাগত পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ ধরো, ক্যালসিয়াম ফসফেটের দু'টি স্যাম্পলের একটিতে যে মাত্রায় অক্সিজেন রয়েছে, অপর স্যাম্পলটিতেও একই মাত্রায় অক্সিজেন রয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রথম স্যাম্পলটির অক্সিজেন থেকে দ্বিতীয় স্যাম্পলটির অক্সিজেন হয়ত ১০ মিলিয়ন মাইক্রোবাইটাম কম রয়েছে। স্বভাবতই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে একই ধরণের ফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং মাইক্রোবাইটামের সংখ্যাগত হ্রাস-বৃদ্ধির দরুণ বস্তুর অভ্যন্তরীণ গুণ পরিবর্তিত হবেই।

একটু খুঁটিয়ে গবেষণা করলেই এ জিনিসটা জানা যাবে। আবার ধরো ক্যালসিয়াম সালফেটের দু'টি স্যাম্পল রয়েছে। দুটোরই ফর্মুলা এক–CaSO, কিন্তু স্যাম্পল B-এর চেয়ে স্যাম্পল A-তে 20 মিলিয়ন মাইক্রোবাইটাম বেশী থাকলে সেক্ষেত্রে নূতন ফর্মুলা লিখতে হবে–CaSO, (Group A MV 20 million)। রিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফর্মুলার আকার বৃদ্ধি পাবে। আর তদনুযায়ী বিশেষ তথ্যও পাওয়া যাবে।সোডিয়াম কার্বনেটের (Na_2CO_3) ও সোডিয়াম– বাই–কার্বনেটের ($NaHCO_2$) ক্ষেত্রে এ কথাটা আরও বেশী প্রযোজ্য। বস্তুর বাহ্যিক সংরচনায় পরিবর্তন এলে তার আভ্যন্তরীণ গুণেতেও তারতম্য এসে যাবে। যেমন হাইড্রোজেন মনোক্সাইড (H_2O) থেকে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড (H_2O_2) হয়ে গেলে জিনিসটির বাহ্যিক কাঠামোয় যেমন পরিবর্তন আসবে তেমনি তাতে গুণগত পরিবর্তনও আসবে।

*** *** *** ***

অনুরূপভাবে মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের প্রয়োগের ফলে এই পৃথিবীর বাণিজ্যিক আদান–প্রদানের ক্ষেত্রে কি কোন পরিবর্তন ঘটৰে যদি ঘটে তো কেন ঘটৰে? আর যদি না ঘটে তো কেন ঘটবে না?

সূচীপত্র

এর উত্তরে বলৰ: মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের বহুল প্রয়োগের ফলে ৰাণিজ্যিক আদান–প্রদানের ক্ষেত্রেও অবশ্যই যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। যেমন ধরো, কোন একটা দেশ সোডিয়াম নাইট্রাইট বিক্রি করে মোটা টাকা রোজগার করছে। ওই সোডিয়াম নাইট্রাইট বস্তুটির অক্সিজেনে যে পরিমাণ মাইক্রোবাইটা আছে, যদি অন্য একটা দেশের কোন কারখানায় উৎপন্ন সোডিয়াম নাইট্রাইটের অক্সিজেনে মাইক্রোবাইটামের পরিমাণ কমিয়ে বা বাড়িয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দেশটির যোগান দেওয়া সোডিয়াম নাইট্রাইট আর কেউ কিনতে চাইবে না। তাই স্বভাবতই মাইক্রোবাইটামের সংখ্যাগত হ্রাস–বৃদ্ধি অনুযায়ী বস্তু–উৎপাদনের ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক আদান–প্রাদানের ধারাই বদলে যাবে।

আবার ধরো, একই বাঙলার তিন জেলার পাটের গুণগত মান পৃথক পৃথক হয়ে থাকে–যদিও ৰীজ সর্বত্র একই ধরণের! ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি ও মুর্শিদাবাদের পাটের কোয়ালিটি যে পৃথক পৃথক তা তো সবাই জানে। এক্ষেত্রে কারণ একই–মাইক্রোবাইটামের সংখ্যাগত তারতম্য। আবার ধরো আলু। একই রাসায়নিক সার (fertilizer) ব্যবহার করেও সব ক্ষেত্রে আলুর ফলন ও স্বাদ এক ধরণের হয় না। সম্ভবতঃ আলুর

ফলন ও স্বাদের ক্ষেত্রে স্থানবিশেষে এই যে পার্থক্য তার কারণ অনেকেই জানেন না। ব্যাপারটা হচ্ছে মাইক্রোবাইটাম নিয়ে। অক্সিজেনে মাইক্রোবাইটামের পরিমাণের বিভিন্নতার জন্যেই এই রকমটি হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে সোডিয়াম নাইট্রাইটের অক্সিজেন জমিতে সারের কাজ করে। সোডিয়াম নাইট্রাইটকে কথ্য ভাষায় বলে 'সোরা'। বিহারের ফল্গু নদীর চেয়ে শোণ নদী অনেক বড় আর এই দুই নদীর জলেই সোরা রয়েছে। কিন্তু শোণের সোরা থেকে ফল্গুর সোরা অধিক উৎপাদনক্ষম। তাই মোকামা টালের মাটি ফল্গু নদীর জলে প্লাবিত হওয়ার ফলে ফসলের উৎপাদন বেশী হয়। বিশ্বের সোরার বাজারে দক্ষিণ আমেরিকার চিলি রাষ্ট্রের একাধিপত্য। আমাদের ভারতে টিন ও কপারের (তাঁবা) ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু মাইক্রোবাইটামের প্রয়োগের সাহায্যে বস্তুর আভ্যন্তরীণ সংরচনার পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ধরণের প্রয়োজনীয় মৌল (element)) তৈরী করা সম্ভব হবে। অনুরূপভাবে মাইক্রোবাইটামের সাহায্যে পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রেও কৃত্রিম সংশ্লেষণ সম্ভব হবে।

এই পরিবর্তনটা আসছে বস্তুদেহের আভ্যন্তরীণ সংরচনার পরিবর্তনের ফলে। অধাতব (non-metal) পদার্থের চেয়ে ধাতব (metal) পদার্থের ক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যাবে। মানুষ উত্তরোত্তর নূতন নূতন বিস্ফোরক পদার্থের

উদ্ভাবন করে ফেলৰে। বস্তুতঃ বিস্ফোরক–প্রযুক্তির (Pyro-technology) ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন আসবে।

মাইক্রোবাইটাম তত্ব কীভাবে ঔষধ–রসায়ন (Pharmo-chemistry) ও জৈব–প্রযুক্তিবিদ্যাকে (Bio-technology) প্রভাবিত করবে?

ঔষধ–রসায়ন (Pharmo-chemistry) ও জৈব প্রযুক্তিবিদ্যায়ও (Bio-tech- nology) বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসৰে। প্রাকৃতিক নিয়মেই বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ ঔষধীয় গুণ রয়েছে। যেমন ধরো, কপার সালফেট। কপার সালফেটে রয়েছে কপার (তাঁবা), সালফার ও অক্সিজেন। এখন যদি এদের আণবিক অনুপাতের ব্যাপারে (atomic-proportion) হেরফের হয় তাহলে ওষুধে গুণগতভাবে ও কার্যকারিতার দিক থেকে পরিবর্তন এসে যাবে। তেমনি মাইক্রোবাইটামের সংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলেও বস্তুর গুণগত পরিবর্তন ঘটবে। ঔষধ–রসায়নের ব্যাপক গবেষণার ফলে আমরা জানতে পারৰ কী পরিমাণ মাইক্রোবাইটাম থাকলে ঔষধে কী ধরণের গুণ থাকবে। তদনুযায়ী বেশী কার্যকরী ওষুধের ফর্মুলা তৈরী করে নিতে পারৰ। সেইসঙ্গে পুরনো ফর্মুলা অবশ্যই খারিজ হয়ে যাবে। তাই মাইক্রোবাইটামের ব্যাপক গবেষণার ফলে ঔষধ–রসায়নের জগতেও বৈপ্লবিক

পরিবর্তন ঘটবে। কোন একটা ঔষধ, যার রাসায়নিক সংরচনা (chemical composition) এক কিন্তু দু'টো ভিন্ন কোম্পানীতে তৈরী। দেখা যায় যে একটা কোম্পানীতে তৈরী ঔষধ যেমন কার্যকরী হয়, অন্য কোম্পানীর ঔষধ তেমনটা হচ্ছে না। এর কারণ হ'ল মাইক্রোবাইটামের সংখ্যাগত ও গুণগত তারতম্য।

অনুরূপভাবে মাইক্রোবাইটাম নিয়ে গবেষণার ফলে বিস্ফোরণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি–বিদ্যার ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।

কোন বস্তুর আভ্যন্তরীণ চলমানতা বা Internal movement যেখানে বেশী সেখানে ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেড়ে যায়, যার ফলস্বরূপ বিস্ফোরণ–ক্ষমতা তীব্র হয় ও আবাজও বেশী হয়। মাইক্রোবাইটামের সক্রিয়তা আভ্যন্তরীণ চলমানতাকে (internal movement) প্রভাবিত করে। এর ফলস্বরূপ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন করার ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন আসতে বাধ্য। যেহেতু জিনিসটা গতির সঙ্গে সম্পর্কিত তাই এটা রকেটের গতিকেও প্রভাবিত করৰে।

মাইক্রোবাইটাম সম্বন্ধীয় গবেষণা কিভাবে জৈব–রসায়ন (Bio-chemistry)-কে প্রভাবিত করবে?

মাইক্রোবাইটাম সংক্রান্ত গবেষণার ফলে জৈব–রসায়নে (Bio-chemistry) ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। আভ্যন্তরীণ জীবপক্ষীয় ফর্মুলা বদলে যাৰে। জীবপক্ষের নিয়ন্ত্রণ–কেন্দ্রকেও মাইক্রোবাইটাম প্রভাবিত করবে ও তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। বস্তুর নিউক্লিয়াস অপসারণের ফলে আভ্যন্তরীণ সংরচনাতে গুণগত পরিবর্তন আসবে। এতে যেমন গ্রন্থিরস (Hormone) প্রভাবিত হৰে তেমনি বাহ্যিক শারীরিক সংরচনাতেও পরিবর্তন আনবে। সাধারণতঃ সব প্রোটোপ্লাজমের আয়ুষ্কাল একুশ দিনের মত। মাইক্রোবাইটামের প্রভাবে তাতেও তারতম্য ঘটবে। আজকের মানুষ দেখতে যেমন সেদিনের মানুষ তেমনটি থাকবে না–একটু এদিক–ওদিক হবেই।

বস্তুদেহের অভ্যন্তরে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মাইক্রোবাইটামের পারস্পরিক অবস্থান্তর ঘটিয়ে আঁবকে কি ডিমে পরিবর্তিত করা যেতে পারে?

হ্যাঁ, করা যেতে পারে। যদি আঁবের জীবপক্ষীয় কোষের nuclear ভরে (nuclear mass) পরিবর্তন ঘটানো যায় ও সংশ্লিষ্ট মাইক্রোবাইটামের সংখ্যাগত [বা] গুণগত মূল্য যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে একটি বস্তুকে অন্য বস্তুতে

রূপান্তরিত করা যেতে পারে। যেমন আঁবকে ডিমে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ছানার মধ্যে যে গুণ থাকে সেই ধরণের গুণযুক্ত ছানায় কোন শোঁয়াপোকাকে কি রূপান্তরিত করা যেতে পারে?

পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে তা অবশ্যই করা যেতে পারে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে উত্তপ্ততামান (temperature)-এর পরিবর্তন না ঘটিয়ে বায়বীয় চাপের পরিবর্তন সংসাধিত হতে পারবে। এক্ষেত্রে ক্যালরি–র (তাপ) পরিবর্তন আসবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার ফলে তাপমাত্রায়ও পরিবর্তন আসৰে।

মধুকোরক, কলিকাতা ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

গণতন্ত্রের প্রকোষ্ঠীকরণ

আজ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীতে মানব শিশুর প্রথম আবির্ভাব ঘটে কিন্তু সেদিনের মানুষ এই পৃথিবীকে আজকের মত মোটেই এতখানি নিরাপদ স্থান হিসেৰে পায়নি। প্রকৃতি সে সময় ছিল নিদারুণ নির্মম, তাই

মানুষকে এই নিষ্করুশ প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচৰার জন্যে তার যাবতীয় শক্তির প্রয়োগ করতে হয়েছিল। মানব সমাজের সেই আদিম যুগকে নাম দিতে পারি "শূদ্র যুগ”।

সংঘর্ষমুখর সেই আদিম সমাজে দৈহিক শক্তির ভূমিকাই ছিল মুখ্য। স্বভাবতই সেই প্রগৈতিহাসিক সমাজে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিই ছিল সর্বেসর্বা। নবজাত শিশুর জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক প্রাকৃতিক শক্তি তার জীবনী শক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে দাবিয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চাইত। তাই মানুষ অনুভব করল যে সেই নিদারুণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম করে টিকে থাকা অসম্ভব। তাই তারা যূথবদ্ধভাবে ৰাস করতে শুরু করল। ব্যষ্টি বিশেষের শক্তিরপ্রাধান্যের যুগে দৈহিক ৰলে ৰলীয়ান মানুষেরই সমাজে নেতৃত্বের স্থান দখল করল। এইভাবে মানব সমাজে "ক্ষত্রিয় যুগে'র সূচনা হল....রাজতন্ত্রের উদ্ভব হল। শূদ্র প্রাধান্যের যুগে মানব সমাজ সুসংহত ছিল না। রাজতন্ত্রের যুগে এক সুসংহত ও সন্নিবদ্ধ সামাজিক সংরচনা তৈরী হল। ক্ষত্রিয় যুগের পর এল বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য–এল বিপ্র যুগ। রাজতন্ত্রের যুগেই বুদ্ধিজীবীরা নিজ শক্তিকে সংহত করতে শুরু করেছিল। তাদের ৰৌদ্ধিক সামর্থ্যের প্রভাবে ও রাজতন্ত্রের আড়ালে গড়ে উঠেছিল একটা যাজক সম্প্রদায়। তাই সামাজিক ক্ষমতা এই যাজককুলের হস্তগত হয়। রাজতন্ত্র যতদিন ক্রটিমুক্ত ছিল

মানুষ তার বিরুদ্ধাচরণ করেনি কিন্তু যখন থেকে এই যাজককুল রাজতন্ত্রের আড়ালে সমাজকে শোষণ করতে শুরু করল মানুষ তাদের অপশাসন ও শোষণে অতিষ্ঠ ও অধৈর্য্য হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল ও এই বিদ্রোহ তথা বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নিল "গণতন্ত্র”।

প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতন্ত্রের অর্থ হ'ল জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কের বোটাধিকার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্যে ও বোটদাতাদের প্রভাবিত করবার জন্যে নিজ দলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত করে থাকে। এইভাবেই রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে সব কটি দলই নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। যে দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশই শিক্ষিত ও তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই প্রৰল সেদেশের জনগণের পক্ষে দল বিশেষের নির্বাচনী ইস্তাহার পড়ে ভালমন্দ বিচার করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তাঁরা মোটামুটি বুঝেই ফেলেন কোন দলের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্মসূচী জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল না পরিপন্থী। কিন্তু যে দেশের শিক্ষার মান নেই, রাজনৈতিক চেতনা নেই, সেখানে জনগণ নির্বাচনী

ইস্তাহারের যথার্থ মূল্য ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না ও একপেশে দলীয় প্রচারের ফলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন তারা এমন সব রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বোট দিয়ে থাকে, যা বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের প্রতিকূল। ফলস্বরূপ সেইসব দল ক্ষমতাসীন হয় যাদের আদর্শ ও কর্মসূচী জনস্বার্থ–বিরোধী। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বয়সের ভিত্তিতে বোটাধিকার নির্ধারিত হয়। ধর, দেশের কোন নাগরিকের বয়স একুশ হলে সে বোটাধিকার লাভ করে অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয় যে যারই বয়স একুশ সে জনসাধারণের মৌলিক সমস্যার কথা বুঝবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অনেক মানুষই একুশ বা তার ঊর্ধ্ব বয়সেও রাজনৈতিক চেতনার অভাবে জনসমস্যার ধরণ–ধারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই বোটাধিকার কখনও বয়সের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। বরং বোটাধিকার তাদেরই থাকা উচিত যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে, যাদের রাজনৈতিক চেতনা আছে। কেবল বয়সের ভিত্তিতে বোটাধিকার নির্ধারণ করা মানেই হল জনগণের সমস্যা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তাকে বোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হ'ল, আর যারা শিক্ষিত ও রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সচেতন এমন অনেক মানুষকেই বোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হ'ল

শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা এখনও প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নি। গণতন্ত্রের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি।

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় মারাত্মক ত্রুটি হ'ল এই যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণকে অযথা রাজনৈতিক নেতাদের এমন সব সুদীর্ঘ অন্তঃসারশূন্য ভাষণ শুনতে হয় যার অনেকগুলোই বিভ্রান্তিকর। বোট পাবার জন্যে নেতাদের যত্রতত্র নির্বাচনী ভাষণ দিতে হয়, এমনকি চোর–ডাকাত–প্রবঞ্চক–ধান্দাবাজদেরও খুশী করে চলতে হয় কারণ তাদের হাতেই তো রয়েছে বড় রকমের বোটাধিকার। তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে গণতন্ত্র চোর–ডাকাত–প্রতারকদের সরকার হয়ে পড়ছে। তাই সরকার চাইলেও এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে না কারণ সরকার যদি এদের দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম ৰন্ধ করতে চায় তাহলে সে বেশীদিন ক্ষমতায় টিকতে পারবে না।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এও দেখা যায় যে নির্বাচনে সর্বমোট বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কোন একটা দল শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী আসন পেল ঠিকই কিন্তু নির্বাচনে প্রদত্ত সর্বমোট বোট সংখ্যার পঞ্চাশ ভাগেরও কম পেয়েছে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেন্টকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার বলে ঘোষণা করলেও প্রকৃতপক্ষে সেই সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের

সরকার। গণতন্ত্রে যেহেতু কোন বিশেষ দলের সরকার তৈরী হয় সেই বিধান পরিষদে অন্য দল বা দলগুলোর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যদিও আইন প্রণয়নের সময় সকল রাজনৈতিক দলই অংশ গ্রহণ করে থাকে তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছাতেই বিল পাশ হয়ে থাকে। তারপর বিলটি যখন আইনের স্বীকৃতি পায় তখন সেই সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি নূতন আইনের দ্বারা উপকৃত হয়। বৃহত্তর জনগণের সেই আইন থেকে বড় রকমের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না।

গণতন্ত্রে যেহেতু এক বিশেষ দলের সরকার তৈরী হয় তাতে সরকারী কর্মচারীদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। শাসক দলের সাধারণ সদস্য ও নেতারা প্রশাসনের ব্যাপারে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করেন ও প্রশাসনকে শাসক দলের দলীয় নীতি মেনে চলতে বাধ্য করেন। অবস্থার চাপে পড়ে প্রশাসন সেইভাবেই কাজ চালায় যা কার্যতঃ দলবিশেষের স্বার্থে এলেও বৃহত্তর জনস্বার্থকে ব্যাহত করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পদস্থ সরকারী অফিসারেরা গবর্ণমেন্টের নেতৃস্থানীয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না কারণ পদস্থ অফিসাররা কাজ করেন সচিবালয়ের নির্দেশে যে সচিবালয় শাসক দলের মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্দেশেই পরিচালিত হয়।

এমনকি তথাকথিত গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিচারবিভাগও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন না কারণ শাসকদল বিচারক ও বিচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ওপর অবস্থার চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। তাই অনেক সময় বিচারের রায় এমনভাবে দেওয়া হয় যাকে ঠিক আইনসম্মত বিচার বলা চলে না।

রাজস্ব বিভাগের কাজকর্ম ঠিকভাবে তদারকি করবার জন্যে হিসাব–নিরীক্ষক বিভাগকে (Audit department) অবশ্যই স্বাধীনতা দিতে হবে। ক্ষমতাসীন দলের চাপে সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। ঠিক ঠিক হিসেব–নিকাশ পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় জনসাধারণের অর্থ বেনামে ও যথেচ্ছভাবে ব্যয়িত হয়। স্বভাবতই জনসেবামূলক কাজ ঠিক ঠিক পরিচালিত হয় না।

সরকার জনগণের যুগপৎ প্রশাসক ও সেবকও। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঠিক ঠিক শাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয় কারণ শাসন করবে কাকে? বোট প্রাপ্তির আশায় তাকে তো জনগণের মন যুগিয়ে চলতে হয় যার ফলে হবু শাসকেরা শাসন ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়ে। দেশের শাসনভার যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের অধিকাংশই অযোগ্য। দুর্নীতিপারায়ণ ও ভণ্ড শোষককে খোসামোদীর পথ তারা যদি না নেয়, তাহলে

তারা নির্বাচনে জিতবে কি করে? তাই তারা অসৎ উপায়ে ও অর্থের জোরে নির্বাচন-বৈতরণী পার হতে চায়। তাই যোগ্য নেতৃত্ব দেবার মত নেতা খুবই বিরল। আর যদি জনগণের নেতৃত্বের কথা ধরা হয় গণতন্ত্রে সেটা অবান্তর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল ও নেতারা সম্ভাব্য সকল রকমেই নিজেদেরই সেবায় ব্যস্ত।

কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে গণতান্ত্রিক সরকারের অজস্র ত্রুটিবিচ্যুতি। আর এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো দূর না করে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা একান্তই দুরূহ।

এখন গণতন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতির সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি, যে রাষ্ট্রের নাগরিক নিরক্ষর, দুর্নীতিগ্রস্ত, ও অনগ্রসর সে দেশে গণতন্ত্র সফল হতেই পারে না। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স-এই ধরণের দেশের পক্ষে গণতন্ত্র উপযোগী। তবু ৰলৰ, এসব দেশেও কিছু কিছু সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমতঃ অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রে বৃহত্তর জনগণের সুপারিশক্রমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া উচিত। প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, নৈতিক মান, ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুতি ইত্যাদি গুণগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। এই গুণের ভিত্তিতে যদি প্রার্থী নির্বাচন করা হয় তাহলে তাঁরা

সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের পরিবর্তে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হবে। তাদের মনে সমগ্র মানব সমাজের স্বার্থের কথাই স্থান পাৰে–ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা নয়। তারা সৰাইকার সমস্যা ও স্বার্থের কথা ভেবেই আইন প্রণয়ন করবেন ও সামাজিক পুনর্বিন্যাসের গতিতে দ্রুতি আনবেন। তাদের নিরপেক্ষ সেবা সকলেরই আনন্দ বিধান করবে।

(২) বোটাধিকার তাদেরই থাকা উচিত যাদের কিছুটা শিক্ষাগত মান আছে, যারা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও যারা জনগণের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত আছেন। বোটাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে বয়স কোন ৰাধ্য হওয়া উচিত নয়। যদি নিরক্ষর মানুষের হাতে বোটাধিকার থাকে, সেক্ষেত্রে অসামাজিক ও অযোগ্য প্রার্থীর নির্বাচিত হবার ষোল আনা সম্ভাবনা।

(৩) রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র যাতে স্বাধীনভাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে তাই মন্ত্রীমণ্ডলীর অযথা হস্তক্ষেপ থেকে সচিবালয়কে যথেষ্ঠ স্বাধীনতা দিতেই হবে। মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজকর্ম মুখ্যতঃ আইনপ্রণয়ন, ৰাজেট প্রণয়ন ও আইনসভার সদস্যদের দিয়ে ৰাজেট পাশ করে নেওয়া, রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি নির্ধারণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে সীমাৰদ্ধ থাকা উচিত ও মন্ত্রীদের

মতা পার্লামেন্টের চউহদ্দির মধ্যে সীমিত থাকা উচিত ও তাদের সচিবালয়ের কাজকর্মে অযথা নাক গলানো উচিত নয়। মুখ্যসচিবের কোন কোন মন্ত্রীর অধীন না থেকে শাসন বিভাগের শীর্ষে স্থান পাওয়া উচিত। আর বাকী সচিবেরা মুখ্যসচিবের অধীনে কাজ করবেন। মন্ত্রীপরিষদের অযথা খবরদারি থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিটি বিভাগই জনগণের সেবায় নিযুক্ত থাকবে।

আজকের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিচার বিভাগের সর্বেসর্বা হচ্ছেন জনৈক মন্ত্রী। মন্ত্রীর চাপে অনেক সময় বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। এই ত্রুটি সরিয়ে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গেলে বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হবে। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতির পদ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রীর পদের চেয়ে কম গুরুত্বসম্পন্ন হওয়া উচিত নয়। নীতিপরায়ণ ও সৎস্বভাবের মানুষকেই বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদটিতে বসানো উচিত। দেশবাসী এই জিনিসটির ওপর যদি কড়া নজর না রাখেন তাহলে বিচারের স্থান দখল করে অবিচার।

উপসংহারে বলব, সরকারী রাজস্বের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারের হিসাব–পরীক্ষণ বিভাগটিরও পূর্ণ স্বাধীনতা

অবশ্যই থাকা উচিত। অডিটর জেনারেলকে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধান মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। স্বাধীন অডিট–বিভাগই প্রতিটি বিভাগের আর্থিক হিসাবপত্র ঠিকভাবে দেখাশোণা করতে পারে।

তাই সুসংহত গণতন্ত্রে চারটি মুখ্য বিভাগ থাকছে,– (১) **আইন বিভাগ, (২) শাসন বিভাগ, (৩) বিচার–বিভাগ ও (৪) হিসাব–পরীক্ষণ বিভাগ।** প্রতিটি বিভাগই স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন থাকা উচিত। এতদ্ সত্ত্বেও অবিচার ও শোষণের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই সমস্ত বিভাগগুলোর কাজকর্মের তত্ত্বাবধান তথা পারস্পরিক সংযোগ সাধনের জন্যে সদ্বিপ্র–বোর্ডের নজর রাখতেই হবে।

(বেতিয়া, বিহার, ১৭।৭/৮১)

গণতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র

গণতন্ত্র: গণ + তন্ + ত্রৈ+ড = গণতন্ত্র। 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ হ'ল নিয়ন্ত্রিত ভাবে বা বিধিৰদ্ধ পদ্ধতিতে (with proper accelaration) কোন কিছুকে বাড়িয়ে দেওয়া। আবার

সূচীপত্র

তং + ত্রৈ ড করেও 'তন্ত্র'। এখানে 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে জড়তা থেকে মুক্ত করা। 'ত' মানে জড়তা। 'গণতন্ত্র' মানে গণতার সাহায্যে মানুষকে জড়তা থেকে মুক্ত করা অথবা বিধিৰদ্ধভাবে তাদের জন্যে ত্রাণের রাস্তা তৈরী করে দেওয়া। 'গণতন্ত্র' শব্দটি 'democracy'-র যথার্থ প্রতিভূ না হলেও মোটামুটি অর্থে চলতে পারে।

মানুষের সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সামাজিক সমস্যাও তাদের সামনে দেখা দিয়েছিল। প্রথম ও প্রধান সমস্যাটি ছিল বিভিন্ন পর্বতে ও জনপদে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মধ্যেকার সংঘর্ষ। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে গোড়ার দিকে পর্বতকন্দরে বাস করত। অগ্নি আবিষ্কৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত তারা রাত্রের ভয়ে গুহার মধ্যে কাল কাটাত ও অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে গুহায় প্রবেশ করত ও একটি বড় পাথর এনে গুহার মুখ ৰন্ধ করে দিত। মানুষ তখন ছিল বড়ই অসহায়। তাদের গায়ের জোর ছিল অনেক জীবের চেয়ে কম; মস্তিষ্কের জোর অনেক জীবের চেয়ে বেশী হলেও তা আজকের তুলনায় ছিল অকিঞ্চিৎকর। অন্য জীবের মত নখের দাঁতের জোরও তার ছিল না। জলের প্রয়োজন থাকায় পাহাড়ী ঝর্ণার কাছেই তারা বেশী থাকত আর ঝর্ণার কাছে সবসময় তো গুহা পাওয়া যায় না। সমতলে নদীতীরে থাকলে জলের সমস্যা থাকে না কিন্তু রাত্রিতে সেখানে নিরাপত্তা

অত্যন্ত কম। তাই মানুষকে অবস্থার চাপে সমতলে বা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা বা অধিত্যকায় ধীরে ধীরে আসতে হল। সেখানে তারা পাখীর দেখাদেখি গাছের ওপর বাসা বাঁধতে শুরু করল লতা–পাতা ডাল–পালা দিয়ে। হয়তো এটাই ছিল মানুষের সভ্যতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। গুহার দখল নিয়ে, গাছের দখল নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দাঙ্গা–হাঙ্গামা ৰাধত। লড়াইয়ের ধরণ ধারণও ছিল প্রাগৈতিহাসিক ধরণের–নখে–দাঁতে। প্রাচীন ব্রিটেনের সঙ্গে প্রাচীন আইবেরিয়ার যে সন্ধি হয়েছিল তাতেও উল্লেখ ছিল তারা একে অন্যকে বিপদে আপদে নখেদাঁতে ঢিলে পাটকেলে সাহায্য করবে। সে যুগে মানুষের তাই সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছিল। সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে সব গোষ্ঠী নিজেদের দলে নারীর সংখ্যা বাড়াতে চাইত। প্রতিটি গোষ্ঠীতে মৌমাছি বা পিঁপড়েদের মত একটি করে কেন্দ্রগতা নারীশক্তি থাকত যাকে বলা হত গোষ্ঠীমাতা। তারা নারীর সংখ্যা বাড়াতে চাইত তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে। এক পুরুষের দশটি স্ত্রী থাকলে এক বছরে তার দশটি সন্তান হতে পারে কিন্তু এক নারীর দশটি স্বামী থাকলেও এক বৎসরে একটি সন্তানই হতে পারে। তাই একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে পরাজিত গোষ্ঠীর নারীকে তারা অপহরণ করে আনত। আর পুরুষদের ক্রীতদাস করে রাখত। সে যুগে সংখ্যা বৃদ্ধির তীক

হিসেৰে সেই অনগ্রসর মানুষ লিঙ্গ পূজার (phallic worship) প্রবর্ত্তন করেছিল...... ভেৰেছিল এতে বুঝি তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। যাই হোক পরবর্ত্তীকালে নারী গোষ্ঠীর সম্পত্তি বলে গণ্য হত বটে কিন্তু গোষ্ঠীপতি হিসেবে তারা আর নারীকে না রেখে বীরত্বে ভাস্বর শৌর্যসম্পন্ন আদেশদাতা ও দক্ষ যোদ্ধৃ–পুরুষকে তাদের নেতৃত্ব পদে বরণ করে নিয়েছিল। থাকত তাদের উপদেষ্টামণ্ডলী–এটাই ছিল রাজতন্ত্রের প্রথম ধাপ। কোথাও কোথাও উপদেষ্টামণ্ডলীর কার্যকলাপে সর্দার বা রাজা অসন্তুষ্ট হতেন, মণ্ডলীকে খারিজ করে দিয়ে তিনি নূতন মণ্ডলী গড়ে নিতেন (যেমন ব্রিটেনের রাজা অষ্টম হেনরী করেছিলেন)। কোথাও কোথাও আবার উপদেষ্টামণ্ডলী রাজাকে সরিয়ে অন্য রাজা নির্বাচন করতেন (যেমন ব্রিটেনের রাজা জনের যে দশা হয়েছিল)। বৈশালীর লিচ্ছবীরা রাজতন্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজার পদটাই সরিয়ে দেন। মণ্ডলী বা গণতা পরিচিত হয় লিচ্ছবী নামে। লিচ্ছবীরা নির্বাচনের দ্বারা একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণতা গড়ে তোলেন যার নাম দেওয়া হয় মহালিচ্ছবী। এই মহালিচ্ছবীরা বৈশালীর রাজতন্ত্রের শাসনের রাশ ধরে থাকতেন অর্থাৎ ঠিক রাজতন্ত্রের গোড়ার দিকে নয়, রাজতন্ত্র কয়েক ধাপ চলার পরে ক্ষাত্রযুগের মধ্যে ক্ষমতার দওলতে রাজতন্ত্র সাধারণতন্ত্রের (Republic) রূপ নিতে থাকে। যুগগত বিচারে ক্ষাত্রযুগ থেকেই যায়। বলা হয় এই ধারণতন্ত্র

বা Republic কোন গোষ্ঠীবিশেষ বা রাজার খেয়ালখুশীতে চলে না.......চলে জনসাধারণের শুভবুদ্ধিতে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা। জনতার দ্বারা, জনতার জন্যে গণতা বা শাসন করেন তাই গণতন্ত্র। গণতন্ত্র তার মাথার ওপরে প্রতীক তিলক হিসেবে রাজতন্ত্রের একটি টিকা রাখতেও পারে (যেমন ব্রিটেনে, সুইডেনে), আবার নাও রাখতে পারে (যেমন ভারতে, ইউ-এস-এ-তে)। গণতন্ত্রের সঙ্গে যেখানে রাজতন্ত্রের সঙ্কলন সেখানে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব কাগজে কলমে অনেক কিছু হলেও কর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সই করবার একটা যন্ত্রবিশেষ। ব্রিটেনের রাজা ইচ্ছে করলে সেখানকার রয়েল নেবীটাই (রাজকীয় নৌবহর) বেচে দিতে পারেন কিন্তু কর্মক্ষেত্রে জাহাজের একটি ডেকচেয়ারও বেচবার অধিকার তাঁর নেই। যাকে আজ সাধারণতন্ত্র বা Republic বলি তা কি সত্যিসত্যিই সাধারণতন্ত্র? না, কিছুতেই না। এমন অনেক দেশ আছে যারা নিজেদের সাধারণতন্ত্র বলে। যারা রাজতন্ত্রের রাজ্যপাট অনেক আগেই চুকিয়ে দিয়েছে কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষের ...... অন্যে পরে কা কথা......বাক্-স্বাধীনতাই নেই। অধিকাংশ মানুষের চলাফেরা-কাজকর্মে সে কী করছে না করছে, কী খাচ্ছে না খাচ্ছে দেখবার জন্যে পিছনে ফেউ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরণের রাষ্ট্র নিজেদের সাধারণতন্ত্র বললেও কার্যতঃ গোষ্ঠীতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তবে কি তারা গণতন্ত্রের

দ্বারা নির্বাচিত গোষ্ঠীতন্ত্রের দ্বারা শাসিত (Group- governed State) রাষ্ট্রে? না, তাও না। এই গোষ্ঠীতন্ত্রের ক্ষমতাসীনরা নির্বাচন ব্যবস্থাও এমনভাবে গড়ে তোলেন যাতে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের পছন্দমত মানুষদের দ্বারা গোষ্ঠীপ্রাধান্য গড়ে নিতে না পারেন। হামলা চালিয়ে অসাধু উপায়ে নির্বাচনকে তছনছ করে দিয়ে তাঁরা অবৈধভাবে বারবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে চান....ও আসেনও। সুতরাং তাঁরা গণতন্ত্রের সমর্থক নন–তাঁরা গোষ্ঠীবাদীদের দ্বারা নির্বাচিত গোষ্ঠীতান্ত্রিক নেতা। গণতন্ত্রের পক্ষে কোন কথা বলা তাদের কালো মুখে মানায় না। তাদের অবস্থাটা আসলে যেন কয়লার কালো গুঁড়ো মুখে মেখে শাদা ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে বলছে–দেখ, আমার মুখটা কেমন ফরসা ধবধবে।

যাঁরা গণতন্ত্রের সমর্থক তাঁদের মধ্যে এমন অল্পসংখ্যক আছেন যাঁরা গোষ্ঠীতন্ত্র চান না, কিন্তু তাঁরাও কি বলতে পারেন যে তাঁরা যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমনটি গণতন্ত্র চলে বা পৃথিবীতে কোন দেশে তেমনটি গণতন্ত্র আছে? না, নেই। তা ছাড়া রাজনৈতিক চেতনা যাদের নেই....... গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যাদের নেই তাদের বোট (Vote)-এর মূল্যই বা কতটুকু? আর তাই তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে দিয়ে তাদের বোট কিনে নেওয়া বা হাতড়ে নেওয়া কি খুৰ বেশী শক্ত? এ ধরণের ক্ষেত্রে কি democracy যে

কোন মুহূর্তে demonocracy বা দানবতন্ত্রে পরিণত হতে পারে না! এ ব্যাপারে প্রাউটের সদ্বিপ্রতন্ত্রই একমাত্র মুশকিল আসান....তবে সদ্বিপ্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে অনেক বৈদুষ্যের মস্তিষ্কচালনার ফলশ্রুতিতে। তা অসির বলে মসীর বলে বা পেশীর বলে সম্ভব নয়। তাই যাঁরা মানব সমাজের মিত্রপুরোধা তাঁদের আজ কর্তব্য হ'ল প্রকৃত সত্যকে মানুষের সামনে তুলে' ধরা..... মানুষ যাতে এই গুহায়িত সত্যকে বুঝে নিতে পারে, সেজন্যে মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা উচিত দ্রুত.... দ্রুততর..... দ্রুততম বেগে!

কলিকাতা, ১৭।৪।৮৮

(শব্দচয়নিকা, ১৭শ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত)

সমবায় ব্যবস্থা

তোমরা সকলেই জান মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য। মানুষ কখনো একা একা জীবনযাপন করতে পারে না– সে এককজীবী নয়। ধর, কেউ কুয়ো থেকে তুলে এক গ্লাস জল

খেতে চাইল। এই জল তোলবার জন্যে তার প্রয়োজন হৰে একটা বালতি, কিছুটা দড়ি, দড়ি বাঁধৰার জন্যে কপিকল ইত্যাদি। এ সব উপকরণের জন্যে তৃষ্ণার্ত মানুষটির পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য মানুষের ওপরে নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই সবাই যাতে একসঙ্গে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্যে সমাজে সব মানুষকেই মিলেমিশে কাজ করতে হয়। 'সমাজ' শব্দের অন্তর্নিহিত ভাবটি হ'ল– "সমানং এজতে ইতি সমাজঃ।" সমাজ হ'ল সর্বসম্মতভাবে গৃহীত একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সামূহিক চলমানতা।

শুধুমাত্র একান্ত ব্যষ্টিগত ব্যাপারগুলো বাদে জীবনের অন্যান্য প্রতিটি পরিভূতে মানুষ যদি পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ঐক্য রক্ষা করে এগিয়ে যায়, তবে তাদের এই ঐক্যবদ্ধ অগ্রগমন মানব সমাজের পক্ষে হবে কল্যাণকর। কেবল যে যে বিষয়ে সমষ্টিগত ভাবে মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, সেগুলি সে ব্যষ্টিগত ভাবে করে যাবে। যতদূর সম্ভব একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করাই বেশী ভাল; যত বেশী পরিমাণে আমরা সমবেত ভাবে কাজ করতে উদ্যোগী হব, ততই আমাদের মঙ্গল। যদি এই সামূহিক সহযোগিতার নীতিকে আমরা মেনে না চলি, সমাজের মূল প্রাণশক্তিই তাতে ক্ষুণ্ণ হবে, আর মানুষের জীবনেও ঘটবে তার প্রতিকূল

প্রতিক্রিয়া। মানুষকে তার নিজের খাদ্য নিজেকে খেতে হয়। একজনের হয়ে অন্য কেউ তো আর খাবার খেয়ে দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, দু'জন মানুষ হয়তো একজনের খাবারটা মিলেমিশে ভাগ করে খেতে পারে। যেখানে উগ্র ব্যষ্টিস্বাতন্ত্রবোধ মানুষের জীবনে প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে তার চর্তুস্পার্শ্বস্থ পরিবেশ, প্রতিবেশী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর স্বার্থ, এমনকি বৃহত্তর মানবতার অস্তিত্ব ব্যাহত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা (Co-ordinated Co-operation)

'Operation' কথার অর্থ হলো কোন এক মাধ্যম বা একাধিক মাধ্যমের সাহায্যে বিশেষ কোন কাজকে সম্পন্ন করা। মনে করো, তুমি একটা কাজের জন্যে এক ধরণের যন্ত্রকে ব্যবহার করছ। যদি সেই যন্ত্রটাকে পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালন ও ব্যবহার করা হয় তবে সেই ধরণের কর্মসম্পাদনকে বলব 'সহযোগিতা' (Co-operation)। এই সহযোগিতার মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন হবে তাতে সেই কর্মে নিযুক্ত সকলেরই থাকতে হৰে সমানাধিকার, সমান মানবিক মর্যাদা ও সমান আইনানুগ অধিকার।

জীবনের সর্ব পরিভূ–তেই সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষে মানুষে এই পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। যেখানে

এই সহযোগিতা সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষের মধ্যে সম অধিকার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও কল্যাণের ভিত্তিতে আধারিত তাকে আমরা বলৰ বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা (co-ordinated co-operation)। পক্ষান্তরে একদল মানুষ যখন অন্য একদল মানুষের অধীনতায় একক বা মিলিতভাবে কাজ করে চলে তখন তাকে ৰলৰ দাসসুলভ সহযোগিতা (Sub-ordinated co-operation)।

আজকের পৃথিবীতে চলছে নানা ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু তাদের কোন ব্যবস্থাই এই ৰন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং বিশ্বের সর্বত্রই বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেখতে পাই দাসসুলভ সহযোগিতার আধিপত্য। এ ধরণের অসম সহযোগিতার অশুভ পরিণামস্বরূপ সমাজের নৈতিক কাঠামোটাই আজ বিনষ্ট হতে বসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা এমন কতকগুলো রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করতে পারি যেখানে জাতি–সাম্যের (racial parity) যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সে সব দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (ethnic groups) মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার নীতি কাজ করছে না। তাঁদের সামূহিক জীবনের শক্তিগত ভারসাম্য (equilibrium) ও ওজনগত ভারসাম্যের (equipoise) অভাব গোটা সমাজ সংরচনাকেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে

দিতে চাইছে। আবার এমন কতকগুলি দেশ রয়েছে যারা কমিউন ব্যবস্থাকে (commune system) অনুসরণ করে চলেছে। এই কমিউন পদ্ধতিতে সমাজ রূপান্তরিত হয় সৈনিকদের সামরিক ছাউনির অতি–নিয়ন্ত্রিত জীবনধারার এক অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার যন্ত্ররূপে। কমিউন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে উৎপাদনের পরিমাণ আরো হ্রাস পায়। কমিউন প্রথার এই নেতিবাচক পরিণামই আমরা প্রায় সবকটি কম্যুনিষ্ট দেশের খাদ্যাভাবের সমস্যার মধ্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছি। পুঁজিবাদী দেশ কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া কমিউন–নির্ভর চীন–রাশিয়াকে বিক্রী করছে খাদ্যশস্য। কৃষি বা অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে কমিউনের এই ব্যর্থতার কারণ কী? এই ব্যবস্থায় শ্রমিকরা তাঁদের কাজের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারেন না; তাছাড়া কমিউনে শ্রমিকরা তাঁদের কর্মশক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটাবার সুযোগ ও স্বাধীনতাও পান না। কমিউনের এই ধরণের চাপা দমবন্ধ–করা যান্ত্রিক পরিবেশই মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় জড়বাদী জীবনধারা ও অধ্যাত্মবাদবিরোধী নেতৃত্ব।

কমিউন ব্যবস্থায় ব্যষ্টিগত মালিকানার স্থান নেই। ব্যষ্টিগত মালিকানা বোধটা না থাকায় শ্রমিকরা সেখানে কঠোর পরিশ্রম করতে চান না; কমিউনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও উৎপাদনের উপকরণগুলির যথাযথ দেখাশুনা ও সংরক্ষণও

তাঁরা করেন না। কর্ষকেরা যদি অনুভব করেন যে জমির সদুপযোগ করার স্থায়ী অধিকার তাঁদের রয়েছে, সেক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদন বেড়ে যাৰে কিন্তু কমিউন ব্যবস্থায় এমন ধরণের উৎসাহ বা প্রেরণা দানের কোন ব্যবস্থাই নেই। ফলস্বরূপ, কমিউনের কর্মীরা মানসিক অবদমন জনিত রোগে ভুগছেন। আর সে অবস্থায় তাঁদের উৎপাদন শক্তিও শিথিল হয়ে পড়ছে। বুদ্ধিজীবী মানুষরা এ ব্যবস্থায় জবরদস্তির চাপে পড়ে এমন ধরণের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন যা তাঁদের মানসিকতার সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। শিক্ষিত বুদ্ধিমান কুশলী কর্মীরাও সাধারণ শ্রমিকদের মত একই হারে বেতন নিতে বাধ্য হচ্ছেন। শ্রমিকদের জন্যে কোন প্রকার প্রেরণা বা প্রেষণা (incentives) প্রদানের ব্যবস্থাও কমিউন পদ্ধতিতে নেই। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় ব্যষ্টিগত উদ্যোগকেও প্রোৎসাহিত করা হয় না। স্বভাবতই কমিউনের কর্মীরা মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করেন না। তাই এ ধরণের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা কোনদিনই সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করতে সক্ষম হবে না। কমিউন প্রথা শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বরং বলৰ এ ব্যবস্থা যদি চলতেই থাকে তবে শিল্প ও কৃষির বর্তমান সমস্যাগুলি ভবিষ্যতে আরও জটিল ও ব্যাপক আকার ধারণ করবে। কমিউনের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় উৎপাদন

ও বণ্টন ব্যবস্থা শুধু ত্রুটিপূর্ণ নয়, তা শোষণাত্মক ও অমানবিকও।

কমিউনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার কোন অস্তিত্ব নেই। তোমরা জেনে রেখো, কমিউন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে দাসসুলভ সহযোগিতার ভিত্তিতে। সেখানে কর্মরত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্কের মতই অসম ও অমানবিক। এতে একদল যেন প্রবল প্রতাপান্বিত পরিদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, অন্যদল তাঁদের নিয়ন্ত্রণে পিষ্ঠ অসহায় আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র। এ ধরণের সম্পর্ক কি মানব প্রগতি ও মানব মনীষার বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়? যে কোন প্রগতিশীল আন্দোলন বা উদ্যোগ এ ধরণের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থায় পিছিয়ে যেতে বাধ্য। মানব মনের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী হ'ল এই কমিউন ব্যবস্থা।

প্রাউট চায় সমবায় প্রথার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। সমবায় প্রথার অন্তর্নিহিত ভাবটি হ'ল ৰন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভাব। কেবল এই মানবিক ভাবের ভিত্তিতেই মানব সমাজের সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রগতি ঘটানো সম্ভব। মানব জাতির মধ্যে পূর্ণ ও চিরস্থায়ী ঐক্য স্থাপনের পক্ষে সমবায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আদর্শ পন্থা। পৃথিবীর সকল দেশে সকল মানুষেরই উচিত ব্যাপকভাবে এই সমবায় প্রথার প্রচলন করা ও তার শুভ

ফল ভক্ষণের সৌভাগ্য লাভ করা। তাই প্রাউটের শ্লোগান– আমরা চাই না কমিউন........। আমরা কমিউনের ক্রীতদাস নই আমরা চাই সমবায়...........।

কৃষিতে সমবায়

মানবিক সহযোগিতার অন্তর্নিহিত ভাব এই নির্দেশনাই দেয় যে, যেসব সামূহিক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য যেমন খাদ্য, চিকিৎসা, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি, তাদের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত সমবায় প্রথায়। যে দেশের জনগণের যেটা প্রধান খাদ্যবস্তু সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সে দেশের প্রধান খাদ্য–শস্য। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, বাঙলার মানুষের প্রধান খাদ্য হ'ল ভাত, তাই ধান এ দেশের প্রধান খাদ্যশস্য। তেমনই পঞ্জাবের প্রধান শস্য গম, আয়াল্যাণ্ডের আলু, স্কটল্যাণ্ডের রাই, ওটস্, বার্লি ইত্যাদি। খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন আমাদের জীবনে অত্যন্ত বেশী বলে কৃষিকে অর্থনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্যও করা হয়ে এসেছে। কৃষিভূমির সর্বাধিক ও সঙ্গত উপযোগিতা গ্রহণ ও সকল কৃষিভূমির সুষ্ঠু পুনর্বিন্যাসের জন্যে সমবায় প্রথাই অধিকতর কাম্য হওয়া উচিত।

কৃষিভূমির উর্বরতা নির্ভর করে সেই অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর আর তার ফসল উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে জমির জলধারণ ক্ষমতার ওপর। সাধারণত, উঁচু জমিতে কৃষির ফলন বেশী হয় না, এমনকি সে জমি যদি বেশ উর্বরও হয়। অন্যদিকে নীচু জমি তুলনামূলকভাবে কম উর্বর হলেও তাতে অধিক ফসল উৎপন্ন হয়, কারণ নীচু জমিতে জল সঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে। তুলনামূলক বিচারে যে সব ভূমিখণ্ড সমতল সেগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে নিতে হবে যাতে উঁচু থেকে নীচুর দিকে জল গড়িয়ে যাবার সুযোগ পায়।

কর্ষকের মনস্তত্ত্বে কৃষিজমির আকর্ষণটা অত্যন্ত বেশী, কারণ তাঁদের জমির প্রতি এক ধরণের আসক্তির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের কাছে চাইলে তাঁরা কয়েক'শ কিলো শস্যকণা কাউকে দান করে দেবেন কিন্তু তাঁদের যদি কয়েক ৰর্গমিটার জমিও স্বেচ্ছায় দান করতে অনুরোধ করা হয় তাঁরা তা করতে রাজি হন না। মনে করো, কয়েকজন কর্ষক মিলে ২০০ একর জমির মালিক। তাঁরা সকলে মিলে যদি একটা কৃষি সমবায় গড়ে তোলেন ও সেই সমবায়ে কে কী পরিমাণ জমি দিলেন তার আলাদা আলাদা হিসেব রক্ষা করা হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁদের মনে জমির মালিকানাস্বত্বের একটা ভাব বজায় থেকে যাবে। যদি সমগ্র কৃষিজমির এলাকাটা সমান লেৰেলযুক্ত হয় তবে সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডগুলির মধ্যে

যত আল আছে সেগুলিকে ভেঙ্গে একটা বড় আয়তনের কর্ষণযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত করে ফেলতে হবে। এ ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কর্ষকদের মনে জমি নিয়ে কোন মানসিক সংঘাত দেখা দেবে না, তাঁরাও কোন রকম অনিশ্চিততায় চিন্তাক্লিষ্ট হবেন না। তাছাড়া, এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে অনুর্বর ভূমিখণ্ডগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির আওতায় এনে কর্ষকেরা তাঁদের কর্ষণযোগ্য জমির মোট আয়তন বাড়িয়ে তুলতে পারবেন, আর অসংখ্য আল যা ভূমিখণ্ডগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে ব্যষ্টি-মালিকানাধীন করে রেখেছে সেই আলগুলিকেও তাঁরা সরিয়ে ফেলতে পারবেন। যে কর্ষকেরা হাতে কেবল ছোট্ট দু'কাঠা জমি রয়েছে তাঁর পক্ষে একজোড়া বলদ ও লাঙ্গল রাখা কখনই সম্ভব নয়। তাঁকে বর্গাদার পদ্ধতি মেনে নিয়ে অন্য কোন ব্যষ্টির হাতে নিজের জমি চাষ করতে দিতে হবে। যদি জমির মালিক তাঁর সামান্য জমিটুকু বর্গাদারের হাতে চাষের জন্যে সঁপে দেন, তবে তাঁর ভাগ্যে জমি থেকে ফসল পাবার সম্ভাবনা খুব কমই অবশিষ্ট থাকে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে জমির আয়তনগত ক্ষুদ্রতানিবন্ধন কর্ষককে এ ধরণের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। তাই কৃষিকাজ যদি সমবায় প্রথা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয় তাহলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি-জমিকে মিলিয়ে একটি বড় কৃষি-জমিতে পরিণত করা যাবে। তার

ফলে সব কর্ষকেরই বিরাট সামূহিক লাভ হবে। এতে আলগুলি সরিয়ে দিলে আলের জন্যে অযথা জমি নষ্ট হবে না, কৃষিযোগ্য ভূমির আয়তনও বাড়বে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই আল সরিয়ে দেওয়ার ফলে যে বাড়তি জমি চাষের জন্যে পাওয়া যাবে তার মালিকানা কার অধিকারভুক্ত হবে সেটা আকবরের সময়ে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল...... ঠিক হয়েছিল জমির উত্তর ও পশ্চিম দিকের আলটি পাবেন সংশ্লিষ্ট জমিটির মালিক।

বর্তমানে জমি চাষ করতে কর্ষকের প্রয়োজন উন্নত বীজ, সার, ট্রাক্টর, জলসেচ–ব্যবস্থা। পশুর গোবর–সারের যোগান বাজারে যথেষ্ট নয়, তাই জমির প্রয়োজন পূর্তির জন্যে কর্ষকদের চাই রাসায়নিক সার। কিন্তু যে জমিতে নিবিড়ভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার করা হয়েছে কিছুদিন পরে দেখা গেছে সে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে তা চাষবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাসায়নিক সার জমির প্রাণশক্তি বা উর্বরতা শক্তিকে ধ্বংস করে দেয় ও পরে সেই জমি যেন সিমেন্টের মতই প্রাণশক্তিহীন হয়ে যায়। তাই রাসায়নিক সার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে এমন সার উদ্ভাবন করা দরকার যাতে তার ব্যবহারে জমিতে কোনপ্রকার খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয়, অথচ তাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, ফলনও বৃদ্ধি পায়। ব্যষ্টিগত মালিকানাধীন কৃষিতে রাসায়নিক

সারের এই ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে বাঁচৰার পথ থাকে না। কিন্তু সমবায়ভিত্তিক কৃষিতে চাষবাস নিয়ে গবেষণা চালিয়ে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও এমন কৃষি-পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব হবে যাতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে, অথচ জমির উর্বরতাও দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে। সমবায় প্রথার মস্ত বড় সুবিধাটা এই যে এতে অনেকের মূলধন ও সম্পত্তি একত্রিত করে তাঁদের সংঘবদ্ধ প্রয়াসে সেই মূলধন ও সম্পত্তিগুলিকে কাজে লাগান যায়। অতীতে এমন এক দিন ছিল যখন কর্ষকরা তাঁদের জমিগুলিকে একটানা কয়েক বছর ব্যবহারের পর কোন এক ঋতুতে হয়তো সেই জমিতে অংশতঃ চাষ না করে ফেলে রেখে দিতেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হত জমিকে 'জিরেন' দেওয়া। কিন্তু বর্তমান যুগে আর জমিকে জিরেন দিয়ে ফেলে রাখা সম্ভব হবে না। তাই এখন এমন এক পদ্ধতি প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ছে যাতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা সত্ত্বেও জমির উর্বরতা-শক্তি হ্রাস না পায়, অথচ রাসায়নিক সার একেবারে ব্যবহার না করেও জমির উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে এমন এক কৃষি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হতে চলেছে।

অ-কৃষি শিল্পের মত কৃষিকেও শিল্পের সমান গুরুত্ব দিতে হবে। অনেক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেও এব্যাপারে কৃষিকে

শিল্পের মত গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। সমৰায় প্রথায় কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠলে এ নীতি ভালভাবেই কার্যকরী হতে পারে। যেমন ধরো, হিমাচল প্রদেশে যে সব আপেলের বাগান আছে সেগুলির চাষ ব্যষ্টিগত মালিকানার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে হওয়া উচিত সমবায় পদ্ধতিতে। অনুরূপভাবে আপেলকে বাজারে বিক্রীর জন্যে উপভোক্তা–সমবায় ও (Consumers' Co-op- erative) আপেলকে বাজারে পাঠানোর প্রয়োজনে গড়ে ওঠা প্যাকিং–শিল্পও সমবায় প্রথায় পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। সেরিকালচার শিল্পের উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণও সমবায় প্রথার দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এভাবে গোটা কৃষি ব্যবস্থায় ধাপে ধাপে ব্যাপকভাবে শিল্পভিত্তিতে সমবায়প্রথায় গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক।

কৃষি–সমবায়

প্রাউটের নীতি অনুযায়ী সমস্ত কৃষি–জমিকে ধাপে–ধাপে সমাজীকরণ করে নেওয়া হবে। প্রথম স্তরে, বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিচারে সব অ–লাভজনক কৃষিজমিগুলিকে (un-economic land holdings) বাধ্যতামূলকভাবে সমবায় প্রথার আওতায় নিয়ে আসা হবে। এতে ছোট ছোট কৃষিজমির যাঁরা মালিক ছিলেন তাঁদেরই লাভ ও কল্যাণ হবে। দ্বিতীয় স্তরে,

সূচীপত্র

সমস্ত জমির মালিককেই অনুরোধ করা হবে সমবায় প্রথার আওতায় তাঁদের জমিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে। তৃতীয় স্তরে, সমস্ত কৃষিজমিগুলিকে বিচার–সমর্থিত ও বিজ্ঞানসম্মত পুনর্বিন্যাস করা হবে ও জমির মালিকানা স্বত্বেরও পুনর্বিবেচনা করে দেখা হবে। চতুর্থ স্তরে, কৃষি–জমির মালিকানাসত্ত্ব নিয়ে আর কোন বিরোধ বা সংশয়ের কোন অবকাশ থাকবে না। এমনি ভাবে স্তরে স্তরে কৃষি–জমির সমাজীকরণ করে ফেলার নীতি অনুসরণ করার ফলে মানুষও ক্ষুদ্র ব্যষ্টিস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সামূহিক স্বার্থের দ্বারা প্রেষিত হবার শিক্ষা লাভ করবে। মানুষের এই মানসিক বিস্তার ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন সমাজের বুকে এক সুষ্ঠু অনুকূল পরিবেশও গড়ে তুলৰে। অবশ্য সমাজের বুকে সামূহিক মনস্তত্ত্বের এমন পরিবর্তন আনা রাতারাতি সম্ভব হবে না। এ পরিবর্তন আসবে ধীরে ধীরে মানুষের মনস্তত্ত্বের ক্রমঃ–রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে। এমন ধরণের উন্নত বৈজ্ঞানিক সমবায় প্রথা চালু হবার পর আর ভূমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষি–শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমাগত বিরোধ ও সামাজিক অশান্তির চিরকালের জন্যে নিষ্পত্তি ঘটৰে।

প্রথম অবস্থায় সমবায়গুলিকে গড়ে তুলতে হৰে বিভিন্ন কর্ষককোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে। মনে করা যাক, কখগঘ এই চারজন কর্ষক রয়েছেন। এই

চারজনে মিলে নিজের জমি কোন সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত করে একটা কৃষি-উৎপাদন সমবায় গড়ে তুললেন। সমবায়ে তাঁরা নিম্নহারে জমি দিলেন......

ক প্রদত্ত জমির পরিমাণ ২ একর

খ প্রদত্ত জমির পরিমাণ ৫ একর

গ প্রদত্ত জমির পরিমাণ ১০ একর

ঘ প্রদত্ত জমির পরিমাণ ১৫ একর

এবার উক্ত সমবায়ের উৎপাদিত ফসল ৰাজারে বিক্রীর পর অর্জিত মোট মুনাফা চারজন কর্ষকের মধ্যে বণ্টিত হৰে নিম্নোক্ত দুটি নীতির ভিত্তিতে:-

(১) সমবায়ে ব্যবহৃত মোট জমির যে পরিমাণ জমি যে কর্ষকের ছিল সমবায়ের লভ্যাংশও তাঁদের মধ্যে সেই অনুপাতে ভাগ করা;

(২) কৃষি উৎপাদনে ক, খ, গ, ঘ ব্যষ্টিগতভাবে যে পরিমাণ দায়িত্ব, যোগ্যতা ও শ্রম দান করেছেন তার ভিত্তিতে আনুপাতিকভাবে লভ্যাংশ বণ্টন করা;

এই দুই নীতির সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচারের ভিত্তিতে সমবায় সদস্যদের মধ্যে মোট লভ্যাংশ বণ্টন করা হবে।

অন্যত্র উৎপাদন সমবায়ে কর্যকরা তাঁদের মোট শেয়ারের পরিমাণ ও মোট শ্রমদানের পরিমাণের ভিত্তিতে লভ্যাংশ অর্জন করবেন। সমবায়ে উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কর্ষকরা বাড়তি ফসল পাবেন ও তাঁদের আর্থিক ও বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিও ঘটৰে।

প্রতিটি সমবায়ে ব্যবহৃত মোট জমির ও মোট উৎপাদনের আলাদা আলাদা হিসেবে রক্ষারও যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে। তদনুসারে অর্জিত মুনাফাও সমবায় সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কোন সমবায়ে প্রদত্ত মোট জমির মধ্যে ৩০ একর জমি হয়তো দিয়েছেন "ক" নামীয় কর্ষক। কিন্তু তাঁর ওই ৩০ একর জমির ১৫ একর হয়তো খুব উর্বর জমি, বাকি ১৫ একর নিম্নমানের। সে ক্ষেত্রে সমবায়ের মোট জমিতে উৎপাদিত ফসল থেকে প্রাপ্ত মোট মুনাফার কতটা অংশ "ক" নামক কর্ষকটি পাৰেন সেটা নির্ভর করবে তাঁর সমবায়ে প্রদত্ত নিজস্ব ভূমিখণ্ডের মোট উৎপাদন শক্তির উপর। যদি সমবায়ভুক্ত জমিগুলির কোন মালিক সমবায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে না চান তবু সেক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত জমি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত রাখা যাবে। তাঁদের সমবায়ের সদস্য রূপে গণ্য করতে হবে ও সমবায়ে প্রদত্ত তাঁদের নিজ নিজ জমির মোট উৎপাদন শক্তির ভিত্তিতে তাঁরা লভ্যাংশ পাৰেন।

তবে যে সব সদস্য সমবায়ে প্রত্যক্ষভাবে কাজে নিযুক্ত থাকছেন না তাঁরা আলাদা কোন শ্রমের মজুরি পাৰেন না।

সমবায় প্রথায় কর্ষকদের ঠিক ফসল ঘরে তুলবার পরেই পরিস্থিতির চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে কম দামে বাজারে ফসল বেচে দেবার প্রয়োজন হবে না। ব্যষ্টি মালিকানায় পরিচালিত কৃষি ব্যবস্থায় কর্ষক তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে উৎপন্ন ফসল মাঠ থেকে তুলে আনতে না আনতেই অনেক সময়ে বিক্রী করে ফেলতে বাধ্য হন। কিন্তু সমবায় ব্যবস্থায় কর্ষক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভোগ করতে পারবেন যথেষ্ট পরিমাণে, কারণ দুঃস্থ কর্ষকরা প্রয়োজন হলে সমবায় ভাণ্ডার থেকে অগ্রিম অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন ও বাজারের অবস্থা ও মূল্যমানের সর্বশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁর উৎপন্ন ফসল যথাযথ মূল্যে যথাসময়ে বিক্রয় করতে পারবেন। তাই সমবায়ের পরিচালকমণ্ডলীকেই এটা স্থির করতে হবে যে তাঁরা তাঁদের উৎপন্ন ফসলের কতটা পরিমাণ কোন সময়ে ৰাজারে বিক্রী করবেন আর কতটাই বা নিজেদের প্রয়োজনে রাখবেন। সমবায়গুলি নির্দিষ্ট মূল্য–আইনের মধ্যে নিজেদের উৎপন্ন ফসলের ৰাজার দর নির্দ্ধারণ করতে পারবে। এ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীরা বা দালালরা যে ব্যষ্টিগত মালিকানাধীন কৃষিতে অথবা পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থায় লাভের বড় অংশটা আত্মসাৎ করে নেবার সুযোগ পেত

সমবায় প্রথায় তা হতে পারবে না, সমবায়ই মোট লাভটুকু নিজের ঘরে তুলে নিতে পারবে।

বর্তমান যে ধরণের কৃষি–ব্যবস্থা চলছে তাতে গরীব কর্ষকরা তাঁদের জমি থেকে ফসল কাটবার সঙ্গে সঙ্গে চাষের বীজ, সেচ ও ক্ষেতমজুরদের মজুরী বাবদ যাবতীয় খরচ চালাৰার জন্যে পূর্বে যে সব ঋণ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি পরিশোধ করতে বাধ্য হন। এ ছাড়াও পরিবারের লোকজনদের পোষাক–আশাকের জন্যেও পরবর্তী বছরে তাঁদের কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। ঘনঘন এই ধরণের নানা প্রয়োজনের দাবী মিটাতে গিয়ে দরিদ্র কর্ষক পরিবারেরা তাঁদের গায়ের রক্ত জল করে উৎপাদন করা ফসল বাজারে জলের দরে বিক্রী করতে বাধ্য হন। এই ধরণের পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে ফসল বিক্রী করে দেওয়াকে কথ্য ৰাংলায় বলে অভাবী বেচা (distress sale)। এই ধরণের বিক্রয়ের হাত থেকে কর্ষকদের রক্ষা করৰার জন্যে সমবায় প্রথা চালু করা অত্যন্ত আবশ্যক। সমবায়ে কর্ষক সারা বৎসরে তাঁর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রয়োজন হৰে ততটুকু নিজের ব্যবহারের জন্যে রেখে বাড়তি ফসল সমবায়ের কাছেই বিক্রী করে দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সমবায়ই দাম ঠিক করে দেৰে কী মূল্যে সেই ৰাড়তি ফসল ক্রয় বা বিক্রয় করা হবে। উৎপাদিত

দ্রব্যের বাজার দর যখন গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত হবে তখনই তাঁরা উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রী করবেন। আর এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে সমবায়ে প্রদত্ত মোট জমির পরিমাণ ও শেয়ারের অনুপাতেই কর্ষকরা ফসল থেকে প্রাপ্ত মোট মুনাফা নিজেদের অংশ হিসেবে লাভ করবেন। এখন সমবায় না থাকায় এই লাভ মধ্যস্বত্বভোগী বা দালাল বা মহাজনের ঘরে চলে যাচ্ছে।

কর, লেবি বা আবগারী শুল্ক ইত্যাদি যা যা দেবার থাকে সেগুলি সমবায় নিজেই দিয়ে দেবে, ফলে ব্যষ্টিগতভাবে কর্ষকরা অর্থনৈতিক চাপ বা শোষণ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক অগ্রসর উন্নত দেশে ভূমি–কর বা খাজনা আদায়ের প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ দেখা গেছে যে আদায়যোগ্য মোট রাজস্বের (Revenue) খুব কম অংশই বাস্তবে সংগ্রহ করা হয়ে ওঠে। আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণের চেয়ে আদায় করার খরচই বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রীর মতন অবস্থা কেননা মোট খাজনায় (total revenue) জমির খাজনা (Revenue) খুব কম।

একটি কৃষি–সমবায়ে কর্মরত মানুষদের মধ্যে থাকছেন (১) যাঁরা শেয়ারযুক্ত কর্ষক, (২) শেয়ার বিহীন কৃষি–

শ্রমিক। সমবায়ের মাধ্যমে তাঁরা উভয়েই লাভবান হতে পারবেন। কর্ষকরা সমবায়ে নিয়মিত শ্রমের বিনিময়ে তাঁদের বেতন তো পাবেনই, এ ছাড়াও তাঁদের মোট শেয়ারের ভিত্তিতে লভ্যাংশও তাঁরা পাবেন। অন্যদিকে কৃষি–শ্রমিকরাও সমবায়ের মাধ্যমে পাৰেন স্থায়ী চাকুরীর নিরাপত্তা ও নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরী।

আজকাল কৃষি–সমৰায়ে যে সব শেয়ারবিহীন কৃষিশ্রমিক কাজ করছেন তাঁদেরও আবার শ্রেণী বিভাজন থাকৰে। এক শ্রেণীতে থাকবেন স্থায়ী কৃষিশ্রমিক আর অন্য শ্রেণীতে থাকৰেন দিনমজুর বা চুক্তিবদ্ধ অস্থায়ী কৃষিশ্রমিক। যাঁরা স্থায়ী শ্রমিক তাঁরা তো নিয়মিত যে মজুরী পান তা তো পাৰেনই, তাছাড়া তাঁদের জন্যে থাকৰে বিশেষ 'বোনাস', ডিবিডেন্ট ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক প্রেরণা ও প্রেষণা (eco- nomic incentives)। কিন্তু যাঁরা অস্থায়ী দিন–মজুর তাঁরা পাৰেন কেবল তাঁদের কাজের মজুরীটুকু। শ্রমিকদের মধ্যে যাদের উৎপাদন হৰে সর্বাধিক ৰোনাসও পাবেন। সমবায়ে নিযুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের (skilled labour) বেতন সাধারণ শ্রমিকদের (un- skilled labour) তুলনায় বেশী থাকৰে। এই ব্যবস্থা এ জন্যেই রাখা হৰে যাতে সব কর্মীই নিজেদের যথেষ্ট দক্ষ করে গড়ে তুলতে ও কঠোর পরিশ্রম

করতে উদ্যোগী হন। একজন শ্রমিক তাঁর দক্ষতা ও কাজের পরিমাণের অনুযায়ী যে বেতন পাবেন সেই বেতনের ভিত্তিতে তাঁর বোনাসের পরিমাণও নির্দ্ধারণ করা হবে।

সদস্যরা সমবায়ের যে শেয়ার কিনবেন সমবায়ের পরিচালকমণ্ডলীর বিনা অনুমতিতে সেগুলি বিক্রয় বা হস্তান্তর করবার অধিকার তাঁদের থাকৰে না, তবে শেয়ারগুলি বংশানুক্রমে উত্তরাধিকারীরা পাবেন। যদি কোন সমবায় সদস্যের বংশধর না থাকে সে ক্ষেত্রে তাঁরা শেয়ারগুলি আইনানুমোদিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উত্তরপুরুষ পাবেন। যদি সেই নির্বাচিত উত্তরপুরুষটি পূর্ব থেকেই সমবায়ের সদস্য না হন তবে শেয়ার-প্রাপ্তির পর তিনি উক্ত সমবায়ের সদস্যরূপে গণ্য হবেন। এই ব্যবস্থাটা থাকা উচিত এই কারণে যাতে সমবায়ের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী শিল্পপতিরা টাকার জোরে নিজেদের ইচ্ছামত অনেকগুলি শেয়ার কিনতে না পারে ও সমবায়ের বাজারে ফাটকা কারবারের কুপরিবেশ গড়তে সুযোগ না পায়। এ ধরণের বল্গাহীন শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের কুফল থেকেই অর্থনীতিতে দেখা দেয় মন্দা (depression)।

এক এক দেশে এক ধরণের সামাজিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই যে দেশে যে ধরণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে সে দেশের প্রথা অনুযায়ীই সমবায়ের শেয়ার হস্তান্তরিত

করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলায় রয়েছে দায়ভাগ ব্যবস্থা, কিন্তু অবশিষ্ট ভারতে প্রচলিত মিতাক্ষরা ব্যবস্থা অনুসারে সম্পত্তি হস্তান্তরের কাজ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে বংশগত সম্পত্তিভোগের অধিকার ভিন্নরূপ। শেয়ার সংক্রান্ত এই নীতি যদি অনুসৃত হয় তবে আগেকার দিনের জমিদারদের মত কথায় কথায় আদালত যাবার কোন প্রয়োজন সমবায় সদস্যদের হবে না। যেহেতু সমবায়ের সকল সদস্য একই গ্রামবাসী অথবা নিকটবর্তী এলাকার অধিবাসী, তাই আশা করা যায় যে তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানা-পরিচয়ও নিশ্চয়ই থাকৰে। সুতরাং এমন অবস্থায় কোন সমবায় সদস্যের উত্তরাধিকার নির্বাচনে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেবে না। সমবায়ের সদস্যরাই ঠিক করে দিতে পারবেন কে মৃত সদস্যটির শেয়ারের বংশগত উত্তরাধিকারী হবেন।

ছোট ছোট জমির মালিকরাও সমবায় প্রথার দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন। বিধবা, অক্ষম কর্ষক, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা তাঁদের আপন আপন শেয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী সমবায় থেকে নিজের নিজের লভ্যাংশও পেয়ে যাবে। কিন্তু ব্যষ্টিগত মালিকানাধীন কৃষি ব্যবস্থায় তাঁদের জমি হয়তো অকর্ষিত হয়েই পড়ে থাকবে, আর ফলস্বরূপ তারা অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হবে। তাই সমবায়

প্রথায় যদি কোন সদস্য কোন রকম কাজকর্ম করতে অক্ষমও হন তবুও তাঁর শেয়ারের লভ্যাংশটুকু তিনি পেয়ে যাবেন।

কর্ষকরা বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন জিনিস তৈরীর জন্য কৃষি-উৎপাদন সমবায় গড়ে তুলতে পারেন। তাই কতকগুলি কৃষি-সমবায় দু'ভাবেই কাজ করে যেতে পারে। তারা উৎপাদন করতে পারে, আবার কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের জন্যে উৎপাদন-সমবায়ের ভূমিকাও পালন করতে পারে। যে সমস্ত কাঁচামাল অকৃষিজাত, যেমন সিমেন্ট উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি উপাদান চুনাপাথর, তার প্রসেসিংটা কিন্তু উৎপাদন সমবায়ের মাধ্যমেই হতে পারে। যে সব কৃষি সমবায় উৎপাদন সমবায় হিসেবে কাজ করছে তারা তা না করে সমবায়ের দ্বারা তৈরী করিয়ে নিতে পারেন। যে সব সমবায় কেবলমাত্র শস্যোৎপাদন করছে তারা তাদের ফসলের বিক্রয়যোগ্য অংশ কৃষি-ভিত্তিক উৎপাদন সমবায়ের কাছেই বিক্রী করবে। আর এই উৎপাদন সমবায়গুলি তখন সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নানান ধরণের ভোগ্যপণ্য তৈরী করতে সক্ষম হবে। এ ভাবে কৃষি-সমবায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন-সমবায়ের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেও তাদের সদস্যদের আয় নানানভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারবে। উদাহরণ স্বরূপ, এ ধরণের উৎপাদন সমবায় ধানের তুষ থেকে তেল উৎপন্ন করে বাজারে বিক্রী করতে পারে। এ ভাবে যে

বাড়তি অর্থ তাঁরা উপার্জন করবেন তা কৃষি–সমবায় বা উৎপাদন–সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যেতে পারে, অথবা ওই সব সমবায়ে মূলধন হিসাবে ৰাড়তি অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে অথবা সমবায়ের উন্নতি ও বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার কাজেও ওই অর্থকে লাগানো যেতে পারে।

কৃষি সমবায়ে নিযুক্ত কর্ষকরা প্রয়োজন হলে সংঘবদ্ধ চাপ সৃষ্টি করে স্থানীয় সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাছ থেকে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ–সুবিধাগুলি আদায় করে নিতে সক্ষম হবেন। ধরো, ব্যষ্টিগত উদ্যোগে যে কর্ষক ফলের চাষ করছেন তিনি তাঁর জমিতে জলসেচের জন্যে গভীর নলকূপ ব্যবহার করছেন। কিন্তু এ ধরণের সেচ ব্যবস্থায় তাঁর ফল–উৎপাদন বিপজ্জনকভাবে বিঘ্নিতও হতে পারে, কারণ ভূগর্ভস্থ জলস্তর গভীর নলকূপ (deep tube-well) ব্যবহারের ফলে অনেক নীচে নেমে গিয়ে তাঁর ক্ষেতের ফলের গাছগুলিকে শুকিয়ে মেরে ফেলতেও পারে। সেক্ষেত্রে অগভীর নলকূপের (shallow tube-well) ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই দুই ধরণেরই নলকূপ ব্যবস্থার কোনটিই সেচের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ করতে সক্ষম নয়। কর্ষকের জন্যে পুকুর–সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, বাঁধ, তোলা সেচ বা লিফ্ট ইরিগেশনের ব্যবস্থা

গড়ে তুলতে হবে। এ সব কাজের জন্যে কর্ষকদের হয়তো সরকারী সাহায্যও নিতে হবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, চিকিৎসা ও শিক্ষা–এই পাঁচটি সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় সুযোগ লাভ করা প্রতিটি মানুষের মুখ্য মৌল অধিকার (cardinal rights)।

কৃষি–ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সেচের জল সরবরাহের অধিকারও কর্ষকদের অনুরূপ এক মৌল অধিকার, কারণ জলের অভাবে সর্বনিম্ন প্রয়োজনগুলির অন্যতম খাদ্যশস্যই উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। কৃষিতে জলসেচের ভূমিকাটা কেমন জান তো? ঠিক যেমন একটা লাটু তার আলের উপর দাঁড়িয়ে, বন্ধন্ করে ঘোরে কিন্তু আল ছাড়া লাটুটা ঘুরতে পারে না তেমনই কৃষি নামক লাটুটার আল হলো ওই সেচের জল যা না থাকলে কৃষির গতি বা অগ্রগতি থেমে যেতে বাধ্য (irrigation water is like the apex point of a spinning top- without which the top can not spin)।

উৎপাদন–সমবায় ও উপভোক্তা–সমবায়

কৃষি সমবায় ছাড়াও প্রাউট আরও বিভিন্ন প্রকারের সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী যেমন উৎপাদন সমবায় ও উপভোক্তা সমবায়। উৎপাদন সমবায়ের পরিভূতে পড়ৰে কৃষি–ভিত্তিক সমবায়, কৃষি–সহায়ক সমবায় ও অ–

কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদক–সমবায়সংস্থাগুলি। এইসব সমবায়ের মোট লভ্যাংশ সমবায়গুলির সদস্য ও শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হবে শ্রমিকদের সমবায়ে বিনিয়োগ করা মূলধনের মোট পরিমাণ, সমবায়ে তাঁদের মোট শ্রমদান ও সমবায় পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা ইত্যাদির ভিত্তিতে।

অনুরূপভাবে একই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের দ্বারা প্রেষিত হয়ে যাঁরা উপভোক্তা সমবায় গড়ে তুলবেন তাঁরাও সমবায় থেকে লভ্যাংশ পাবেন তাঁদের নিজের নিজের বিনিয়োজিত মোট মূলধন ও সমবায়ে প্রদত্ত শ্রমদানের ভিত্তিতে। সমবায়ের যে সকল সদস্য সমবায় সংস্থা পরিচালনায় কাজ কর্ম করবেন তারা এ ধরণের কাজের জন্যে আলাদাভাবে নিশ্চয়ই বেতন পাবেন। উপভোক্তা সমবায়গুলি তাদের সদস্যদের মধ্যে উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু বিক্রয় করবে।

ৰাজারের বিক্রয়যোগ্য পণ্যগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

(১) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য (essential commodities), যেমন চাল, ডাল, লবণ, বস্ত্র ইত্যাদি।

(২) আবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য (demi-essential commodities), যেমন ভোজ্য তৈল, জীবাণু প্রতিরোধক সাবান, জুতা ইত্যাদি।

(৩) বিলাস পণ্যদ্রব্য (non-essential commodities), যেমন স্নো, পাউডার ইত্যাদি।

যদি বিলাস–পণ্যকে গুদামজাত করে ব্যবসায়ীরা বাজারে পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম অভাব গড়ে তোলে তাতে সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু তারা যদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যকে গুদামজাত করে (যেমন চাল, ডাল) বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে তবে সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয় সে জন্যে উপভোক্তা সমবায়গুলি সরাসরি উৎপাদন সমবায় বা কৃষি–সমবায় গুলি থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করবে। পুঁজিপতিদের একটা স্বভাবই হল তারা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলিকে গুদামজাত করে বাজারে তাদের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা ও এভাবে অধিক মুনাফা লোটা। ফলস্বরূপ ক্রেতারা অধিক মূল্য দিয়ে বাজারে অত্যবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য হন; এমনকি বেশী মূল্য দিয়েও বাজারে সে সব দ্রব্য অনেক সময়ে কিনতে পাওয়া যায় না। মধ্যস্বত্বভোগী ও মুনাফাখোররা ইচ্ছে করেই বাজারে এই ধরণের কৃত্রিম অভাবসৃষ্টি করে, কারণ তারা জানে যে সাধারণ মানুষ ঋণ করেও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ৰাজার থেকে চড়া দামে কিনতে বাধ্য হবে। সমাজে এমন ধরণের লোক

কমই আছে যারা ঋণ করেও বিলাস দ্রব্য ক্রয় করতে চায়। উপভোক্তা সমবায়গুলির মাধ্যমে যদি বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করা যায় তবে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল ও মুনাফাখোরদের সমাজ থেকে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

কৃষি-সমবায় ও উৎপাদন-সমবায়গুলি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করবে উপভোক্তা-সমবায়গুলিকে। যে সব ভোগ্যপণ্য সরাসরি কৃষি-সমবায় থেকে উপভোক্তা-সমবায়ে যেতে পারছে না সেগুলিকে প্রথমে উৎপাদন-সমবায়গুলিতে পাঠিয়ে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা হবে। এ ছাড়া, অ-কৃষিজাত পণ্যগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে উৎপাদন সমবায়ের মাধ্যমেই তৈরীর ব্যবস্থা রাখা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে সব কৃষি বা উৎপাদন সমবায় সূতো বা সিল্কের সূতো তৈরীতে নিযুক্ত রয়েছে তারা সেই সূতো বিক্রী করবে তন্তুবায়-সমবায়দের কাছে। তন্তুবায়-সমবায়গুলি শক্তিচালিত যন্ত্রের (Power loom) সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদন করবে। কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম জটিল হাতের কাজ করার প্রয়োজনে হস্তচালিত তাঁতের (handloom) ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু নীতি হিসাবে সাধারণতঃ তন্তুবায়রা অত্যাধুনিক শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্যেই বস্ত্র উৎপাদন করবেন। এই সব তন্তুবায়-সমবায়গুলি উৎপাদিত বস্তু বিক্রী করে দেবেন উপভোক্তা সমবায়গুলিকে।

স্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্তন অনুসারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের সংখ্যারও উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান হারে পরিবর্তন হয়ে চলবে। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত এই পরিবর্তন ঘটাবার অধিকার থাকবে কেবল সংশ্লিষ্ট সরকারেরই। এ ব্যাপারে কোন সমবায়ের পরিচালকমণ্ডলী তাঁদের ইচ্ছে মত কোন কোন নতুন দ্রব্য অত্যাবশ্যক পণ্যের তালিকায় আনা হবে তা নির্দ্ধারণ করতে পারবে না। আজ সমাজে যা আবশ্যক পণ্যদ্রব্য (demi-essential commodities) বলে গণ্য হচ্ছে, ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে ও প্রয়োজনের পরিধি প্রসারিত হবার দরুণ সেগুলিই হয়তো পরবর্তীকালে অত্যাবশ্যক পণ্য (essential commodi- ties) রূপে বিবেচিত হবে। তাই যে সব আবশ্যক পণ্যদ্রব্যের (demi-essential commodities) ক্ষেত্রে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট হতে পারে ও তার ফলে জনসাধারণের দুর্ভোগ হতে পারে সেই সব আবশ্যক পণ্যকে উৎপাদন–সমবায়ের মাধ্যমেই তৈরী করতে হবে। বিলাস দ্রব্য (luxury goods) উৎপাদনের অধিকার ব্যষ্টিগত মালিকানার হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। যে সব অত্যাবশ্যক দ্রব্য বা উদ্যোগ কৃষি–সমবায়ের আওতায় না পড়ে উৎপাদন–সমবায়ের অধীনে পড়ছে অথচ সেগুলি চালাতে গেলে বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন সেগুলি পরিচালিত

হৰে সরকারী উদ্যোগে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিতে পারি রেল-নির্মাণ কারখানাকে।

একটা সুষ্ঠ ও শক্তিশালী সমাজ-সংরচনা গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কৃষি-সমবায়, অত্যাবশ্যক পণ্য উৎপাদন-সমবায় ও অত্যাবশ্যক পণ্য উপভোক্তা সমবায়ের ব্যাপক জাল বিস্তার করে দিতেই হবে।

সমবায় পরিচালন ব্যবস্থা

প্রতিটি সমবায়ের সদস্যরা মিলে নিজের নিজের সমবায়ের জন্যে একটি করে পরিচালক-মণ্ডলী ('বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্') গড়ে তুলবেন। এই বোর্ডই স্থির করবে কোন বছর সংশ্লিষ্ট সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশের কতটা বন্টন করা হবে, কতটা ডিবিডেন্ট রূপে দেওয়া হবে, ইত্যাদি। যাই হোক, সমবায়ের অর্জিত মুনাফার সৰটাকেই ডিবিডেন্ট হিসেবে বন্টন করে দেওয়া চলবে না। লভ্যাংশের কিছু পরিমাণ বিনিয়োগ করা উচিত সমবায়ের উন্নতিকল্পে ট্রাক্টর, সার, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্যে, আর কিছুটা অথরাইজড় ক্যাপিট্যাল হিসেবে জমা রাখা উচিত। এছাড়া কিছু টাকা জমা রাখা উচিত সংরক্ষিত মূলধন (reserved capital) হিসেবে। যে বছর উৎপাদনে মন্দা

দেখা দেৰে সেই সময়ে ডিবিডেণ্ডের মূল্যকে বাড়িয়ে তুলবার জন্যে এ ধরণের রিজার্ব ফাণ্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। সমবায়ের লভ্যাংশ বণ্টন ও মূলধন ব্যবহারের এই নীতিগুলি মেনে চললে সমবায়ের যে নিজস্ব authorised capital সেটা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

প্রতিটি সমৱায়ের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ তৈরী হবে উক্ত সমবায়ের সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফৎ। বোর্ড সদস্যরা অবশ্যই অবৈতনিক হবেন না। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সমবায়ের বোর্ডে কোন দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ ঢুকবার সুযোগ না পায়। মনে রাখতে হবে, বোর্ডের প্রতিটি সদস্যকেই কঠোরভাবে সৎ ও নীতিপরায়ণ হতেই হবে।

কালোবাজার রোধ করবার অন্যে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বস্ত্রশিল্পকে যদি কালোবাজারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তবে যে–সমবায় থেকে যে ধরণের বস্ত্র উৎপন্ন হচ্ছে সেই সৰ বস্ত্রের উৎপাদক–সমবায়টির নিজস্ব ট্রেড মার্ক রাখতে হবে। এতে যদি কোন কালোবাজারী ট্রেড–মার্ক ছাড়াই কাপড় বিক্রী করার চেষ্টা করে তবে সে অনায়াসে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাৰে। এই সহজ ও কার্যকরী পদ্ধতিটি অনেক বুদ্ধিমান

ব্যবসায়–পরিচালক ও প্রশাসকদের জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এ ব্যবস্থা চালু করতে কোন চেষ্টাই করেননি। তাঁরা যে চেষ্টা করেননি তার কারণ নির্বাচনের সময় ওই সব চোরাকারবারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা পার্টি–ফাণ্ডে জমা হয়। আসলে তাঁরা হলেন পুঁজিপতিদের দালাল। নির্বাচন ব্যবস্থায় এ ধরণের ত্রুটি বা পাপাচার গণতন্ত্রের একটা ঋণাত্মক দিক। তাই বলতে পারি যে গণতন্ত্র সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা রূপে গণ্য হতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসনে মজুতদারি, কালোবাজারি বা মুনাফা লুন্ঠনের অনৈতিক কাজগুলিকে ৰন্ধ করা যাবে না। যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেউ তার চেষ্টা করেন তবে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। ক্ষত্রিয় যুগের চরম স্তরে মজুতদারি ও কালোবাজারি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে ক্ষত্রিয় প্রশাসনে বিপ্র বা বৈশ্যের প্রভাব বিস্তারিত হতে থাকে তখন সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও শিথিল হয়ে পড়তে থাকে।

বৃহদাকার উৎপাদন সমবায়কে কেন্দ্র করে অনেকগুলি সহায়ক বা উপ–উৎপাদন–সমবায়সংস্থা (Satellite Producers' Co-op) গড়ে তুলতে হবে। মোটর গাড়ী তৈরীর জন্যে একটা বড় কারখানা যদি স্থাপন করা হয় তবে তাকে ঘিরে স্থানীয় ভাবে আশেপাশে মোটর গাড়ীর প্রয়োজনীয় বহু যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্যে অনেকগুলি সহায়ক বা উপ–উৎপাদন

সমবায় গড়ে উঠতে পারে। এইসব উপ-সমবায়গুলির সদস্যরা নিজেদের বাড়ীতে বসেই উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। এমনকি এ কাজে তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সহযোগিতা করতে পারবেন। প্রধান সমবায় কারখানাটির কাজ হল এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-সমবায়গুলিতে তৈরী যন্ত্রাংশগুলিকে সংযুক্ত করে মোটর গাড়ী নির্মাণ করা। এই ধরণের বিকেন্দ্রিত সামবায়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুটি সুফল হচ্ছে,- (১) প্রধান সমবায় কারখানাটিতে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করার দরকার না থাকায় শ্রমিক-অসন্তোষের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে, ও (২) শ্রমিকের মজুরী সংক্রান্ত খরচও হ্রাস পাৰে। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার দরও কম রাখা সম্ভব হৰে। এই একই কারণে হাওড়ার মঙ্গলাহাটের জিনিসপত্রের বাজারদর তুলনামূলক বিচারে কম।

সমবায় প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় ভাসমান জনসংখ্যার সমস্যা (floating population) অথবা বহিরাগত শ্রমিক সমস্যা (immigrant labour) কখনোই দেখা দেবে না, কারণ প্রতিটি সমবায়ের সকল সদস্যই হবেন স্থানীয় লোক। বহিরাগত মানুষেরা কোন স্থানে গড়ে ওঠা সমবায়ের সদস্য হতে পারবেন না; দূরদেশ থেকে উড়ে আসা সুখের পায়রাদের জন্যে সমবায়ে কোন স্থান নাই কারণ তাঁদের সমবায়ে অংশগ্রহণ ঘটলেই গোটা অর্থনৈতিক

সূচীপত্র

ব্যবস্থাটাই বিঘ্নিত হয়ে পড়ৰে। হাওড়া জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে ও তার দ্বারা জেলার স্থানীয় জনগণের জন্যে ১৭ মাসের খাবার অনায়াসে সরবরাহ করা যেতে পারে। কিন্তু এই জেলায় বহিরাগত শ্রমিকের সংখ্যা এত বেশী যে জেলার উৎপাদিত মোট-শস্যের দ্বারা ৬১%, মাসও তাঁদের খাদ্যের দাবী মিটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদি বহিরাগত শ্রমিকের সমস্যা সমাধান করা যায় তবে সমবায় সংস্থাগুলোর আভ্যন্তরীণ পরিবেশও প্রতিকুল সামাজিক প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

সমবায় প্রথায় যে অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরী হয় তাতে বেকার সমস্যারও সমাধান হবে। অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার দাবীও ক্রমাগত ৰেড়ে যেতে থাকে। শিক্ষিত শ্রমিকরা দক্ষ কারিগর (skilled worker) রূপে কাজ পাৰেন। কৃষি সমবায়ে নানান ধরণের কাজের লোকের প্রয়োজন হবে, যেমন ট্রাক্টর-চালক, কর্ষক, ক্ষেত-মজুর ইত্যাদি। এ সব কাজ সমবায়ের নিজস্ব সদস্যরাই করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে গ্রামের লোকেদের চাকুরির তাগিদে শহরে ছুটে আসতে হবে না।

সমবায়ে অবসর গ্রহণের জন্যে কোন বয়স–সীমা নির্দিষ্ট করা থাকবে না। শারীরিক ক্ষমতা যতদিন থাকৰে ততদিন সমবায়ে কাজ করে যাবার সুযোগ পাবেন।

যে সব সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল সংগ্রহ করার সুযোগ নেই সে সব অঞ্চলে প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম কাঁচামাল বা সিন্থেটিক দ্রব্যের ব্যবহার চালু করে স্থানীয় শিল্প গড়ে তুলতে বা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মনে করো কোন অর্থনৈতিক অঞ্চলে পশুদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ পশুখাদ্য উৎপন্ন হয় না। সেক্ষেত্রে তারা অন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে পশুখাদ্য ক্রয় করে নিয়ে আসবেন, না, তাঁরা স্থানিকভাবেই কৃত্রিম উপায়ে পশু–খাদ্য তৈরী করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাবেন। আবার ধরো, একখণ্ড ধুতি তৈরীর জন্যে (উত্তর ভারতের লোকেদের পরিধেয় বস্ত্র) যথেষ্ট তুলোর দরকার হয়। আবার দূর–দূরান্তর থেকে প্রভূত পরিমাণ তুলো বয়ে আনতে গেলেও তো অত্যধিক খরচ পড়ৰে। তাই সেখানকার লোকেরা তাঁদের প্রয়োজন মিটাবার জন্যে স্থানিক ভাবেই কৃত্রিম বস্ত্র তৈরী করে নেবেন।

বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাবে সমবায়গুলিও নানান ধরণের সিনথেটিক কাঁচামাল থেকে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য–সামগ্রী

উৎপাদন করে চলবে। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্য দেশ বা অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে কাঁচামাল আমদানী করে তাকে উৎপাদিত পণ্যে (finished goods) রূপান্তরিত করা হয়। প্রাউটের সমবায় ব্যবস্থায় এ ধরণের নীতি অনুসৃত হবে না। প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করে নেবে। এ ব্যাপারে কাঁচামালের জন্যে তারা কখন অন্য কোন অর্থনৈতিক অঞ্চলের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবে না।

সর্বাঙ্গীন বিকাশ

সমবায় পদ্ধতির সাহায্যে মানব সমাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলবে....... জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঘটবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিশ্বের কোন অংশ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে না। বিশ্বের প্রতিটি ভূমিখণ্ডকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগানো হবে। যে অঞ্চলে পশুখাদ্য উৎপাদন করা সহজ সাধ্য সেখানে পশুচারণ ভূমি, দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র ও গোষ্ঠ শিল্প সহজেই গড়ে ওঠবে। যে অঞ্চলে পশুখাদ্য উৎপাদন করা কিছুটা অসুবিধাজনক, মানুষ উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা কৃত্রিম দুগ্ধ তৈরী করে নেবে। এভাবে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও প্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে। সেদিন

খুব বেশী দূরে নয় যখন আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক শক্তিতে বলীয়ান মানুষের হাতে পড়ে জড়বিজ্ঞান মানুষের সমাজে সোণার ফসল ফলাবে। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতির ফলে মানুষের বৌদ্ধিক সামর্থ্যও দারুণভাবে বেড়ে যাবে। তখন এই সমবায় সংস্থাগুলি মানুষের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মানব সমাজের ঐক্যকে দৃঢ়তর করার জন্যে আমাদের উচিত যা কিছু বিভেদমূলক ও অনৈক্যসৃষ্টিকারী তত্ত্ব সেগুলিকে নিরুৎসাহিত করা, আর যা কিছু ঐক্য সৃষ্টির সহায়ক সেগুলিকে প্রোৎসাহিত করা। ভারতে এমন অনেক ঐক্যৰর্দ্ধক বিষয় রয়েছে যা মানব সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করতে পারে, আবার তেমনি এমন অনেক বিষয়ও আছে যা দেশের অনৈক্য ৰাড়িয়ে দিতে পারে। জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবার জন্যে ভারতীয় মানসিকতার সবচেয়ে বড় ও মৌল উপাদান রয়েছে সেটা হ'ল তাঁদের ঈশ্বর–মুখিনতা। মনে রেখো, ভারতীয় মানসিকতা অন্তর্নিহিতভাবে আস্তিকতায় বিশ্বাসী। পরমপুরুষের শক্তিকে তাঁরা এক অন্যতম মৌল মানবিক তত্ত্বরূপে গণ্য করে থাকেন। এমনকি ভারতীয় কম্যুনিষ্টরাও তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে যথেষ্ট ধর্মভীরু। শুধু রাজনৈতিক মঞ্চে এসে যখন দাঁড়ান তখন তাঁরা নাস্তিকের

মত কথাবার্তা বলেন। ভারতের মানুষের আধ্যাত্মিক মান যদিও উন্নত, কিন্তু তাঁদের নৈতিক মান আজ পাশ্চাত্যের মানুষের চেয়ে নীচে নেমে গেছে। তাই ভারতে আজ নৈতিক মানকে ৰাড়িয়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সমাজে অধিক সংখ্যায় নীতিবাদী মানুষ গড়ে তুলতে হবে। তার জন্যে দেশের সর্বত্র এক বিশ্বৈকতাবাদী আদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে।

ভারতের সংহতি বৃদ্ধির জন্যে সংস্কৃত ভাষাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ভারতের জনগণের সকলেই সংস্কৃত ভাষা জানুন বা না জানুন, সংস্কৃত ভাষার প্রতি সকলেরই রয়েছে গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর বদলে যদি সংস্কৃত করা হত তাহলে আজ জাতীয় ভাষা নিয়ে অনেক বিভেদমূলক সমস্যাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হত।

বর্ষপঞ্জী সংক্রান্ত আরেকটি বিষয়ের দৃষ্টান্তও তোমরা নিতে পার। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অংশে ও উত্তর ভারতে চন্দ্রের গতিবিধি অনুযায়ী চান্দ্র-গণনা অনুসারে বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেণ্ডার তৈরী করা হয়। এ ধরণের বর্ষপঞ্জীকে বলা হয় 'সংবৎ'। যদি এই চান্দ্রগণনার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তবে প্রতি বৎসরের আষাঢ় মাসের সাত তারিখ গণনা করতে হয় ওই দিনটির সকাল বেলাটাকে, ওই একই দিনের দুপুর

বেলাটাকে গণনা করতে হয় ৮ তারিখ হিসেবে ও রাত্রিটাকে গণনা করতে হয় ৯ তারিখ হিসেবে। এই ধরণের বর্ষপঞ্জীতে তাই তিথি গণনায় নানা অসুবিধা দেখা হয়। কিন্তু সূর্যের গতিবিধির উপর নির্ভর করে যে সৌর বর্ষপঞ্জী তৈরী করা হয় সেই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে বাংলা, অসম, ওড়িষ্যা, মণিপুর, পঞ্জাৰ, জন্ম–কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে। সৌরগণনানির্ভর পঞ্জিকাকে বলা হয় 'শকাব্দ'। এই গণনাপদ্ধতি অনুযায়ী ১৪ই এপ্রিল বাংলার ১লা বৈশাখ। বর্ষপঞ্জীর গণনা সংক্রান্ত ব্যাপারে এ ধরণের পার্থক্যকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের নিশ্চয়ই উচিত নয়। আমাদের হয় 'শকাব্দ' পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নতুবা আন্তর্জাতিক বর্ষপঞ্জী গ্রহণ করা উচিত।

তাই বলছি, সমগ্র মানবজাতিকে যদি আজ ঐক্যবদ্ধ করতে হয় তবে আমাদের ভেদাত্মক তত্ত্বগুলিকে নিরুৎসাহিত করতে হৰে ও ঐক্যবর্দ্ধক বিষয়গুলিকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এই ঐক্য ঘটাবার সবচেয়ে মধুরতম উপাদানটি হচ্ছে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব (love and sympathy)। মানুষের স্বভাবই হল সুখানুরক্তি ও আনন্দসম্প্রাপ্তি। ভৌতিক বা জাগতিক ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর্জগতের মধুরতার সর্বোত্তম প্রকাশ হল এই সমবায়

পদ্ধতি। মানব অস্তিত্বের অমৃতরসের বৈবহারিক ও সামাজিক প্রতীকী রূপটি হল এই সমবায় প্রথা।

(কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী'৮৮)

কৃষি–উৎপাদন পদ্ধতি

মিলিতভাবে কোন কিছু তৈরী করাকে বলে গণোৎপাদন। তোমরা দেখেছ কৃষিপ্রধান সমাজেই শুধু নয়, সেইসঙ্গে সমাজে এমন কিছু কিছু কাজ আছে যা অনেককে হাত মিলিয়ে করতে হয়। যারা আখের চাষ করে তারা জানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আখ থেকে গুড় তৈরী করা হয় মিলিতভাবে। মিলিতভাবে তারা তাদের আখ মাড়াইয়ের জন্যে এজমালী সম্পত্তি হিসেবে রস জ্বাল দেবার কড়াই কিনে রাখে। এভাবে আখ থেকে গুড় তৈরী করা হয়। এটি হল গণোৎপাদন ব্যবস্থা।

তথাকথিত কমিউন ব্যবস্থাও একটি গণোৎপাদন ব্যবস্থা। সেখানে অনেকে মিলেই সম্পদ উৎপাদনের কাজে লেগে থাকেন। সমবায় শিল্প উৎপাদন, সমবায় কৃষি উৎপাদন–এরাও গণোৎপাদন। ব্যষ্টিগত মালিকানায় কৃষি উৎপাদন

গণোৎপাদন নয়, ভাগচাষীর চাষ (Share-cropping system) গণোৎপাদন নয়। বিচার করলে দেখা যাৰে গণোৎপাদন ব্যবস্থাসমূহ ও বৈয়ষ্টিক শিল্প বা বৈয়ষ্টিক কৃষি উৎপাদনের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে সৰ চেয়ে নিম্ন মানের হচ্ছে কমিউন ব্যবস্থা। তার চেয়ে একটু ভাল হল ভাগচাষ, তার চেয়ে একটু ভাল বৈয়ষ্টিক মালিকানায় কৃষি বা শিল্প উৎপাদন, ও তুলনামূলক বিচারে সবচেয়ে ভাল সামবায়িক কৃষি উৎপাদন বা সামবায়িক শিল্প উৎপাদন। কমিউন ব্যবস্থায় ব্যষ্টির মালিকানা অস্বীকৃত থাকে। কোন কোন দেশে মুখে ব্যষ্টি-মালিকানা কিঞ্চিৎ ছিটেফোঁটা স্বীকার করা হলেও বাস্তবে তা নেই। কর্মী যাতে শিল্প উৎপাদনে আগ্রহ প্রদর্শন করে, সে রূপ কর্মদক্ষতা ও মানসিক কর্মৈষণা ৰাড়াৰার কোন ব্যবস্থা নেই অর্থাৎ কর্মীর অবস্থা সেখানে কলুর ঘানিতে বেঁধে-দেওয়া ঠুলি-পরা বলদের মত। সে দিনে হয়তো পঞ্চাশ ক্রোশ চলেছে কিন্তু তার কোন অগ্রগতি নেই....বুদ্ধি জড়ত্বের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমিত থাকে, চিন্তায় সূক্ষ্মভাব জাগাৰার সুযোগ নেই, অবকাশও নেই। এই ধরণের অবস্থা মানুষকে উর্ধ্বলোকে ওঠাবে না। জড়ত্বের ঘূর্ণ্যাবর্তে পড়ে অন্যান্য জীবজন্তুর মতই তাদের জীবনের শেষের দিনের প্রতীক্ষা করতে হবে। এটাই কমিউন ব্যবস্থা। এটা মনস্তত্ত্ববিরোধী, তাই এতে উৎপাদন বাড়ে না। কারণ শ্রমের সঙ্গে মানুষের

মানসিক বা মানবিক সম্পর্ক থাকে না। যেসব দেশে কমিউন প্রথা সোজাভাবে বা আঁকাবাঁকা ভাবে প্রচলিত তারা কৃষি উৎপাদনে বিশ্রীভাবে পরাজিত.......পরাভূত। আরও দুঃখের কথা এই যে যে–পুঁজিবাদ মানুষের জীবনে অনাহার, অপুষ্টি, দিবা–দুস্বপ্ন নাৰিয়ে আনে সেই পুঁজিবাদী দেশে ব্যষ্টিগত মালিকানায় যে কৃষিপণ্য উৎপাদন হয় সেই কৃষিপণ্য কমিউন ব্যবস্থাবলম্বী দেশ ক্রয় করতে বাধ্য হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা খারাপ হলেও কমিউন ব্যবস্থা তার কাছে নতি স্বীকার করে। কী দুর্দৈব! ওই দেশগুলো কমিউন ব্যবস্থা যতদিন ত্যাগ না করছে ততদিন তাদের খাদ্যাভাব, তাদের হাতের ভিক্ষাপাত্র সরবার নয়।

ভাগচাষ বা বর্গাদার ব্যবস্থা কমিউন ব্যবস্থার চেয়ে ভাল এই জন্যে যে এতে ব্যষ্টিবিশেষ প্রেরণা ও প্রেষণার সুযোগ পায়। বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারলে তাতে আমি বেশী লভ্যাংশ পাৰ এই মানসিকতা থেকে যায়। এর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে কোন কর্ষক, যদি বর্গাদার হিসেৰে তিনটি মানুষের কাছ থেকে ২০ বিঘা করে ৬০ বিঘা জমি বর্গাতে নেয় তৰে সেই জমির সবটাই সে চাষ নাও করতে পারে আলস্যের দরুণ, উপযুক্ত কর্মীর অভাবের দরুণ ও অর্থাভাবের দরুণ। সেই জমি থেকে যতটা ফসল ফলে তাতে সে ভাবতে পারে আমি যতটুকু জমি চাষ করেছি তাতেই ভালভাবে আমার সারা

বছর চলে যাবে। বাকি জমিটুকু এবছর চাষ নাই বা করলুম। এই চাষ না করায় যার জমি বন্ধ্যা করে সে ফেলে রাখছে সে তার প্রাপ্য পেলনা, তাকে আর্থিক দুর্ভোগ পেতে হল। বর্গাদার প্রথায় ভাগচাষীর আরও একটা ঋণাত্মক দিক হল– এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির মালিকের চেয়ে বর্গাদারের হাতে বেশী ভূমি একত্রিত হয়। তার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় জমির মালিকের চেয়ে অনেক অনেক ভাল। এতে ঘুরে ফিরে একটি কৃষি পুঁজিৰাদী গোষ্ঠী তৈরী করা হয় নাকি। এই ধরণের ভাগচাষী বলতে পারে না গতর খেটে কাজ করেছে। তৃতীয়তঃ বর্গাদার ব্যবস্থায় ভাগচাষী অনেক সময় জমি দখলে রেখে মুনিশ–কিষাণকে দিয়ে খাটিয়ে চাষকরিয়ে নেয়, আলস্যে তার নিজের জীবন কাটানোর সুযোগ থেকে যায়। চতুর্থতঃ ভূমির মালিকের হাতে কম জমি থাকায় স্বতন্ত্রভাবে তিনি সেই জমির চাষ করতে পারেন কি? কিন্তু বর্গাদার তা পারেন। কারণ তাঁর সামর্থ্য বেশী। সুতরাং এই বর্গাদারী ব্যবস্থাটায় ঘুরে ফিরে একটা নোতুন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা (Fudalism) তৈরী হচ্ছে নাকি!

স্বকৃত কৃষি ও বর্গাদারী ব্যবস্থা দুয়েরই আরেকটা বড় ত্রুটি হচ্ছে, হাতে বিরাট ভূমি বা বিরাট পুঁজি না থাকলে জমির মালিক বা বর্গাদার কৃষির আধুনিকীকরণ করতে পারেন না। ... ট্রাকটার, এমনকি পাওয়ার টিলারেরও ব্যবস্থা

করতে পারেন না। সেই সাবেকী লাঙ্গল-জোয়াল দিয়ে দুর্বল ফালের সাহায্যে এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটি খুঁড়ে ফলন আর কত ৰাড়ানো যাবে? উন্নততর পদ্ধতির সার, বীজ, সেচ-ব্যবস্থা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বর্গাদারী ব্যবস্থার আরও একটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে এই যে, মাত্র কয়েক একর জমির মালিক ভূমি সীমিতীকরণ আইনের (Land-ceiling) আওতায় পড়ে যান কিন্তু বর্গাদার জমির মালিকের তুলনায় অনেক অনেক জমি চাষ করলেও ভূমি সীমিতীকরণ আইন তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। মুখের ওপরেই তিনি বলে দিতে পারেন, আমি তো জমির মালিক নই, আমার ওপর সীমিতীকরণের আদেশ কেন? অর্থাৎ একটা পুঁজিবাদী গোষ্ঠী মহাজালের নাইলনের সূতোর ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে

ব্যষ্টিগত প্রয়াসের কৃষিতে কর্ষকের হাতে বেশী জমি থাকলে (যেমন নির্বাধসীমার জমি পুঁজিবাদী দেশের কর্ষক ভোগ করে থাকে) কর্ষক বেশী খরচ করে ভাল।বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থা করতে পারে বটে কিন্তু তাতে সীমা নির্ধারণ বা সীলিং ব্যবস্থা উঠিয়ে দিতে হবে যা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে নূতন করে পুঁজিবাদ ব্যবস্থাই জন্ম নেয়। বর্গাদারী ব্যবস্থার চেয়ে ব্যষ্টিগত ব্যবস্থায় প্রেরণা-প্রেষণা বা ইন্সেন্টির বেশী থাকলেও সেক্ষেত্রে উন্নততর চাষের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। তাই ফসল বাড়াবার সুযোগ কম। তাই অনুর্বর বা

টাঁড় জমি পতিত পড়ে থাকার সুযোগ শতকরা একশ' ভাগ। কৃষি-শিল্প দুয়েতে ঠিক বর্তমান পৃথিবীতে উন্নততর ব্যবস্থা হচ্ছে সমবায় ব্যবস্থা। এতে সমবায় অধিকাংশ সময়ে অধিক পরিমাণে সরকারী আর্থিক সহায়তা আদায়করতে পারে। সমবায় সরকারকে চাপ দিয়ে সেচ ব্যবস্থা, ভাল ৰীজ ও অন্যান্য অনেককিছুর ব্যবস্থা করিয়ে নিতে পারবে ও টাড় বা অনুর্বর জমিকেও কাজে লাগিয়ে নিতে পারবে। যে জমিতে উর্বরতা থাকে না সেই জমিকেও চাষের উপযুক্ত করে নিতে পারবে.... তাতে ফলন অবশ্যই ৰাড়বে। খাদ্যঘাটতি বা পণ্য-ঘাটতির দেশও আর্থিক ক্ষেত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে। শুধু কি তাই সমগুণসম্পন্ন ও সমান লেবেলের জমিতে আল ভেঙ্গে দিয়ে বৃহৎ প্লটে পরিণত করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, জমিতে গুণগত পার্থক্য থাকেই। তাতে ফসলের উৎপাদন কম-বেশী হতেই পারে, ফসলের প্রকারভেদও হতে পারে। তৰে গুণগত পার্থক্য থাকলে ও জমির লেবেল উঁচু-নীচু থাকলে সেক্ষেত্রে জমিতে আল রাখতেই হবে। অন্যথা জল দিয়ে সমস্ত জমিকে সমান ভাবে সিক্ত করা যাবে না। তৰু সমবায় ব্যবস্থায় যা পাওয়া যায় তুলনামূলক ভাবে কমিউনে তার কিছুই পাওয়া যায় না। ভাগচাষে কমিউনের চেয়ে বেশী ফসল পাওয়া গেলেও তারা উন্নততর কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারবে না। হরেদরে তাদের উৎপাদন কমিউনের

পর্যায়ে নেৰে আসবে। ব্যষ্টিগত প্রয়াসে চাষে অর্থাভাবের দরুণ জমিতে উন্নততর লাঙ্গল (tractor, power-tiller), গবেষণালব্ধ উন্নততর বীজ, সার, সেচ কোনটাই পাওয়া যাবে না। তাই ব্যবস্থাটি ভাগচাষের চেয়ে মন্দের ভাল হলেও কমিউন ব্যবস্থার চেয়ে ৰেশ কিছুটা ভাল হলেও রাষ্ট্রের তাতে বড় একটা লাভ হয় না বা হবে না।

মানুষের যে কয়েকটি মায়া অত্যন্ত প্রৰলভাবে থাকে তার অন্যতম হচ্ছে মাটির মায়া। একজন চাষী দয়াপরবশতঃ তার উৎপাদিত ফসলের অনেকটাই দান করতে পারেন, তাতে দুঃখ হয় না কিন্তু দুঃখ অবশ্যই হবে যদি ওই দানকৃত ফসলের যে দাম তার চেয়ে অর্ধেক মূল্যের ভূমিখণ্ডের এক বিঘৎ জমিও কাউকে দান করতে হয়। কাউকে জমি দিতে বা দান করতে তার পাঁজরা খসে যাবে। যারা ভূমি দান করে তারা তা দান করে হয় আধ্যাত্মিক প্রেষণায় অথবা মানবিকতার প্রেরণায় না হয় ভূমি ৰাঁচাৰার ফন্দিফিকির হিসেবে।

(শব্দচয়নিকা ১৬শ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত)

***   ***   ***   ***

কৃষির উৎপাদন-প্রথা

সূচীপত্র

ভাগচাষীর নিজের জমি থাকে না। সে অপরের জমি চাষ করে উৎপাদিত ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ পায়। জমির মালিক ভাগচাষীদের জমি চাষ করতে দেন এই কারণে যে তাঁর অধিকৃত জমি ক্ষুদ্রায়তন হলে তা থেকে তার পর্যাপ্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকে না। একজন ভাগচাষী চাইলে বেশ কয়েকজন জমির মালিকের কাছ থেকে কয়েক একর জমি বন্দোবস্ত করে নিতে পারে। আজ থেকে প্রায় সাতশ বছর আগে এই ভাগচাষী বা বর্গাদার প্রথা শুরু হয়। বাংলায় একে ভাগচাষ বা বর্গাদার প্রথা ৰলে।

বর্গাদারী ব্যবস্থার মুখ্যতঃ চারটে ত্রুটি। প্রথম ত্রুটি হচ্ছে: যদি কোন ভাগচাষীকে অনেক জমি চাষ করতে হয় সে তার সুবিধামত কেবল উর্বর জমিখণ্ডগুলোকেই চাষ করবে। যদি অলস প্রকৃতির হয় তাহলে সে কেবল ততটুকু জমিই চাষ করবে যার উৎপাদিত ফসল থেকে তার পরিবারের সারা বছরের খরচ চলে যাবে, বাকী জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে।

দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে: ভাগচাষীরা অনেক সময় জমির মালিকদের চেয়ে বেশী পরিমাণ জমি হাতে নেয় ও কৃষি–পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। তৃতীয়তঃ অনেক সময় ভাগচাষী

অনেক জন–মজুরের সাহায্যে চাষ করায় ও নিজে অলস হয়ে বসে থাকে। চতুর্থতঃ কোন ক্ষেত্রে ভাগচাষীর সংগৃহীত জমি স্বল্পায়তন হলে স্বাধীনভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করা যাবে না।

একমাত্র সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্বোল্লিখিত ত্রুটিগুলো দূর করা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ভূমিখণ্ডগুলোতে কেবল সেই সব ফসল ফলাতে হবে যা সেখানকার মাটিতে জন্মায়। যেমন অনুর্বর উঁচু জমিতে জন্মাতে পারে নেফিয়ার গ্রাস, পেঁপে, খেসারির ডাল ইত্যাদি। সমবায় ব্যবস্থায় কোন জমিকেই অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা যাবে না। প্রতিটি ভূমিখণ্ডকেই কৃষির আওতায় আনতে হবে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ভাগচাষীকে স্থায়ী শ্রমিক হিসেৰে নিয়োগ করা হবে ও তাদের উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী বেতন ও বোনাস দেওয়া হবে। সমবায় ব্যবস্থায় অলস কর্মীউৎপাদনের স্বল্পতার দরুণ বেতন হয়তো কম পাৰে কিন্তু সমাগ্রিক উৎপাদন হ্রাস পাৰে না কারণ অন্যান্য কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকেরা তাদের স্বাভাবিক মজুরীর অতিরিক্ত বোনাসের জন্যে তারা স্বাভাবিকভাবেই অধিক উৎপাদন করতে উদ্যোগী হবে। তাদের যৌথ শক্তির দরুণ সমবায়গুলো অধিকতর বৈজ্ঞানিক উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম হৰে–যেমন পাওয়ারটিলার (বিদ্যুৎ চালিত লাঙ্গল), ট্রাক্টর, অধিক–

ফলনশীল ৰীজ, উন্নত সেচ, ইত্যাদি। সমবায়ের সদস্যরা অর্থনৈতিক সাহায্য বা ঋণ দানের জন্যে এই উদ্দেশ্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে যা কোন একক চাষীর পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন, চাপে পড়ে সরকার কম সুদে সমবায় সংস্থাগুলোকে টাকা ধার দিতে পারে যা দিয়ে সংস্থাগুলো পাওয়ার-টিলার, ট্রাক্টর কিনতে পারে অথবা সরকার নিজেই উদ্যোগী হয়ে কৃষিতে প্রয়োজনীয় সেচের বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন, একক কর্ষকের পক্ষে যা আদৌ সম্ভব নয়।

তাই সমবায় ব্যবস্থা আজকের বর্গাদার প্রথার চেয়ে অনেক ভাল। সমবায় ব্যবস্থা কৃষিযোগ্য ভূমিকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে শস্যোৎপাদন বাড়িয়ে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে ভাগচাষ প্রথার মূল ত্রুটিগুলোকে দূর করতে পারে। সমবায়ের সদস্যরা মিলে একটা পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচন করে নেবেন যাঁরা উৎপাদনের সকল দিকই দেখাশোণা করবেন যার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাবে। কৃষি-সমবায় সংস্থাগুলোর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত; "অধিকতর উৎপাদন অধিকতর লভ্যাংশ... অধিকতর বোনাস"। শ্রমিকেরা পাৰে বেতন, বোনাস ও লভ্যাংশ; শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হবে সে কতটা পরিমাণে শ্রম দিচ্ছে তার ওপরে আর বোনাস ও লভ্যাংশ নির্ধারিত হবে কী পরিমাণ সমবায় সংস্থার বাৎসরিক নীট লাভের ওপর।

সূচীপত্র

ভাগচাষ ব্যবস্থা ছাড়াও রয়েছে কমিউন প্রথা বা সমবায় ব্যবস্থা। কমিউন প্রথা ও সমবায় প্রথা–দুই ভিন্ন মেরুর জিনিস। কমিউন প্রথায় শ্রমিকের বা কর্মচারীর কোন ইন্সেন্টিব থাকে না (এইজন্যে এই ব্যবস্থা ভাগচাষ প্রথার চেয়েও খারাপ)। এই প্রেরণা–প্রেষণার অভাবের জন্যে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রাষ্ট্র–পরিচালিত কমিউনগুলো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আজও তাদের খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে। সমবায় ব্যবস্থায় প্রেরণা–প্রেষণা থাকায় কর্মচারীরা কাজটাকে নিজের কাজ বলে মনে করে। নিজেদের প্রচেষ্টায় সমবায়গুলো উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে বা সরকারী তহবিল থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনৰার জন্যে, জলাধার বা জলৰন্ধ তৈরী করবার জন্যে অথবা শিফ্ট ও লিফ্ট ইরিগেসনের ব্যবস্থা করবার জন্যে মোটা রকমের ঋণ নিতে পারে। কমিউন প্রথায় এ ধরণের সুযোগ নেই। তাই তুলনামূলক বিচারে সমবায় প্রথা সর্বোৎকৃষ্ট ও কমিউন প্রথা সর্বনিকৃষ্ট। মানবজাতির বিকাশের পক্ষে এই কমিউন প্রথা দারুণ রকম ক্ষতিকর।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে হতে হৰে ব্লক ভিত্তিক। জমির উর্বরতা, ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে, যেমন ভূপ্রকৃতি, জমির

ঢাল, ও অন্যান্য গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রয়োজন ৰোধে সীমানার রদ্রদল ও পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। যেমন কোন একটা ব্লক্রে একাংশের কৃষি-জমি যদি উর্বর হয় ও অপরাংশ অনুর্বর হয় ও পাশের ব্লকের জমি হয় উর্বর তাহলে পাশাপাশি দুটি ব্লকের সমস্ত অনুর্বর জমিই একই ব্লক-ভুক্ত হয়। এতে সুবিধা হবৰে এই যে একসঙ্গে ব্লক ভিত্তিক প্রোগ্রাম নিতেই হবে ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে।

ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলের কর্ষকেরা পশুখাদ্য উৎপাদন করেন না, তাঁরা গোচারণ ভূমি হিসেবে কিছুটা জমি ফেলে রেখে দেন। এতে গৃহপালিত পশুদের দারুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটে, দুধের পরিমাণ যায় কমে। সমবায় ব্যবস্থায় কিছু পরিমাণ জমি এই উদ্দেশ্যে ছেড়ে রেখে দেওয়া যেতে পারে যাতে দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস (যেমন নেফিয়ার গ্রাস, জোয়ার, বাজরা ও নির্বিষ খেসারির) চাষ করা যেতে পারে। বর্তমানে ভারতে যে প্রজাতির খেসারির চাষ হচ্ছে তা খুবই পুষ্টিকর কিন্তু তার মধ্যে বিষাক্ত এ্যালক্যালয়েড মিশে রয়েছে। এই এ্যালক্যালয়েডের প্রভাবে মানুষ ও পশুদেহের নিম্নাংশ পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আগের রাত্রিতে খেসারিকে ভিজিয়ে নিয়ে যদি ভালভাবে খেসারিকে কোন শক্ত বস্তু দিয়ে ঘসে তার বাইরের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া যায়

তাহলে এই বিষাক্ত এ্যালক্যালয়েড দূর হয়। বাইরের খোসা ও ভেতরের ডালটার মাঝখানে থাকে এই এ্যালক্যালয়েড। খেসারিকে একরাত্রি ভিজয়ে ভালভাবে ঘসে নিলেই এই বিষাক্ত জিনিসটা দূর হয়ে যায়। সে অবস্থা মানুষ, পশু উভয়ে নির্ভয়ে ব্যবহার করতে পারে।

(১৪ই মে, ১৯৮৮, কলিকাতা)

কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। বলা হয়ে থাকে প্রাউটের মত সকল মানুষের জীবনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে হবে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য ও ক্রয়ক্ষমতাকে নিশ্চিততার মাধ্যমে। আবার এও বলা হয়েছে যে মানুষের জীবনে ন্যূনতম প্রয়োজন চিরকাল একই রকম থাকবে না....যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। প্রশ্ন হলো সেক্ষেত্রে আমরা কখনও কি

ভৌতিক মানসিক, আধ্যাত্মিক স্তরে ন্যূনতম প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন saturation point-এ পৌঁছতে পারৰ?

যখন উৎপাদনের প্রাচুর্য দেখা দেবে, অর্থাৎ যখন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন মানুষের প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে সেক্ষেত্রে অবস্থা কী রকম দাঁড়াবে? তখনও কি প্রাউটের প্রয়োজন থাকৰে? মানুষের ভৌতিক ক্ষুধা সীমিত কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষুধা অনন্ত এটা একটা সূক্ষ্মস্তরীয় জিনিস। এই আধ্যাত্মিক পিপাসা কি মিটতে পারে?

উঃ প্রাউটের মতে মানুয়ের মানস–আভোগ অশেষ। এই বিশ্বের সব কিছুই চলমান। তাই মানুষের মানস–আভোগও স্থির নয়, সেট' ও পরিবর্তনশীল। ভৌতিক স্তরেও মানুষের চাহিদা কখনও saturation point-য়ে পৌঁছতে পারে না। অনুরূপভাবে আমাদের মানসিক তৃষ্ণারও পরিতৃপ্তি হবে না। যুগে যুগে মানুষের চাহিদাও পরিবর্তিত হয়ে থাকে মানসিক স্তরে আমাদের যেমন যেমন প্রগতি হতে থাকে। অগ্র্য পুরুষের প্রতি আমাদের আকর্ষণও বাড়তে থাকে। আমরা নোতুন নোতুন অবস্থার সম্মুখীন হতে থাকি। ধাপে ধাপে ভূমানন্দের দিকে এগোতে এগোতে আমরা সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমে বিলীন হতে চাই। মানুষ যতদিন তাঁর দিকে এগোচ্ছে ততদিন তার ক্ষুধা থেকেই যাচ্ছে? পরমপুরুষ চিরনূতন

সত্তা। মানুষ নূতন থেকে নূতনতর সত্তাকে জানছে....তার দিকে এগোচ্ছে কিন্তু নূতনতমকে পাচ্ছে না। একমাত্র পরমপুরুষই নূতনতম। সে চিরনূতন তাই মানুষ যতদিন সেই পরমপুরুষকে না জানছে, ধরাছোঁয়ার মধ্যে না পাচ্ছে ততদিন তাঁর এষণা.... তাঁর অভীপ্সার শেষ নেই। তাই কোন কালেও প্রাউটের প্রয়োজন... প্রাউটের আবেদন ফুরিয়ে যাবে না।

প্রঃ ২। কুয়োর জল দিয়ে সেচের ত্রুটি কী কী?

উঃ কূপের জলকে সেচের কাজে লাগাতে গেলে নানান অসুবিধা দেখা দেবে। কূপ থেকে অধিক পরিমাণ জল তুলে নিলে জল–স্তর (water-level) অনেক নীচে নেৰে যাবে... কোথাও বা ভূস্তরের জলরাশি শেষ হয়ে যাবে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে কূপ–সেচের ত্রুটিগুলো মানুষের চোখে পড়তে চায় না কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে হবে নইলে ভবিষ্যতে মানুষকে সমূহ বিপদের কৰলে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো হলঃ

১। নিকটবর্তী সকল অগভীর কূপের জলও শুকিয়ে যাৰে ও সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের পানীয় জলের সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেবে।

২। ভূনিম্নস্থ জলস্তর খুব নীচে নেৰে গেলে বৃক্ষ, ফলের বাগান, ও বনস্পতিরা পর্যাপ্ত জলের অভাবে শুকিয়ে যাবে বা মারা পড়বে। কূপের জলকে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে সেচের কাজে লাগালে এককালের সবুজ শস্যক্ষেত্র ৪০।৪৫ বছরের মধ্যে মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে।

৩। গভীর নলকূপের জলে এমন কিছু পদার্থ বা খনিজ ধাতু মিশে রয়েছে যা কৃষির জমির পক্ষে ক্ষতিকর, এতে মাটিতে লবন ভাগ বেড়ে যায়। পরে এককালে যে জমি কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে, ...হয়ে পড়ে দারুণ অনুর্বর।

৪। যখন কুয়োর জলের উৎস শুকিয়ে যায় তখন সেচ কাজে ব্যবহৃত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টাঙ্কগুলোও শুকিয়ে পড়ে।

তাই চারিদিকের পরিবেশে মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির কথা ভেবে কূপের জল দিয়ে সেচকে সাময়িক ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর বিকল্প সেচ পদ্ধতি হল-নদীজল সেচ, পুষ্করিণীসেচ-শিফট্ ইরিগেশন ও লিফট্ ইরিগেশন।

প্রঃ ৩। কৃষি প্রধান দেশ ও শিল্পপ্রধান দেশের বা কৃষি অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের সার্বিক বিকাশের জন্যে যে উন্নয়নপ্রকল্প তা কি তত্ত্বতঃ একই ধাঁচের হবে? না, ভিন্ন ভিন্ন রকমের হৰে?

উঃ সার্বিক বিকাশের জন্যে যে উন্নয়ন, তা হল অর্থনীতির মোদ্দা কথা। উত্তর হল যে, উন্নয়ন বলতে বোঝায় সামগ্রিক উন্নয়ন যা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ উন্নয়ন মানে হল অখণ্ড বিকাশ বা বহুমুখী বিকাশ। নীতি ও তত্ত্বের পরিবর্তন হয় না যদিও মাঝে মাঝে প্রয়োগ-কৌশলের পরিবর্তন ঘটে থাকে। তত্ত্বের কৃষিগত দিকটা অপরিবর্তিতই থেকে যাবে।

এপর্যন্ত কৃষির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি অনুসৃত হয়নি। সত্যিকথা বলতে কি, কৃষির সাংঘটনিক দিকটা প্রায় উপেক্ষিতই রয়ে গেছে বলা যেতে পারে।

প্রাউটের বক্তব্য হল, কৃষিকেও শিল্পের (Industry) মত সমান গুরুত্ব দিতে হবে, শিল্পে কোন দ্রব্যসামগ্রীর দর নির্দ্ধারণের সময় কাঁচামালের দাম, শ্রমিকের মজুরী, ঋণের সুদ, সমগ্র ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, সংরক্ষণ মূল্য, লাভের পরিমাণ ও উৎপাদন হার ইত্যাদির ভিত্তিতে কোন জিনিসের দাম নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না তাই কৃষিজ পণ্যের দাম ঠিক অর্থনৈতিক সূত্র মেনে চলে না। কর্ষককে অবস্থার চাপে ফেলে অতি কম মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। কৃষিকে

যদি শিল্পের মত সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে শিল্পের ক্ষেত্রে যে যে নীতি অনুসৃত হয় কৃষির ক্ষেত্রেও তাই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। তেমনটি করা হলে কর্ষকদের অবহেলা করা চলবে না, আর সে ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন, মূল্য নির্দ্ধারণ ও বিকাশের ধারায় কোন পার্থক্য থাকৰে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িষ্যায় বছরে কেবল সর্বত্র একটা ফসলই (ধান) জন্মে। সেখানে সেচের ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত। সেখানে সর্বদাই জলাভাব। স্বভাবতঃই কর্ষকেরা অত্যন্ত দরিদ্র। তাই কৃষির উন্নতিকল্পে কর্ষক সম্প্রদায়ের দারিদ্র দূর করতেই হবে। যদি ওড়িষ্যায় কৃষিকে শিল্পের সমান মর্যাদা দেওয়া যায়, তাহলে সেখানে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের নীতি আইনের তুলনায় পৃথক হয়ে যাবে। উৎপাদন ব্যয় নির্দ্ধারণকালে বীজের দাম, শ্রমিকের মজুরী, কাঁচামালের দাম, কর্মচারীর পেনসন বাবদ দেওয়া, অনুৎপণ্যের গুদাম ব্যায়, উৎপাদনে ক্ষয়ক্ষতির ব্যয়, সিংকিং ফাণ্ড, –এ সবকিছুই বিবেচিত হৰে, উপরন্তু কর্ষকেরা তাদের বৈয়ষ্টিক শ্রমের মূল্য বাবদ তাদের সামগ্রিক উৎপাদনের উপর শতকরা দশ থেকে পনের ভাগ লাভের টাকাও যুক্ত হৰে, এইভাবে কৃষিজ পণ্যের দাম শিল্পজ পণ্যের মতই বিধিৰদ্ধভাবে নির্দ্ধারিত হৰে।

সূচীপত্র

প্রাউটিষ্টিক সমাজে ক্রেতাদের এই নব নির্দ্ধারিত দামে বা মূল্যে কৃষিজ পণ্য ক্রয় করতে হবে। সুসংহত উন্নয়ন নীতির এইটাই হল যথাযথ পন্থা, এ ধরণের ব্যবস্থায় কর্ষকদের কোনদিন শোষিত বা অযথা হয়রাণ হতে হবে না।

প্রঃ ৪। সম্পদের দাম কথাটার তাৎপর্য কি?

উঃ সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক বিচারে সম্পদের দাম মানে হল (value of wealth) সম্পদের দাম মানে আসল সম্পদ। যদি ঠিক মত সংস্কারিত করা না যায় তাহলে wealth বা সম্পদ বলতে বোঝায় টাকা–পয়সা ধন–দৌলত, কিন্তু সম্পদের দাম নির্দ্ধারিত হয় ভোগ্য পণ্য ক্রয়ে আর কতটা বিনিময় মূল্যগত ক্ষমতা আছে, তার ভিত্তিতে সম্পদের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। অর্থাৎ সম্পদের ক্রয়ক্ষমতা হল সম্পদের যথার্থ্য মূল্য, অর্থনীতিবিদরা সংখ্যার ভিত্তিতে সম্পদের যথার্থ মূল্য এখনও পর্যন্ত ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি।

(কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮)

সূচীপত্র